প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট-সভার অনুমোদনক্রমে এই রচনা-সংগ্রহ প্রকাশিত হইল। কিন্তু আজ আমাদের বিশেষ দুঃখ এই যে, যাঁহার আগ্রহে, যত্নে ও উৎসাহে এই সংগ্রহ-কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল, আমরা তাঁহাকে ইহা দেখাইতে পারিলাম না।

রচনা-সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা এই যে, ইহার ভিতর দিয়া প্রখ্যাতনামা লেখকগণের বিশেষ বিশেষ লেখার সহিত ছাত্রগণের সহজেই পরিচয় ঘটে এবং তাঁহাদের অন্যান্য রচনা পড়িবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মধ্যে স্বতঃই স্ফুরিত হয়। তদ্ভিন্ন, একই পুস্তকে নানাবিষয়িণী রচনার সমাবেশ থাকায় ভাব-সম্পদ্-বৃদ্ধিরও বিশেষ সুবিধা ঘটে। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই রচনা-সংগ্রহ সম্পাদিত হইল। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যের বিখ্যাত লেখকগণের রচনা যথাসম্ভব মুদ্রিত হইয়াছে এবং কয়েকটি রচনার এমন অংশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, উক্ত রচনাগুলি পাঠকালে যেন মূল পুস্তক পড়িবার স্পৃহা জাগরিত হয়।

পরিশেষে এই পুস্তকে যে সমস্ত রচনা গৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য যে সমস্ত স্বত্বাধিকারী আমাদিগকে রচনাগুলি প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

অষ্টম সংস্করণের

ভূমিকা

নানা কারণবশতঃ গত কয়েক বৎসর যাবৎই রচনা-সংগ্রহের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছিল। পুনরায় পরিবর্দ্ধিত-রূপে অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

বাঙ্গলা সাহিত্যে পদ্যের উদ্ভব সর্ব্বাগ্রে হইয়াছিল বলিয়া এই সংস্করণে পদ্যাংশ রচনা-সংগ্রহের প্রথমেই দেওয়া হইল।

এই পুস্তকে সংকলিত রচনাগুলিকে প্রকাশের জন্য যে সকল স্বত্বাধিকারী আমাদিগকে অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সূচী

পদ্যাংশ

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাস-ছলনা

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে।।
কত মায়া কর কত কায়া ধর
হেরি হরি হর হারে।
জিতজরামর হয় সেই নর
তুমি দয়া কর যারে।।
এ ভব সংসারে যে ভজে তোমারে
যম নাহি পারে তারে।
যদি না তারিবে যদি না চাহিবে
ভারত ডাকিবে কারে।।

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি করে ভাঙ্গা লড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ি।।
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি।।
ডেঙ্গর উকুন নীক করে ইলিবিলি।
কুটকুটি কানকোটারির কিলিকিলি।।
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে।।
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে।।
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্ম্মসার।।
শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান।।
ফেলিয়া ঝুপড়ী লড়ি আহা উহু কয়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে।।

ভূমে ঠেকে থুঁথি হাঁটু কান ঢেকে যায়।
কুঁজভরে পিঠডাঁড়া ভূমিতে লুটায়।।
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল।।
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া।।
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে।।
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই।।
কাশীতে মরিলে তাহে কত ভোগ আছে।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে।।
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাধ নাই।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই।।
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়।
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয়।।
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়।।
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ী এথা বাস কর।
সদ্য মুক্ত হবি যদি এইখানে মর।।
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া।
মরণ টাঁকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া।।
তোর মনে আমি বুঝি এখনি মরিব।
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব।।
ঊর্দ্ধ্বগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অনাহারে শুকায়েছে আঁত।।
বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শণনুড়ি।
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়িগুড়ি।।
শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে।
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুঝে।।

আনারস

বন হতে এলো এক টিয়ে মনোহর।
সোণার টোপর শোভে মাথার উপর।।
এমন মোহন মূর্ত্তি দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই।।
ঈষৎ শ্যামল রূপ, চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার, চাঁদের গলায়।।
সকল নয়ন-মাঝে, রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে।।
ভাবুক স্বভাবে ভাবে, করে অনুরাগ।
বলে ও যে রাঙগা নয়, নয়নের রাগ।।
রূপের সহিত গুণ, সমতুল হয়।
সুবাসে আমোদ করে ত্রিভুবনময়।।
নাহি করে মুখ-ভঙগী, কথা নাহি কয়।
সৌরভ-গৌরবে দেয় নিজ পরিচয়।।
চপলা রূপের কাছে হয় চমকিত।
দৃষ্টিমাত্র ফুল্ল গাত্র নেত্র পুলকিত।।
সংশয় হয়েছে দেখে সকলের মনে।
কে কামিনী, একাকিনী, বাস করে বনে?
লোকে বলে আনা রস, আনারস নয়।
আনা রস হলে কেন জানা রস হয়?
তারে তার জানা যায়, রস ষোল আনা।
অরসিক লোক তবু, বলে তারে আনা।।
ফেলিয়া পনর আনা, এক আনা রাখে।
এই হেতু 'আনারস' বলে লোক তাকে।।
অরসিক নাহি করে, রসেতে প্রবেশ।
আনাতেই ষোল আনা, না জানে বিশেষ।।

কোথা বা আনার রস, এ আনার কাছে?
ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই, এত টুকু গাছে।।
বেদানা তাহার নাম, দানা যাতে ভরা।
কেমনে হইবে সেই, সর্ব্বমনোহরা?
রস যত, যশ তত, বেদানায় আছে?
আমাদের কাছে নয়, ধনীদের কাছে।।
এক আধসের খায়, আছে যার ধন।
কুবেরের হলে মন, নাহি পায় মণ।।
প্রয়োজন নাহি তাঁর, এখানেতে এসে।
মঙ্গল করুন্ তিনি, মঙ্গলের দেশে।।
আমাদের আনারসে, ষোল আনা সুখ।
দরিদ্রের প্রতি তিনি, না হন বিমুখ।।
আনা দরে আনা যায় কত আনারস।
অনায়াসে করি রসে ত্রিভুবন বশ।।
ক্ষীরোদ নহ তো তুমি, নহ সুধাকর।
তবে কিসে সুধাভরা তব কলেবর?
পুণ্যবতী কেবা আছে, তোমার সমান?
মৃত হয়ে লোকেরে অমৃত কর দান।।
পঞ্চানন পঞ্চমুখে নাহি পায় সীমা।
একমুখে কি কহিব তোমার মহিমা?
সে বড় দূরের কথা সুখ যত খেলে।
হাতে হাতে স্বর্গ ফল হাতে ফল পেলে।।
কৃপণের কর্ম্ম নয় তোমায় আহার।
ছাড়াবার দোষে যেই নাহি পায় তার।।
ডাঁটা বোঁটা নাহি বাছে মনে লোভ ঝোঁকে।
চোখ শুদ্ধ খেয়ে ফেলে চোখখেকো লোকে।।
ফলে আমি মিছা কেন নিন্দা করি তায়?
সাধ পুরে বাদ দিতে বুক ফেটে যায়।।
ছাল ফেলে কাটি কিন্তু চক্ষু ভাসে জলে।
ভয় আছে লোকে পাছে চোখখেকো বলে।।

লুণ মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা চিনি তায় ভরি।।
টুকি টুকি খেলে পরে, রসে ভরে গাল।
নেচে উঠে নন্দলাল, মুখে পড়ে লাল।।
একবার যে জন না পায় তার তার।
সে জন মানুষ নয় বৃথা জন্ম তার।।
অরুচির রুচি হয় মুখে দিলে পর।
সাধ করে নিত্য খাই বেচে বাড়ী ঘর।।
তিনলোক জয় করে তব আস্বাদন।
বালকের কাছে তুমি জননীর স্তন।।
হরিনাম-সুধা তুমি বৃদ্ধের নিকট।
প্রকট বদনে হাসি দেখিতে বিকট।।
ত্রিজগৎ তব গুণে বাধ্য আছে সব।
বিন্দু রস পান করি প্রাণ পায় শব।।
অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে।
গালে এসে বাস কোরো মরণের কালে।।

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সংসার-জাঁতা

চণকাদি শস্যচয়, জাঁতায় পতিত হয়,
বক্রভাবে চক্র ঘুরে তার।
ঘর্ ঘর্ ঘন ঘর্ষে, পৃথক্ পৃথক্ স্পর্শে,
চূর্ণ হয় দেহ সবাকার।।
কিন্তু যেই সেই দণ্ডে, ধরে গিয়া সেই দণ্ডে,
সেই দণ্ডে দণ্ড নাহি আর।
মূলের আশ্রয় লয়, পূর্ব্ববৎ স্থূল রয়,
তার দেহে না হয় প্রহার।।
সেইরূপ বিশ্বপাতা, সুচারু সংসার-জাঁতা,
বিনা করে করিয়া ধারণ।
নর আদি জন্তুচয়, সমভাবে সমুদয়,
দণ্ডযোগে করেন পেষণ।।
যে জন সুজন হয়, চক্রমাঝে নাহি রয়,
দণ্ডের নিকটে করে বাস।
দণ্ডী সেই কভু নয়, সুখী হয় অতিশয়,
দণ্ডী তার দণ্ড করে নাশ।।
শুন জীব সবিশেষ, লয়ে কার উপদেশ,
ত্যজিয়াছ আত্ম-অনুরোধ?
সংসার-জাঁতার ঘায়, যাতনায় প্রাণ যায়,
নাহি তায় কিছুমাত্র বোধ।।
চক্রে আর কেন রও, আছ জীব শিব হও,
সুখে লও দণ্ডীর আশ্রয়।
স্থিরভাবে এই দণ্ড, সার কর এই দণ্ড,
নাহি রবে কালদণ্ড-ভয়।।

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সংসার-সমুদ্র

যেমন ধীবরগণ, করি কর প্রসারণ,
ফেলে জাল সরোবর-জলে।
যত মীন দিয়া ঝম্প, তার মাঝে মারে লম্ফ,
তারা সব বদ্ধ হয় কলে।।
ধীবর তাদের ধরি, তখনি বিনাশ করি,
পূর্ণ করে আপনার আশা।
ছিল মূর্ত্তি মনোহর, জল ছেড়ে জলচর,
পেটের ভিতরে পায় বাসা।।
যে মীন সম্মুখ দিয়া, নতভাবে লয় গিয়া,
জালিকের চরণ শরণ।
মুক্ত হয় অনায়াসে, যুক্ত নয় জালফাঁসে,
আর তার না হয় মরণ।।
সেইরূপ বিশ্বপাল, পেতেছেন মায়াজাল,
ভীম ভব-জলনিধি-জলে।
পরতত্ত্ব-পরিহৃত, প্রমত্ত মানব যত,
তার মাঝে নৃত্য করে বলে।।
সেই জীব সমুদয়, জালপাশে ধৃত হয়,
স্থিত নয় ক্ষণকাল সুখে।
দুঃখ সয় অতিশয়, ভ্রমে করি কালক্ষয়,
নীত হয় মরণের মুখে।।
যে জন সুজন হয়, বিভুর শরণ লয়,
বদ্ধ তায় নাহি হয় জালে।
কদম্ব-কুসুম-অণু, পুলকে পূরিত তনু,
সুখী সেই ইহ পরকালে।।

অতএব শুন জীব, প্রাপ্ত হবে নিজ শিব,
হইবে অশিব সব গত।
মায়াজাল-মুক্ত হও, সত্যের আশ্রয় লও,
ঈশ্বরের হও পদানত।।

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কবি

কে কবি—কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে!

—মধুসূদন দত্ত

কবিতা

অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে
নলিনী? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে?
কি কাক, কি পিকধ্বনি,—সম-ভাব তার!
মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন!—দয়া করি নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে, বীণাপাণি, এ নর-নগরে।—
দুর্ম্মতি সে জন, যার মনঃ নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে! হায়, রে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম, পদ্মবাসিনি ভারতি!
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি।

—মধুসূদন দত্ত

নূতন বৎসর

ভূতরূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ ভূতে বিফল হইল!

বাড়িতে লাগিল বেলা ; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে ;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি ;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী !

—মধুসূদন দত্ত

যশঃ

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ?
অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে ?—
শূন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে ;
দেব-শূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
দেবতা ; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে।।
সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে,
যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্ত্যে বাস করে ;—
কুযশে নরকে যেন, সুযশে—আকাশে !

—মধুসূদন দত্ত

লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ্, নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা- স্ফটিকে গঠিত,
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা, যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা, ঝলসি নয়নে।
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়, মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা,
হর-কোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধররূপে।
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ-মূরতি,
পাণ্ডব-শিবিরদ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধ বহি,
অনন্ত বসন্ত-বায়ু রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী-লহরী, মরি! মনোহর, যথা

বাঁশরী-স্বরলহরী গোকুল-বিপিনে!
কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা,
স্বহস্তে গড়িলা তুমি, তুষিতে পৌরবে?

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে। ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। করযোড় করি
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্বকলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল-তরঙ্গ,
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।

এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে। কতক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত! অমর-বৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী

বাঁধিল সম্মুখ-রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল-কুল-মান এ কাল-সমরে!
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলিশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায় শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল-পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে তোর দুঃখে দুঃখী
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুম-দাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;

তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে করিতে বাস বাসনা আঁধারে?"

এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ; হায় রে, মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয় পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।

তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে ;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে।
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"

উত্তর করিলা তবে লংকা-অধিপতি ;—
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল বিকল-হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,

যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা দূত পানে চাহি,
আদেশিলা ;—"কহ দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"

প্রণমি রাজেন্দ্র-পদে করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত;—"হায়, লঙ্কাপতি!
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীর-কুঞ্জর অরিদল-মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে।
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে,
সিংহনাদে, জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে : কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে!
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর!
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহুসহ
রণে, যূথনাথসহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে ; বিদ্যুৎঝলাসম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর-প্রদেশে
শনশনে! ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কতক্ষণ পরে

প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব ;
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,—" এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ! সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী-মনোহর ;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?"

"কেমনে, হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত ;—"কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি!
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে, চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ুসহ
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশিরবে!—
আর কি কহিব, দেব? পূর্ব্বজন্ম-দোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি। হায়, রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈম লঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহুসহ
রণভূমে, কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে, পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"

এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা ;—"সাবাসি দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডম্বরু-ধ্বনি শুনি কাল-ফণী
কভু কি অলসভাবে নিবসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্‌জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীরচূড়ামণি
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"

—মধুসূদন দত্ত

রণক্ষেত্রে রাবণ ও লক্ষ্মণ

বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী ;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগারি
বিস্ফুলিঙ্গ, তুরঙ্গম হ্রেষিল উল্লাসে।
(রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, ঊষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে।)
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ, হেরি রক্ষোনাথে ;

সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা সুরথী :—
"নাহি যুঝে নর আজি, হে সূত, একাকী

দেখ চেয়ে। ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্যমাঝে।
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিৎ।" স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি,
সরোষে গর্জিয়া রাজা কহিলা গম্ভীরে:—
"চালাও, হে সূত! রথ, যথা বজ্রপাণি
বাসব।" চলিল রথ মনোরথগতি।
পলাইল রঘুসৈন্য, পলায় যেমতি
মদকল করিরাজে হেরি ঊর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী। কিংবা যথা ভীমাকৃতি ঘন,
বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোরনাদে, পশুপক্ষী পলায় চৌদিকে
আতঙ্কে! টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী,
সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ; কিংবা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি। অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে,
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্জলিপুটে
নমি শূরে, লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে;—
"শঙ্করী-শঙ্করে, দেব! পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর। লঙ্কায় তবে বৈরিদল-মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার? রথীন্দ্র তুমি: অন্যায়-সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে: দেহ পথ ছাড়ি।"

কহিলা পার্ব্বতীপুত্র:—"রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।

বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ' আমারে.
নতুবা ও মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে।"

সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,
হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে। বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা ;—"দেখ লো সখি! চাহি লঙ্কাপানে
তীক্ষ্ণ-শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয় ; আকাশে দেখ, পক্ষীন্দ্র হরিছে—
দেবতেজঃ, যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার কুমারে, সই! বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল
সদানন্দ ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে ;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে
সজনি!" চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা ;—"সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি।"

ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাসুর। সিংহনাদে কটক কাটিলা
অসংখ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব-বজ্রপাণি।

বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রহরণে
রক্ষেন্দ্র : হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজি।

পলাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়। আইল রোষে দৈত্যকুল-অরি,
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্র-রণে।

ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুংকারি
ঐরাবত-শিরঃ লক্ষ্যি। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বর্ষি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে।
কহিলা কর্ব্বুরপতি গর্ব্বে সুরনাথে ;—
"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলী,
চির-কম্পমান তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে আজি কপট-সংগ্রামে।
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লংকাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ! অবধ্য তুমি, অমর, নহিলে
দমেন শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে। নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা দেব!" ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
ঊরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি।

হুংকারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে।
অমনি হরিল তেজঃ গরুড়, নারিলা
নাড়িতে দম্ভোলি, দেব দম্ভোলি-নিক্ষেপী।
(প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে। ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি।) হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ, ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু

অভিমানে। হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।

কহিলা রাক্ষসপতি ;—"না চাহি তোমারে
আজি হে বৈদেহীনাথ! এ ভবমণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব' নিরাপদে।
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর? মারিব তারে ; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ!" নাদিলা ভৈরবে
মহেষ্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে,
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র ; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে।

চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
অগ্নিচক্রসম চক্র বর্ষিলা চৌদিকে
অগ্নিরাশি, ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু। (যথা হেরি দূরে
কপোত বিস্তারি পাখা ধায় বাজপতি
অম্বরে ; চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি-শূরে) ধাইলা চৌদিকে
হুহুংকারে দেব-নর রক্ষিতে শূরেশে।
ধাইলা রাক্ষসবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে।

বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে
আইলা অঞ্জনাপুত্র—প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু, গর্জি ভীমনাদে।
যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তূলারাশি
চৌদিকে রাক্ষসবৃন্দ পলাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি
চোকা চোকা শরে শূর অস্থিরিলা শূরে।

অধীর হইলা হনু, ভূধর যেমতি
ভূকম্পনে। পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা
নন্দনে, মিহির যথা নিজ কর দানে
ভূষেন কুমুদবাঞ্ছা সুধাংশুনিধিরে।
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজস্বী সুরথী
নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়ে,—
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পলাইলা হনু।

আইলা কিষ্কিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ :—"রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে
বর্ব্বর আইলি তুই এ কনকপুরে?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথিকুল-মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে। বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার মূঢ়? দেবর কে আছে
আর তার?" ভীমরবে উত্তরিলা বলী
সুগ্রীব ;—"অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ? পরদারলোভে
সবংশে মজিলি দুষ্ট! রক্ষঃকুলকালি
তুই, রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে.
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে।"

এতেক কহিয়া বলী গর্জ্জি নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। অনম্বর আঁধারি ধাইল
শিখর : সুতীক্ষ্ম শরে কাটিলা সুরথী
রক্ষোরাজ খান খান করি সে শিখরে।
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি

তীক্ষ্নতম শরে শূর বিঁধিলা সুগ্রীবে
হুঙ্কারে। বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি,
পলাইলা ; পলাইলা সত্রাসে চৌদিকে
রঘুসৈন্য, (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে
কোলাহলে): দেবদল, তেজোহীন এবে,
পলাইল নরসহ ধূমসহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে
পবন. সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
দেবাকৃতি। বীরমদে দুর্ম্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে :—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয়-হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্তকরী মত্তকরিনাদে!
দেবদত্ত ধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।

"এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ: -"রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি
ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি? এ আসন্ন-কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র ঊর্ম্মিলা.
ভাব দোঁহে। মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে। রক্তস্রোত শুষিবে ধরণী।
কু-ক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি!
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষস-রত্ন- অমূল্য জগতে।"

গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর ; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি-কেশরী :—

"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি!
নাহি ডরি যমে আমি ; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথাসাধ্য কর, রথি! আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা।"

বাধিল তুমুল রণ ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব-নর দোঁহা-পানে, কাটিলা সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্ম্মুহুঃ হুহুঙ্কার-রবে!
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা ;—"বাখানি
বীরপনা তোর আমি, সৌমিত্রি-কেশরি!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্, সুরথি!
তুই ; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে।"

স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি। বজ্রনাদে উঠিলা গর্জ্জিয়া,
উজলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে
ভীষণারিপুনাশিনী! কাঁপিলা সভয়ে
দেব-নর। ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা : বাজিল ঝন্‌ঝনি
দেব-অস্ত্র ; রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ গিরিসম পড়িল সুমতি।

গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে ; রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইলা ধরিতে শবে! উঠিল চৌদিকে
আর্ত্তনাদ। হাহাকারে দেবনররথী
বেড়িলা সৌমিত্রি-শূরে। কৈলাসসদনে
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী ;—

"মারিল লক্ষ্মণে, প্রভু! রক্ষঃকুলপতি
সংগ্রামে। ধূলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি
সুমিত্রানন্দন এবে! তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত-বৎসল তুমি ; লাঘবিলা রণে
বাসবের বীরগর্ব্ব ; কিন্তু ভিক্ষা করি,
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ! লক্ষ্মণের দেহ।"

হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভদ্র-শূরে ;-
"নিবার লঙ্কেশে, বীর!" মনোরথগতি,
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
বীরভদ্র ;—"যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে,
রক্ষোরাজ! হত রিপু, কি কাজ সমরে?"

স্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা।
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে ;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস ; পশিলা পুরে রক্ষ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি' রক্তাধরে ফিরিলা নিনাদি—
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দিবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়-সঙ্গীতে।

হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা অভিমানে,
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।

—মধুসূদন দত্ত

করাল কাল

করাল কালের কাণ্ড, যেন সব ক্রীড়া-ভাণ্ড,
এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার।
কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
তার কাছে সব একাকার।।

সিংহাসন-অধিষ্ঠাতা, শিরোপরে হেম-ছাতা,
ধাতা প্রায় প্রতাপ যাঁহার।
তাঁহার যেরূপ গতি, অন্নদাস ছন্নমতি,
মরণেতে তারো সে প্রকার।।

যে পথে মান্ধাতা গত, কোটি কোটি কত শত,
সেই পথে যায় দীনগণ।
মান্ধাতা মনুর জন্য, নাহি আর পথ অন্য,
এক পথ আছে চিরন্তন।।

থাকে কিছু কীর্ত্তিলেশ, নামমাত্র থাকে শেষ,
সেই শুদ্ধ কবির কল্যাণে।
কে জানিত যুধিষ্ঠিরে, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণবীরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে।।

কোথায় মাহিষ্মতী, কোথা বা সে দ্বারাবতী,
কোথায় হস্তিনা শৌরসেনী?
কোথায় কৌশাম্বী আর, কিবা চিহ্ন আছে তার,
বহে যথা তটিনীর শ্রেণী।।

যেই পথে তারা গত, সেই পথে অবনত,
ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম।
পাতার কুটীর বলি' কভু কাল মহাবলী,
করে নাই স্বতন্ত্র নিয়ম।।

মধুমাসে মনোহর, সৌরভেতে ভর ভর,
প্রফুল্ল ফুলের কত শোভা।
কিন্তু দেখ নিরখিয়ে, ক্ষণে যায় শুকাইয়ে,
ক্ষোভিত ক্ষুধিত মধুলোভা।।

কালের নাহিক বোধ, নাহি মানে উপরোধ,
বড় সুখে বড় রূপে বাদী।
সুখ-পুষ্প যথা ফুটে, অতি বেগে তথা ছুটে,
কটমট বিকট-নিনাদী।।

কিবা চারু রূপধর, কিবা বহু ধনেশ্বর,
কিবা যুবা নানা গুণধর।
কালের সুভোগ্য সব, হয় তার মহোৎসব,
পেলে হেন খাদ্য পরিকর।।

শোকে তাপে জরা যেই, তাহার বিপক্ষ নেই,
কাল তারে চিবায় সঘনে।
এমন নিদয় আর, ত্রিজগতে মেলা ভার,
শিহরিত শরীর স্মরণে।।

হা রে রে নিদয় কাল! এ কি তোর কর্ম্মজাল,
শোভা না রাখিবি ভব-বনে।
যথা কিছু দেখ ভাল, না ঠাহর ক্ষণকাল,
জালে বদ্ধ কর সেইক্ষণে।।

ওরে রে কৃষক কাল! কি করিছে তব হাল,
জঞ্জাল-জঙ্গল বৃদ্ধি পায়।
উত্তম বাছের বাছ, ফলপ্রদ যত গাছ,
অনায়াসে উপাড়িয়া যায়।।

সুকৃষক যেই হয়, পরিপক্ব শস্যচয়,
সে করে ছেদন সুসময়।
তুই কাল নিদারুণ, নাহি জ্ঞান গুণাগুণ,
কাটিছ তরুণ শস্যচয়।।

ধিক্ কাল কালামুখ! ভারতের কোনো সুখ,
না রাখিলি ভুবন-ভিতর।
কোথা সব ধনুর্দ্ধর, কোথা সব বীরবর,
সব খেয়ে ভরিলি উদর।।

কি আছে এখন আর, দাসত্ব-শৃঙ্খল সার,
প্রতি পদে বাঁধা পদে পদে।
দুর্ব্বল শরীর মন, ম্রিয়মাণ হিন্দুগণ,
তত্ত্বহীন মত্ত দ্বেষ-মদে।।

ফলতঃ সকলি ভ্রম, ঘোরতর মোহ-তম,
সদাচ্ছন্ন মানব-নয়নে।
সুখ-সূর্য্য সুবিমল, বিষাদ বারিদদল,
পরিবর্ত্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে।।

যশোরূপ ইন্দ্রধনু, অসার তাহার জনু,
তনু তনু হয় প্রতি পলে।
কিবা প্রেম কিবা আশা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বাসা,
অচিরাৎ ভস্ম কালানলে।।

সুখ-দুঃখ বলাবল, প্রভুত্ব দাসত্ব বল,
কালচক্রে ঘুরিতেছে সদা।
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে, কভু আগে কভু পিছে,
এই ভাব দেখ যদা তদা।।

ভারতের ভাগ্যজোর, দুঃখ-বিভাবরী ভোর,
ঘুম-ঘোর থাকিবে কি আর?
ইংরাজের কৃপাবলে, মানস-উদয়াচলে,
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার।।

শান্তির সরসী-মাঝে, সুখসরোরুহ রাজে,
মনো-ভৃঙ্গ মজুক হরিষে।
হে বিভো করুণাময়! বিদ্রোহ-বারিদচয়,
আর যেন বিষ না বরিষে।।

– রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সমুদ্র-দর্শন

১

একি এ, প্রকান্ড কান্ড সম্মুখে আমার!
অসীম আকাশ প্রায় নীল জলরাশি;
ভয়ানক তোল্‌পাড়্‌ করে অনিবার,
মুহূর্ত্তেকে যেন সব ফেলিবেক গ্রাসি!

২

আগু পাছু কোটি কোটি কি কল্লোল-মালা!
প্রকান্ড পর্ব্বত সব যেন ধেয়ে আসে;
উহু কি প্রচন্ড রব! কাণে লাগে তালা,
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে!

তুলার বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি,
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায় ;
রাশি রাশি শাদা মেঘ নীলাম্বরে ভাসি,
ঝড়ের সঙ্গেতে যেন ছুটিয়া বেড়ায় !

৪

সমীরণ এমন কোথাও হেরি নাই,
ঝরঝর নিরন্তর লাগে বুকে মুখে ;
ব্রহ্মাণ্ডের বায়ু যেন হ'য়ে এক ঠাঁই,
ক্রমাগত আসে আজি মম অভিমুখে।

৫

ফরফর-নিশান চলেছে পোতশ্রেণী,
টলমল ঢলঢল, তরঙ্গ দোলায় ;
হাসিমুখী পরী সব আলুথালু-বেণী,
নাচন্ত ঘোড়ায় চ'ড়ে যেন ছুটে যায় !

৬

আপনার মনে ওহে উদার সাগর,
গড়ায়ে গড়ায়ে তুমি চলেছ সদাই ;
প্রাণীদের কলরবে পোরা চরাচর,
কিন্তু তব কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই।

আহা সদাশয় সাধু উদার অন্তরে,
থাকেন আপন ভাবে আপনি মগন !
জনতার কলকলে তাঁহার কি করে ?
প্রয়োজন জগতের মঙ্গল-সাধন।

৮

কেন তুমি পূর্ণিমার পূর্ণ সুধাকরে,
হেরে যেন হ'য়ে পড় বিহ্বলের প্রায়?
ফুলে ওঠে কলেবর কোন্ রস-ভরে,
হৃদয় উথলে কেন চারিদিকে ধায়?

৯

অথবা কেনই আমি সুধাই তোমায়,
কার না অমন হয় প্রিয়-দরশনে!
ভালবাসা এ জগতে কারে না মাতায়,
সুখের সামগ্রী হেন কি আছে ভুবনে?

১০

যখন পূর্ণিমা আসি হাসি হাসি মুখে,
উথল হৃদয় 'পরে দেয় আলিঙ্গন;
তখন তোমার আর সীমা নাই সুখে,
আহ্লাদে নাচিতে থাক খেপার মতন।

১১

বড়ই মজার মিত্র পবন তোমার,
তরঙ্গের সঙ্গে তার রঙ্গ নানাতর;
গলা ধরাধরি করি ফিরি অনিবার,
ট'লে ট'লে ঢ'লে ঢ'লে খেলে মনোহর।

১২

বেলার কুসুম বনে পশিয়ে কখন,
সর্ব্বাঙ্গ ভুর্ভুরে করে তার পরিমলে.
ভারে ভারে আনে ফুল চিকণ চিকণ,
আদরে পরায়ে দেয় তরঙ্গের গলে।

১৩

হয়তো হঠাৎ মেতে ওঠে ঘোরতর
তরঙ্গের প্রতি ধায় অসুরের প্রায়;
ভয়ানক দাপাদাপি করে পরস্পর;
পরস্পর ঘোর ঘোষে বিশ্ব ফেটে যায়।

১৪

তব কোলাহলময় কল্লোলের মাঝে,
ছোট ছোট দ্বীপ সব বড় সুশোভন;
যেন কলরবপূর্ণ মানব-সমাজে,
আপনার ভাবে ভোর এক এক জন।

১৫

কোনটিতে নারিকেল তরু দলে দলে,
হালী-গেঁথে দাঁড়ায়েছে মাথায় মাথায়:
তাহাদের মনোহর ছায়াময় তলে,
ধবল ছাগল সব চরিয়া বেড়ায়।

১৬

কারো 'পরে ঘেরে আছে ভয়ংকর বন,
করিছে শ্বাপদ-সংঘ মহা কোলাহল,
নিরন্তর ঝর্ ঝর্ নির্ঝর পতন,
প্রতিশব্দে পরিপূর্ণ গগন-মণ্ডল।

১৭

কোনটির তীরভূমে জল-স্থল জুড়ে,
জাগিছে কঠোর মূর্ত্তি প্রকাণ্ড ভূধর;
খাড়া হ'য়ে উঠে গেছে মেঘ রাশি ফুঁড়ে,
দাঁড়াইয়ে যেন কোন দৈত্য ভয়ংকর!

১৮

কেহ যদি উঠি তার সূচ্যগ্র শিখরে,
হেঁট হ'য়ে দেখে তব তুমুল ব্যাপার,
না জানি কি হয় তার মনের ভিতরে!
কে এমন বীর, বুক নাহি কাঁপে যার?

১৯

'তোমারি হৃদয়ে রাজে ইংলণ্ড দ্বীপ,
হরেছে জগৎ-মন যাহার মাধুরী;
শোভে যেন রক্ষঃকুল-উজ্জ্বল-প্রদীপ
রাবণের মোহিনী কনক-লঙ্কাপুরী।

২০

এ দেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর,
তাঁর তেজোলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা!
কপটে অক্লেশে এসে রাক্ষস দুর্ব্বার,
হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা-সীতা।

২১

হা হা মাতঃ আমরা অসার কুসন্তান,
কোন্ প্রাণে ভুলে আছি তোমার যন্ত্রণা!
শত্রুগণ ঘেরে সদা করে অপমান,
বিষাদে মলিনমুখী সজল-নয়না!

২২

যেন তুমি তপোবন-বাসিনী হরিণী,
দৈবাৎ পড়েছ গিয়ে ব্যাঘ্রের চাতরে,
ধুক্ ধুক্ করে বুক, থরথর প্রাণী,
সতত মনেতে ত্রাস কখন্ কি করে!

২৩

দাঁড়ায়ে তোমার তটে হে মহাজলধি,
গাহিতে তোমার গান, এল এ কি গান!
যে জ্বালা অন্তর-মাঝে জ্বলে নিরবধি,
কথায় কথায় প্রায় হয় দীপ্যমান।

২৪

গড়াও, গড়াও, তুমি আপনার মনে!
কাজ নাই শুনে এই গীত খেদময়,
তোমার উদার রূপ হেরিয়ে নয়নে,
জুড়াক্ এ অভাগার তাপিত হৃদয়!

২৫

ধরাধামে তব সম কেহ নাহি পারে,
বিস্ময়-আনন্দ-রসে আলোড়িতে মন;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে তোমার ভাণ্ডারে,
নিসর্গের তুমি এক বিচিত্র দর্পণ।

২৬

কোথাও ধবলাকার কেবল বরফ,
কোথাও তিমিরময় দেদাব আঁধার,
কোথাও জ্বলন-জ্বালা জ্বলে দপ্ দপ্,
সকল স্থানেই তুমি অনন্ত অপার!

২৭

পুরাকালে তব তটে কত কত দেশ,
ঐশ্বর্য্য-কিরণে বিশ্ব কোরেছিল আলো!
যেমন এখন পরি মনোহর বেশ,
কত দেশ বেলাভূমে সেজে আছে ভালো!

২৮

দেবের দুর্লভ লঙ্কা, ভূস্বর্গ দ্বারকা,
কালের দুর্জয় যুদ্ধে হয়েছে নিধন।
আলো কোরে ছিল রাত্রে যে সব তারকা,
ক্রমে ক্রমে নিবে তারা গিয়েছে এখন!

২৯

কিন্তু সেই সর্ব্বজয়ী মহাবল কাল,
যার নামে চরাচর কাঁপে থরহরি!
আপনার জয়-চিহ্ন, বুঝে চিরকাল
দাগিতে পারেনি তব ললাট-উপরি।

৩০

সত্যযুগে আদি মনু যেমন তোমায়
হেরেছেন, হেরিতেছি আমিও তেমন;
কাল তব সঙ্গে শুধু গড়ায়ে বেড়ায়,
জাহির করিতে নারে বিক্রম আপন।

৩১

যতই তোমার ভাব ভাবি হে অন্তরে,
ততই বিস্ময়-রসে হই নিমগন;
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে,
না জানি কি কাণ্ড আছে ভিতরে গোপন!

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

নভোমণ্ডল

১

ওহে নীলোজ্জ্বল-রূপ গগনমণ্ডল,
অমেয় অনন্ত কাণ্ড, প্রকাণ্ড আকার;
ব্রহ্মের অণ্ডের অর্দ্ধ খণ্ড অবিরল,
গোল হ'য়ে ঘেরে আছ মম চারিধার।

২

তব তলে, এ গম্ভীর নিশীথ সময়,
দেখ প'ড়ে আছি এই ছাদের উপরে;
জগৎ নিদ্রাভিভূত, স্তব্ধ সমুদয়,
ভোঁ ভোঁ করে দশ দিক্, পবন সঞ্চরে।

৩

হেরিলে তোমার রূপ নিশীথ নির্জ্জনে,
অপূর্ব্ব আনন্দ-রসে উথলে হৃদয়;
তুচ্ছ করি নিদ্রা আর প্রিয়া প্রিয়ধনে,
আসিয়াছি তাই আমি হেথা এ সময়।

৪

অসংখ্য অসংখ্য তারা চোকের উপর,
প্রান্তরে খদ্যোত যেন জ্বলে দলে দলে;
স্থানে স্থানে দীপ্তি দেয় নক্ষত্র-নিকর,
কত স্থানে কত মেঘ কত ভাবে চলে।

৫

হালি-গাঁথা ছায়াপথ, গোচ্ছা সেলিহার,
তোমার বিশাল বক্ষে সেজেছে উচিত;
যেন এক নিরমল নির্ঝরের ধার,
সুবিস্তৃত উপত্যকা-বক্ষে প্রবাহিত।

৬

শূন্যে শূন্যে মেঘমালে নাচিয়ে বেড়ায়,
চঞ্চলা চপলামালা তব নৃত্যকরী;
যেন মানসরোবরে লহরী-লীলায়
উল্লাসে সন্তরে সব অলকাসুন্দরী।

৭

কোথা সে চন্দ্রমা তব শির-আভরণ,
পবিত্র প্রেমের যিনি স্পষ্ট প্রতিরূপ,
জগৎ জুড়ায় যাঁর শীতল কিরণ,
যাঁর সুধালোভে সদা চকোরী লোলুপ!

৮

ধরণী দুখিনী আজি তাঁর অদর্শনে,
স্তব্ধ হ'য়ে বসিয়ে আছেন মৌনবতী;
ঢেকেছেন সর্ব্ব-অঙ্গ তিমির বসনে,
প্রিয় পতি অদর্শনে সুখী কোন্ সতী?

৯

প্রাতঃকালে ভ্রমি আমি প্রান্তরের মাঝে
আরক্ত অরুণ ছটা করিতে লোকন;
চক্রাকার বৃক্ষাবলি চারিদিকে সাজে,
তোমায় মস্তক 'পরে করিয়া ধারণ।

১০

সে সময় শোভা তব ধরে না ধরায়,
শ্যামাঙ্গ ছুরিত হয় রতন কাঞ্চনে;
বলাকা নিকটে গিয়ে চামর ঢুলায়,
নলিনী নিরখে রূপ সহাস আননে।

১১

তোমার মেঘের ছায়া দিবা দ্বিপ্রহরে,
গঙ্গার তরঙ্গে মিশে সাজে মনোরম;
শ্বেত, নীল, পদ্মদল যেন একত্তরে—
অযথা স্থানেতে যেন যমুনা-সঙ্গম।

১২

বিকালে দাঁড়ায়ে নীল জলধর-শিরে,
তোমার ললিত বালা ইন্দ্রধনু সতী;
থামায় সান্ত্বনা কোরে বাদল বৃষ্টিরে,
প্রেম যেন শান্ত করে ক্রোধোদ্ধত পতি।

১৩

কেতু তব দেখা দেয়, কখন কখন,
মনোহরা অপরূপা শল্লকী-আকারা:
মুখখানি দীপ্তিমান্ তারার মতন,
সর্ব্বাঙ্গে মুকুতাময়ী ফোয়ারার ধারা।

১৪

চতুর্দ্দিকে মহা মহা সমুদ্রসকল.
লাফায়ে লাফায়ে ওঠে লঙ্ঘি জলধরে;
তোল্‌পাড়্ কোরে করে ঘোর কোলাহল,
তোমার কাছেতে যেন ছেলে-খেলা করে!

১৫

ঘোর-ঘর্ঘর-গর্জ, উদগ্র অশনি,
বেগ-ভরে করে যেন ব্রহ্মাণ্ড-বিদার,
দীপ্ত হ'য়ে ছুটে আসে দহিতে অবনি,
কিন্তু সে নমিয়ে তোমা করে নমস্কার।

১৬

তোমার প্রকাণ্ড ভাণ্ড অনন্ত উদরে,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ বোঁ-বোঁ কোরে ধায়,
কিন্তু যেন তারা সব অগাধ সাগরে,
মাছের ডিমের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

১৭

কত স্থানে কত কত সমীর সাগর,
নিরন্তর তরঙ্গিয়ে হুহু হুহু করে;
আবরি প্রগাঢ় নীলে তব কলেবর,
তাকায়ে রয়েছে যেন প্রলয়ের তরে।

১৮

অহো কি আশ্চর্য্য কাণ্ড তোমার ব্যাপার!
ভাবিয়ে করিতে নারি কিছুই ধারণা,
এ বিশ্বে কিছুই নাই তাদৃশ প্রকার,
কেবল ঈশ্বর সহ সুস্পষ্ট তুলনা।

১৯

ঈশ্বরের ন্যায় তুমি সূক্ষ্ম নিরাকার,
বিশ্বব্যাপী, বিশ্বাধার, বিশ্বের কারণ;
ঈশ্বরের ন্যায় সব ঐশ্বর্য্য তোমার,
অথচ কিছুই নও ঈশ্বর যেমন।

—বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

বৃত্রাসুর ও রুদ্রপীড়

বেষ্টিয়াছে ইন্দ্রপুরী দেব-অনীকিনী,
চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা,
যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভানুতে—
দেবকুল সেইরূপ দিক্ আচ্ছাদিয়া।
দূরস্থিত, সন্নিহিত যত শৈলরাজি
অস্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ প্রভায় উজ্জ্বল
অনন্তের সমুদয় নক্ষত্র বা যথা
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিকে।
প্রাচীরে প্রাচীরে দৈত্য ভীষণাদর্শন—
পাষাণ-সদৃশ বপু দীর্ঘ, উরস্বান্—
নানা অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রম
ভীম দর্পে ভীম তেজে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া,
জাগ্রত, সুসজ্জ, সদা যুদ্ধের সজ্জায়,
ভ্রমে দৈত্য বর্ত্মে বর্ত্মে, স্বর্গ আন্দোলিয়া,
আচ্ছাদি সুমেরু-অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি,
ঘোর শব্দ সিংহনাদ, অম্বর বিদারি!

অস্ত্রবৃষ্টি, শৈলবৃষ্টি, প্রতি অহরহঃ,
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে;
রাত্রি-দিবা যেন শূন্যে নিয়ত বর্ষণ,
বিদ্যুৎ-মিশ্রিত শিলা দিকে দিকে ব্যাপি।
ত্রিদশ-আলয়ে হেন অমর-দানবে
জ্বলিছে সমরবহ্নি নিত্য অহরহঃ;
বেষ্টিত অমরাবতী দেব-সৈন্যদলে।
সুদৃঢ়সঙ্কল্প উভ দেবতা-দনুজে।

অর্ণবের ঊর্ম্মিরাশি যথা প্রবাহিত
অহর্নিশ, অনুক্ষণ, বিরতি-বিশ্রাম,
স্রোতস্বতী বিধাবিত নিয়ত যদ্রূপ
ধারা প্রসারিয়া গতি সিন্ধু-অভিমুখেঃ—
সেইরূপ অবিশ্রাম দানব-অমরে
হয় যুদ্ধ অহরহঃ, স্বর্গ-বহির্দ্দেশে,
জয় পরাজয় নিত্য নিত্য অনিশ্চয়—
দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ত্রিদশে।

সভাসীন বৃত্রাসুর সুমিত্রে সম্ভাষি
কহিছে গর্জন করি বচন কর্কশ—
"যুদ্ধে নৈল পরাজিত এখনও দেবতা
এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে?
সিংহের নিলয়ে আসি শৃগালের দল
প্রকাশে বিক্রম হেন নির্ভয়-হৃদয়ে?
মত্তমাতঙ্গের শুণ্ডে করিয়া আঘাত
শ্বাপদ বেড়ায় হেন করি আস্ফালন?
ধিক্ আজি দৈত্য-নামে! হে সৈনিকগণ!
সমরে অমর ত্রস্ত করিলা দানবে!
কোথা সে সাহস বীর্য্য শৌর্য্য পরাক্রম,
দনুজ যাহার তেজে চির-রণজয়ী?"

সসাগরা বসুন্ধরা যুদ্ধে করি জয়,
প্রকাশিল কতবার অতুল বিক্রম,
নাহি স্থান বসুধার কোথাও এমন,
কম্পিত না হয় আজি দানবের নামে—
পশিলা অমরাবতী জিনিয়া অবনী,
বিস্মিত করিয়া বসুন্ধরাবাসিগণে,
জিনিল স্বরগ যুদ্ধে অদ্ভুত প্রতাপে
মহাদম্ভী সুরকুলে সমরে লাঙ্ঘিয়া;

খেদাইলা দেববৃন্দে পাতালপুরীতে—
শশকবৃন্দের মত—দৈত্য-অস্ত্রাঘাতে
অচৈতন্য দেবগণ ব্যাপি যুগকাল
দুর্নিবার দৈত্যতেজ না পারি সহিতে!
সেই পরাজিত তিরস্কৃত সুরসেনা
আবার আসিয়া দম্ভে পশিল সংগ্রামে;
না পারি জিনিতে তায় সুজিষ্ণু হইয়া
রে ভীরু দানবগণ! নামে কলঙ্কিলা!
আপনি যাইব অদ্য পশিব সমরে;
ঘুচাইব অমরের সমরের সাধ।
আন রে সে শিবশূল—আন রে অমর-
বিজয়ী ত্রিশূল যাহা দানিলা শঙ্কর।"

বলিয়া গর্জিলা বীর বৃত্র দৈত্যপতি,
ধরিলা শিবের শূল সিংহের বিক্রমে।
দেখিয়া ত্রাসিত যত দানবসৈনিক,
বৃত্রাসুর-আস্য হেরি নিস্তব্ধ সকলে;
নিরখে মাতঙ্গযূথ যথা গজপতি
বিশাল বৃক্ষের কাণ্ড উপাড়ি, শুণ্ডেতে
তুলিয়া গগনমার্গে বিস্তারে যখন,
সু-উচ্চ শঙ্খের নাদে বৃংহিত করিয়া।

তখন বৃত্রের পুত্র বীর রুদ্রপীড়—
শোভিতমাণিকগুচ্ছ কিরীট যাহার,
অভেদ্য শরীর যার ইন্দ্রাস্ত্র ব্যতীত,
কহিলা পিতারে চাহি হ'য়ে কৃতাঞ্জলি;—
কহিলা—"হে তাত জিষ্ণু দৈত্যকুলেশ্বর!
অভিলাষ নন্দনের নিবেদি চরণে,
কর অবধান পিতঃ, পুরাও বাসনা,
দেহ আজ্ঞা আমি অদ্য যাই এ সংগ্রামে।

যশস্বিন্! যশঃ যদি সকলি আপনি
মণ্ডিবেন নিজ শিরে, কি উপায়ে তবে
আত্মজ আমরা তব হব যশোভাগী?
কোন্ কালে মোরা তবে লভিব সুখ্যাতি,
কীর্ত্তি, যাহা বীরলভ্য বীরের আরাধ্য,—
বীরের বাঞ্ছিত যশঃ ত্রিভুবনে যাহা,
সকলি আপনি পিতা কৈলা উপার্জন,
কি রাখিলে রণকীর্ত্তি মণ্ডিতে তনয়ে?
ভাবিতে ত হয়, তাত, ভবিষ্যতে চাহি,
সন্ততি পিতার নাম রাখিবে কিরূপে?
জ্বালিলা যে যশোদীপ, প্রদীপ্ত কেমনে
রাখিবে অঙ্গজগণ তব অতঃপরে?
জন্ম বৃথা! কর্ম্ম বৃথা! বৃথা বংশখ্যাতি!
কীর্ত্তিমান্ জনকের পুত্র হওয়া বৃথা,
স্বনামে যদি না ধন্য হয় সর্ব্বলোকে—
জীবনে জীবন-অন্তে চিরস্মরণীয়!
বিভব, ঐশ্বর্য্য, পদ সকলি সে বৃথা,
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের!
পূজ্য সেই কোন কালে নহে কোন লোকে
জলবিম্ববৎ ক্ষণে ভাসিয়া মিশায়!
বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজয়ী,
গৌরব সম্পদ্ তেজঃ নাহি থাকে কিছু,
ভ্রমিতে পশ্চাতে হয় ফেরুবৃন্দবৎ,
দানব-অমর-যক্ষ-মানব-ঘৃণিত!
সুরবৃন্দ পুনর্ব্বার ফিরিবে এ স্থানে,
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট,
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব-চরাচরে,
তেজস্বী দৈত্যের নামে হইয়া শঙ্কিত।
যশোলিপ্সা কদাচিৎ ভীরুরো অন্তরে
উদ্দীপ্ত হইয়া তারে করে বীর্য্যবান্!—

বীরের স্বর্গই যশঃ, যশই জীবন;
সে যশে কিরীট আজি বান্ধিব শিরসে।
কর অভিষেক, পিতঃ, এ দাসেরে আজ
সেনাপতি-পদে তব, সমরে নিঃশেষি
ত্রিংশৎত্রিকোটি দেব, আসিয়া নিকটে
ধরিব মস্তকে দেখ অই পদরেণু।
জানিবে অসুর সুর—নহে সে কেবল
দানবকুলের চূড়া দানবের পতি,
অজেয় সংগ্রামে নিত্য—অনিবার্য্য রণে
অন্য বীর আছে এক—আত্মজ তাঁহার।"

চাহিয়া সহর্ষচিত্তে পুত্রের বদনে,
কহিলা দনুজেশ্বর বৃত্রাসুর হাসি;—
"রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বান্ধিয়া কিরীটে;
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরও ধন্য হও
দৈত্যকুল উজলিয়া দানব-তিলক!
তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রোজ্জ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্য বিন্যাসিয়া!
অনন্ত তরঙ্গময় সাগরগর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে যথা সুখকর;
গভীর শর্ব্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ—
কিংবা সে গঙ্গোত্রী-পার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বতশৃঙ্গে স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া

ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!—
তখন অন্তরে যথা দেহ পুলকিত
দুর্জয় উৎসাহে হয় সুখবিমিশ্রিত,
সমর-তরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।
সেই সুখ, সে উৎসাহ হায় কত কাল
না ধরি হৃদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি,
চিত্তে অবসাদ সদা—কোথাও না পাই
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে লভি পুনর্ব্বার,
নাহি স্থান ত্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে,
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে পড়িয়াছে মলা;
দেখ এ ত্রিশূল-অঙ্গে পড়িয়াছে যথা
সমর-বিরতি-চিহ্ন কলঙ্ক গভীর!
যাও যুদ্ধে তোমা অদ্য করি অভিষেক
সেনাপতি-পদে, পুত্র, অমর ধ্বংসিতে
যাও, যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।"
রুদ্রপীড় প্রফুল্লিত, পিতৃ-পদধূলি
সাদরে লইলা শিরে শুনিয়া ভারতী,
এ হেন সময়ে দূত নৈমিষ হইতে
প্রত্যাগত, সভাস্থলে হ'ল উপনীত।
দূরে দেখি দৈত্যপতি উৎসুক-হৃদয়,
কহিলা, "সন্দেশবহ, কি বারতা কহ।
কিরূপে এ পুরীমধ্যে প্রবেশিলে তুমি?
কোথা ইন্দ্রজায়া শচী, কোথা বা ভীষণ?"

আশ্বস্ত হইয়া দূত কিঞ্চিৎ তখন
কহিতে লাগিলা পুরী-প্রবেশ-উপায়,

বায়ুতে চঞ্চল যথা বিশুষ্ক পলাশ,
রসনা তেমতি দ্রুত বিকম্পিত তার।
কহিলা, "প্রথম যবে আইনু এ স্থানে.
স্বর্গ হ'তে বহুদূরে হিমাচলপথে
উত্তুংগ পর্ব্বত-শৃংগে প্রথম সাক্ষাৎ
হইল আমার দেব-অনীকিনী-সহ;
নানা ছল নানা বেশ বিবিধ কৌশল
আশ্রয় করিয়া পরে হৈনু অগ্রসর,
চিনিতে নারিলা কেহ; অতঃপর শেষে
পুরী-প্রান্তভাগে আসি হৈনু উপনীত।
প্রাচীর-নিকটে আসি অনেক চিন্তিয়া
উদয় হইল চিত্তে, জাগরিত যথা
সূর্য্য আদি দেব যত নিত্য অস্ত্রধারী
ভ্রমে নিত্য অবিরত দ্বার নিরখিয়া।
আসন্ন বিপদ্ চিত্তে হইল উদয়,
জটিল কৌশল এক গূঢ় প্রতারণা—
ঐন্দ্রিলার পিতৃভূমি হিমালয়-পারে,
হয় যুদ্ধ সেইখানে গন্ধর্ব্ব-দানবে,
সেই সমাচার ল'য়ে ত্বরিত-গমনে
ঐন্দ্রিলা-নিকটে যাই, পিত্রাদেশে তার,
দৈত্যকুলেশ্বর বৃত্র মহাবলবান্
সমরে সহায় হন এ তাঁর প্রার্থনা।—
এ প্রস্তাবে দেবগণ শুভ ভাবি মনে
আদেশ করিল মোরে পুরী প্রবেশিতে:
আদেশ পাইবামাত্র পুরীতে প্রবেশ
করিয়া প্রভুর পদে আসি উপনীত:"
শুনিয়া দূতের বাক্য কহে বৃত্রাসুর;—
"এ বারতা দূত তোর অলীক কল্পনা
সঙ্গে শচী ইন্দ্রপ্রিয়া ভীষণ সংহতি—
শচী কি সে সূর্য্য আদি দেবে অবিদিত?"

দানবরাজের বাক্যে দূতের রসনা
হইল জড়তাপূর্ণ কম্পবিরহিত—
যথা নব-কিশলয় বরষার নীরে
আর্দ্রতনু, বিলম্বিত তরুর শাখায়।
সুমিত্র দানব-মন্ত্রী কহিলা তখন,—
"দৈত্যেশ্বর, দূত বুঝি হৈলা অগ্রগামী,
পশ্চাতে ভীষণ ভাবি আসে শচী-সহ:
মঙ্গলবারতা নিত্য তড়িৎ-গমনা।"

নতমুখ নিম্নদৃষ্টি দূত ক্ষুণ্ণমতি,
কহিলা,—"না মন্ত্রি, ব্যর্থ আশ্বাস তোমার
নৈমিষ-অরণ্যে শচী জয়ন্তের সনে
করিছে নির্ভয়ে বাস,—ভীষণ নিহত।"

"ভীষণ নিহত!" গর্জিলা দানবপতি।
"হা রে রে বালক—জয়ন্ত ইন্দ্রের পুত্র,
আমার সংহতি সাধ বিবাদে একাকী!—
দম্ভ তোর এত?" বলি ছাড়িলা নিশ্বাস;
"রুদ্রপীড়, পুত্র, শুন কহি সে তোমারে,"
কহিলা তনয়ে চাহি গাঢ় নিরীক্ষণে—
"যশোলিপ্সা চিতে তব অতি বলবতী,
কর তৃপ্ত জয়ন্তেরে করিয়া আহুতি:
শচীরে আনিতে চাহ অমরাবতীতে,
অন্যথা না হয় যেন, যাহ ধরাধামে:
শত যোদ্ধা সুসৈনিক বীর-অগ্রগণ্য
লহ সঙ্গে অচিরাৎ পালহ আদেশ।"

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সতীশূন্য কৈলাস

ছিন্ন হৈল সতীদেহ, শূন্য হৈল শিবগেহ,
বামদেব বিরসবদন।
চাহেন কৈলাসময়, দেখেন কৈলাস নয়,
অন্ধকার বিঘোর ভুবন।।

সতীমুখ-বিভাসিত, যে আলোক শোভা দিত,
পুলকিত কুসুম-কানন।
পেয়ে যে কিরণমালা সুবর্ণ মণি উজলা,
সে আলোক নহে দরশন।।

শুষ্ক কল্পতরু-সারি শুষ্ক মন্দাকিনী-বারি,
শূন্য কোলে সতীসিংহাসন।
নিস্তব্ধ জগৎপ্রাণ, নিরুদ্ধ সৌরভ-ঘ্রাণ,
কণ্ঠে বদ্ধ বিহঙ্গকূজন।।

নন্দী শুয়ে রেণু'পর, কান্দিছে বৃষভবর,
প্রাণশূন্য মৃগেন্দ্র বাহন।
হেরিয়া ত্রিপুরহর দূরে রাখি বাঘাম্বর,
বসিলেন মুদি ত্রিনয়ন।।

আনন্দ-আলয় যিনি, আজি চিন্তাময় তিনি,
ধ্যানে ধরি সতীদেহ-ছায়া।
ছুঁড়ে ফেলি হাড়মাল, করে দিল ভস্মজাল,
বিভূতিবিহীন কৈলা কায়া।।

মুখে "সতী—সতী" স্বর বিনির্গত নিরন্তর,
দিগম্বর বাহ্যজ্ঞানহীন।
করে জপমালা চলে মুখে ববম্ বলে,
অন্য শব্দ সকলি মলিন।।

জলমগ্ন ফণিমালা মিলাইয়ে জিহ্বাজ্বালা
লুকাইল জটার ভিতর।
নিস্পন্দ পবনস্বন নিরানন্দ পুষ্পগণ
অপ্রস্ফুট ঝরে রেণু'পর।।

থামিল গঙ্গার রব, নির্ব্বাক্ প্রমথ সব,
কৈলাস জগৎ অচেতন।
কদাচিৎ "মা" "মা" নাদে অসংবিৎ নন্দী কাঁদে
বম্ শব্দ সহ সম্মিলন।।

কৈলাস অম্বরময় তারা সূর্য্য অনুদয়
ক্ষণকালে নিবিল সকল।
তমশ্ছন্ন দিগাকাশ কেবলি করে উল্লাস
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠের গরল।।

ধ্যানমগ্ন ভোলানাথ স্কন্ধে কভু তুলি হাত
সতীরে করেন অন্বেষণ।
পরশিতে পুনর্ব্বার সুকুমার তনু তাঁর
মমতার অভ্যাস যেমন।।

তখন নয়ন ঝরে পূর্ব্বকথা মনে সরে
ঝরে যথা নদী-প্রস্রবণ।
বিশ্বনাথ শোকময় নিমীলিত নেত্রত্রয়
প্রস্ফুটিয়া করেন ক্রন্দন।।

হারায়ে অর্দ্ধাঙ্গি সতী কাঁদেন কৈলাসপতি
কেবল সতীর কথা মনে।
জগতের জড় জীব কাঁদিছেন হেরি শিব
কাঁদিতে লাগিল তাঁর সনে।।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভীম ও সুভদ্রা

দ্বিতীয় অংক; প্রথম গর্ভাঙ্ক। পাণ্ডব অন্তঃপুর।

ভীম ও দ্রৌপদী।

ভীম। শুন দেবি, সন্ধি নাহি হইবে স্থাপন।
দুর্য্যোধন করিয়াছে পণ,
সূচ্যগ্র মেদিনী নাহি করিবে প্রদান।
রাখ মতি গোবিন্দের পদে,
একমাত্র পাণ্ডব-ভরসা জনার্দ্দন;
প্রতিজ্ঞাপূরণ তব অবশ্য হইবে,
সমরে কৌরবকুল হইবে নির্ম্মূল!
দুঃশাসন হৃদয় বিদারি'
লো সুন্দরি,— বেণী তব করিব বন্ধন।

দ্রৌপদী। একাদশ অক্ষৌহিণী কৌরবসহায়,
তাহে নারায়ণী সেনা দেছেন শ্রীহরি,
সেও অক্ষৌহিণী একাদশ;
শুনি গুণমণি, কৃষ্ণসম বীর জনে জনে।
না বুঝি কেমনে তবে হবে রণজয়!

ভীম। সুকেশিনি, কিবা হেতু কর লো সংশয়,
যেই লয় কৃষ্ণের আশ্রয়, তার কোথা ভয়?
নিশ্চয় জিনিব রণ, ভেব না ভামিনি।

(সহচরীর প্রবেশ)

সহচরী। দেব, ভদ্রাদেবী মাগিলেন চরণদর্শন।

ভীম। ভদ্রাদেবী! কিবা প্রয়োজন?

(দ্রৌপদীর প্রতি)

যাও সতী, দ্রুতগতি আনহ দেবীরে।

[দ্রৌপদী ও সহচরীর প্রস্থান]

প্রয়োজন মাতার বুঝিতে কিছু নারি,
অবশ্য নহে ত' কোন সামান্য কাহিনী
অমঙ্গল কিছু কি ঘটেছে দ্বারকায়?
কিবা হেতু কল্যাণী আসেন মম পুরে?

(সুভদ্রার প্রবেশ)

সুভদ্রা। করি দেব, চরণ বন্দন,—
সংকটে পড়েছি, পদে রাখ বীরবর।

ভীম। কহ দেবি, কি সংকট তব
কার' সনে ঘটেছে কি বাদ-বিসংবাদ?
শমন কি স্মরণ করেছে কোন জনে?

সুভদ্রা। অবধান ক্ষত্রিয়প্রধান;
স্নানহেতু যাই গঙ্গাতীরে,—
হেরিলাম অনাথ জনেক,
মহা অভিমানে, মানরক্ষার কারণে,
অরিডরে আসিয়াছে পশিতে সলিলে।
পাণ্ডববংশের নারী দেখিতে নারিনু,
পাণ্ডবগৌরব মনে হইল উদয়;
দম্ভ করি দানিনু অভয়;
করি মম আশ্বাসে বিশ্বাস
আসিয়াছে মম বাসে।
আশ্রিত শরণাগত দীন,—
সংকটে ঠেকেছি আজি তাহার কারণে।

ভীম। করিয়াছ কুলরীতিমত গো কল্যাণি,
বিষাদ কি হেতু ভাব মনে?
শরণাগতের তরে ত্যজিতে জীবন
পাণ্ডব না ডরে কভু জান সুবদনি!
বরাননি উদ্বিগ্ন কি হেতু তবে?
অর্জুন কি অসম্মত সাহায্য-প্রদানে?

সুভদ্রা। ডরে তার চরণে করিনি নিবেদন!
ভীম। কেন বৎসে, কিবা ডর?
জান না কি ফাল্গুনিকে তুমি?
ভুবন হইলে অরি গাণ্ডীবী তাহারে
অভয় দানিবে, হবে আশ্রিত যেজন,—
নিষ্কন্টক সুরলোক যার ভুজবলে!
সমাচার দিতে তারে কি আশঙ্কা তব?
সুভদ্রা। দেব, জানি আমি সকল কাহিনী,
শুন শুন বীর গদাপাণি,
পাণ্ডব-আশ্রিত সনে কৃষ্ণের বিবাদ;
শ্রীকৃষ্ণের ডরে,
কেহ তারে না দিল আশ্রয়
অনাথ আইল তাই ত্যজিতে জীবন।
ভীম। সযতনে রাখ দেবি, আশ্রিতে আবাসে,
ধন্য ধন্য পাণ্ডবকুলের তুমি নারী,
ধন্য তুমি যাদব-ঝিয়ারী!
যদ্যপি বিরোধ কভু কৃষ্ণ সনে হয়,—
সম্ভব এ নয়,
রক্ষিব শরণাগতে প্রতিজ্ঞা আমার
কিন্তু মাগো শুনি সমাচার,—
কৃষ্ণ সনে কি হেতু বিবাদ?
সুভদ্রা। অবন্তীর অধিপতি আছিল এ জন।
সুলক্ষণা তুরঙ্গিণী আনে বন হ'তে,
সেই তুরঙ্গিণী চিন্তামণি করিলেন সাধ,
কিন্তু প্রাণসম সে অশ্বিনী তার,
নারিল ভূপতি কৃষ্ণে করিতে অর্পণ।
ভীম। কহ সাধ্বি, কি হইল অতঃপর?
সুভদ্রা। কৃষ্ণভয়ে তুরঙ্গিণী লয়ে পলাইল নরপতি
কামরূপি তুরঙ্গী-বাহনে,—

ত্রিভুবনে করিল ভ্রমণ,
কিন্তু কোথাও না পাইল আশ্রয়!

ভীম। অদ্ভুত আখ্যান;
কেহ তারে নাহি দিল স্থান?

সুভদ্রা। ব্রহ্মলোকে করিলেন বিরিঞ্চি নিরাশ,
কহিলেন বিধি,—"আমি বিধি যাহার কৃপায়,
শত্রু তার শত্রু মম,—তাহারে আশ্রয়?
কদাচিৎ আমা হ'তে সম্ভব এ নয়।"

ভীম। অনুচিত হেন কথা কহিলেন ধাতা!

সুভদ্রা। পরে পুরন্দরপুরে, ধর্ম্মরাজস্থানে,
বরুণসমীপে, উপনীত হৈল ক্রমে ক্রমে।
এক বাক্য সকলে কহিল, স্থান নাহি দিল;
কহিল সকলে,—
"কিংকর কি করে কভু প্রভু সনে বাদ?"

ভীম। আশ্রিতপালন-ধর্ম্ম অমর ভুলিল?

সুভদ্রা। যক্ষ রক্ষ দানব গন্ধর্ব্ব আদি যত,—
নাগ, নর, অষ্টবসু, দিক্‌পালগণ,
বঞ্চিত করিল সবে;
মনে ভয়, হবে ক্ষয় কৃষ্ণের বিগ্রহে!

ভীম। যাও গুণবতি, গৃহে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে।
কুললক্ষ্মী তুমি,
আসিয়াছ বাড়াইতে কুলের গৌরব।
ধর্ম্মনরপতি, চিরদিন ধর্ম্মে তাঁর মতি,
উচ্চকার্য্যে সুযোগপ্রয়াসী সদা,
মহা উচ্চকার্য্য তাঁর হবে পৃথিবীতে
তোমা হ'তে পাণ্ডু-কুলবধূ।
আশ্রিতে আশ্রয়দানে পাণ্ডুপুত্রগণ
অর্জ্জিবে অতুল ধর্ম্ম অমূল্য জগতে।

সে ধর্ম্ম-অর্জন-হেতু তুমি বীরাঙ্গনা।
ধন্য ধন্য দয়াময়ী আশ্রিতপালিনী,
জগন্মাতা অভয়াস্বরূপা ভবে!
হৃদয়ের লহ আশীর্ব্বাদ,
ধর্ম্মসাধ চিরদিন পূর্ণ হ'ক তব।

সুভদ্রা। প্রণাম চরণে, মাগে বিদায় নন্দিনী।

ভীম। যাও বৎসে,
অঞ্জনবিহীনা নিরঞ্জনের ভগিনী।

[সুভদ্রার প্রস্থান।

বিবরণ করিয়া শ্রবণ,—
ধর্ম্মরাজ হইবেন আনন্দে মগন।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। দেব, গোবিন্দ হবেন মম সারথি সমরে।
বহু সৈন্য সংগ্রহ করেছে দুর্য্যোধন,
তথাপি ধার্ম্মিক রাজগণ, স্বপক্ষ হইল সবে;
নিবেদিছি ধর্ম্মরাজপদে সমাচার,
আসিয়াছি নিবেদিতে চরণে তোমার।

ভীম। ভাই, শুনেছ কি অবন্তীরাজার বিবরণ?

অর্জ্জুন। শুনিলাম দ্বারকায়,
রাজ্য ত্যজি সে নাকি গিয়াছে কোথা চলি।

ভীম। আসিয়াছে নরপতি বিরাট-ভবনে,
কৃষ্ণভয়ে পাণ্ডবের লইতে আশ্রয়।

অর্জ্জুন। দণ্ডীরাজ—পাণ্ডব-আশ্রিত?

ভীম। চমৎকৃত হ'য়ো না ফাল্গুনি!
দেব-নাগ-নরে, গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে,
যক্ষ-রক্ষ দিক্‌পাল আদি,—
কৃষ্ণবাদী কে দিবে আশ্রয়?
ধর্ম্মরাজ কার জ্যেষ্ঠ ভাই?

ধর্ম্মনীতি কে শিখিবে ভবে,
ধর্ম্ম-আত্মা ধর্ম্মরাজে না করিলে সেবা?
প্রাণবিসর্জনে, আশ্রিতপালনে,
উপদেশ কেবা দিবে?

অর্জুন। কঠোর ক্ষত্রিয় তুমি বীরকুলোত্তম,
ক্ষত্রধর্ম্ম একমাত্র তুমি অবগত।
কনিষ্ঠ তোমার, দেব, তব অনুগামী;
দিব ঝাঁপ অনলে নিশ্চয়—
আশ্রিত-রক্ষণহেতু!
ভাবি, বীর, নিষ্কন্টক হ'ল দুর্য্যোধন!

ভীম। নিষ্কন্টক দুর্য্যোধন?
কদাচ না ভেব মনে।
ধর্ম্মযুদ্ধে অবশ্য লভিব জয়।
শ্রীহরি ধর্ম্মের সখা,—
স্মরি তাঁরে জিনিব তাঁহারে।
কিন্তু যদি হয় পরাজয়
কন্টকশয্যায় তবু শোবে দুর্য্যোধন!
রাজসূয়ে বৈভব হেরিয়ে
ঈর্ষ্যায় করিল দুষ্ট—ছল অক্ষক্রীড়া
শত্রুগুণে পুনঃ মূঢ় জ্বলিবে ঈর্ষ্যায়
শুনিবে যখন,
পাণ্ডব-আশ্রিতহেতু ত্যজেছে জীবন!
পুনঃ কহি শুন ধনুর্দ্ধর,
উল্লসিত হয় যদি মূঢ় পাণ্ডবের পরাজয়ে
এল গেল কিবা তায়?
রাজ্য লয়ে থাকুক কুশলে।
এস ত্যজি কলেবর অতুল গৌরবে;
দীননাথ হরি শরণাগতের ত্রাণ,
রক্ষিব শরণাগতে তাঁহার স্মরণে।

অর্জ্জুন। রাজা যদি হ'ন অসম্মত?

ভীম। ধর্ম্মরাজ অসম্মত?
বাঞ্ছিত-কর্ত্তব্য-কার্য্য-সুযোগ-উদয়ে
হইবেন ধর্ম্মরাজ অতি উল্লসিত!
জান' ত' নিশ্চিত—
ধর্ম্মপথে মতি-গতি তাঁর।

অর্জ্জুন। দেব, তব পদে শত নমস্কার
হ'ল মম ভ্রান্তি নাশ,—
প্রবুদ্ধ অন্তর তব বীরবাক্য শুনে।
অসম্ভব সম্ভব যদ্যপি হয়,
মক্ষিকায় চালে মেরু,
রণভঙ্গ তব যদি হয় সংঘটন,
যুদ্ধভয় উদয় হৃদয়ে তব,
তথাপি প্রতিজ্ঞা শুন হে বীরকেশরি,
রক্ষিতে আশ্রিতে নাহি ডরিব কেশবে।
সহদেব নকুলে লইয়ে,
চল ভাই ত্বরা যাই নৃপতি-সদনে,—
করি যুক্তি মিলি পঞ্চজনে।

ভীম। যুক্তি কিবা?—নিশ্চয় যুঝিব।

অর্জ্জুন। নিশ্চয়, অগ্রজ বীর্য্যবান্।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

পূর্ব্বস্মৃতি

শারদীয় শুক্লাষ্টমী। সন্ধ্যা সুশীতল
ধীরে মিশাইছে ছায়া কাঞ্চন-বিভায়
দিবসান্তে আতপের;—মিশিতেছে ধীরে
সুখশান্তি ছায়া যেন সন্তাপ-শিখায়।
উঠিছে পূরবে ভাসি ধীরে নীলতর
নীলাম্বর; নীলাম্বরে শুক্ল শশধর।
শারদীয় শুক্লাষ্টমী। কৃষ্ণের নয়ন
রয়েছে চাহিয়া সেই রজত-তিলক
প্রকৃতিললাটে,—স্থির নীলিমা-সাগরে
শুক্ল ফেনখণ্ড যেন। পার্থের নয়ন
রয়েছে চাহিয়া সান্ধ্য নীলাম্বরতলে
সায়াহ্ন-ভূধরশোভা, প্রীতিফুল্ল মন;—
পুরশৃঙ্গ-পূর্ব্বপ্রান্তে বসিয়া দু'জন।

"কেশব!"—ফিরায়ে মুখ বলিলা ফাল্গুনি,
"শুনিয়াছি জনরব সহস্র-জিহ্বায়
কহিতে সহস্ররূপে জীবন তোমার!
বড় সাধ শুনি সেই অদ্ভুত কাহিনী
তব মুখে, সেই সাধ পূরাও আমার।
সেই বাল্যক্রীড়া, সেই কৈশোর-প্রমোদ,
যৌবনের সে বীরত্ব, দেবত্ব তোমার,
সর্ব্বশেষ প্রকৃতির শোভার ভাণ্ডার
রৈবতকে এ দুর্ভেদ্য দুর্গের নির্ম্মাণ,
সিন্ধুগর্ভে দ্বারাবতী অলকাসমান,—
অদ্ভুত কাহিনী সব! আকুল এ মন
শুনিতে তোমার মুখে: কহ নরোত্তম!
কহ লীলাপূর্ণ তব বিগত জীবন!"

কানন কাকলীপূর্ণ; বিহঙ্গনিচয়
গাইতেছে বৃক্ষে বৃক্ষে; পালে পালে পালে
গোদল মহিষদল ফিরিছে আলয়।
তাহাদের হাম্বারব, গল-ঘন্টা-ধ্বনি,
রাখালের উচ্চ বংশীরবে সম্ভাষণ,
ইন্ধনবাহিনী ইন্দুমুখীর সঙ্গীত,
হলবাহী অন্যমনা কৃষকের গীত,
দূরবাহী শৈলানিলে মধুর হইয়া
করিতেছে গিরিশৃঙ্গে অমৃত বর্ষণ।
একটি উপলখণ্ডে পৃষ্ঠ হেলাইয়া
কেশব বসিয়া; স্থির বিশাল নয়নে
নীরবে দেখিতেছিলা শুক্ল শশধর,--
ক্রমে শুক্লতর! সেই রজত-দর্পণে
রয়েছে বিম্বিত যেন বিগত জীবন।
নীরবে শুনিতেছিলা,—কাকলীর স্বনে
বিগত জীবন যেন হ'তেছে কীর্ত্তন।
সে গোপাল, সে রাখাল, গীত সুললিত,—
হ'তেছিল যেন সেই কাব্য অভিনীত।

"অদ্ভুত কাহিনী!"—ধীরে ঈষৎ হাসিয়া
উত্তরিলা—"সত্য পার্থ! অদ্ভুত কাহিনী
আমার জীবন। মিলি শত্রু মিত্র সব
করেছে অদ্ভুততর; পার্থ! সর্ব্বশেষ
করেছে অদ্ভুততম অন্ধ জনরব।
কিন্তু ধনঞ্জয়! এই মহাবিশ্বক্ষেত্রে
কি নহে অদ্ভুত বল? অনন্ত সংসারে
অসংখ্য কুসুম মাঝে একটি কুসুম,
--ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,— শোভা-সৌরভ-বিহীন,
কোথায় যে অরণ্যের নিভৃত কোণায়
ফুটিয়া রয়েছে হায়! অনন্ত নক্ষত্রে

খচিত অনন্ত ওই গগনের তলে,
অসংখ্য জোনাকিমাঝে, একটি জোনাকি
কোথায় যে প্রান্তরের নিভৃত আঁধারে
জ্বলিয়া নিবেছে হায়! অনন্ত জগতে
সংখ্যাতীত পরমাণু, কোথা যে একটি
ক্ষুদ্রতম পরমাণু রহিয়াছে পড়ি
অনন্ত সিন্ধুর গর্ভে! অনন্ত সাগরে
অসংখ্য তরঙ্গমাঝে কোথায় নীরবে
ক্ষুদ্র জলবিম্ব এক সিন্ধু-বিলোড়নে
ফুটিয়া মিশিছে হায়! তাদের জীবন
নহে কি অদ্ভুত পার্থ? তাহারাও এই
নর-জ্ঞানাতীত, এই বিস্ময়-পূরিত,
অনন্ত বিশ্বের অংশ! অহো কি রহস্য!
এই মহাসৃষ্টিযন্ত্রে তাহারাও হায়
কোনো গূঢ় কার্য্য ধ্রুব করিছে সাধিত
অচিন্ত্য; নিষ্ফল সৃষ্টি নহে বিধাতার।
ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্র এক মানব হইতে
হ'তেছে তেমতি কোনো কার্য্যের সাধন,
নহে যাহা ক্ষুদ্র নর-জ্ঞানের অধীন।
ভাব যদি এইরূপ, ভাব যদি মনে,
যেই মহারঙ্গভূমে সৌর-জগতের
হ'তেছে অনন্তব্যাপী মহা অভিনয়
অনন্ত কালের তরে, তুমিও তথায়
করিতেছ রূপান্তরে কত অভিনয়
অনন্ত কালের তরে; আত্মগরিমায়
ভরিবে হৃদয়, পার্থ। তখন তোমায়
পতঙ্গ বলিয়া আর নাহি হবে জ্ঞান।
তখন,—অনন্ত এই অভিনয়স্থানে,
অনন্ত এ অভিনয়ে, তুমিও অনন্ত
অভিনেতা। কি অদ্ভুত! মধ্যম জীবনে

দাঁড়াইয়া এস তবে দেখি, ধনঞ্জয়!
পশ্চাৎ ফিরায়ে মুখ,—দেখি ভবিষ্যৎ
জীবনের ছায়া ভূত-জীবন-দর্পণে।
দেখি তাহে জীবনের কর্ত্তব্যের রেখা
পড়িয়াছে কোন্ রূপ; জীবন-তরণী
সেই রেখা অনুসারি দিব ভাসাইয়া।
ঝটিকাতাড়িত যেই অরণ্য, অর্ণব,
বিশাল ভূধরমালা, হইয়াছি পার,
দেখিয়া হৃদয়ে, পার্থ! পাইব শকতি।
দেখিয়াছি মেঘভাঙ্গা জ্যোৎস্নার মত
যেই সুখ-স্নেহ মুখ—নির্ম্মল, শীতল,—
করিবেক ভবিষ্যৎ আশায় পূরিত।
এস তবে, ধনঞ্জয়! রাখিব লিখিয়া
প্রশস্ত হৃদয়ে তব, বীরচূড়ামণি,
আজি মম জীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস,—
শত্রুর অযথা নিন্দা, মূর্খতা মিত্রের,
সত্যের বিমলালোকে পাইবে বিনাশ।

"স্থান বৃন্দাবন; দৃশ্য যমুনার তীর;
সন্তাপ-হারিণী শান্ত বরিষার শেষ;—
খুলিল জীবনকাব্য। প্রথমাঙ্কে তার
অভিনেতা,—পিতা নন্দ, জননী যশোদা,
সহচর দুই ভাই কৃষ্ণ বলরাম।
শুনেছি শৈশবে, ছাড়ি গোকুলনগর
নানা অমঙ্গল-ভয়ে ভীত গোপগণ
প্রবেশিল বৃন্দাবন নবীন কানন,—
অস্পৃষ্ট নবীন তৃণপল্লবে শ্যামল,
অশ্রান্ত যমুনানিলে সতত শীতল।
গোবর্দ্ধন-পদমূলে, যমুনার কূলে,
তরুলতা-সুশোভিত সেই বৃন্দাবনে,

শৈশবের ঊষা-অন্তে, হইল আমার
প্রকৃতি-প্রভাত সনে জীবন-প্রভাত।

"জীবনে প্রথম স্মৃতি,—প্রভাতে জননী
বাঁধিয়া মস্তকে ক্ষুদ্র চূড়া মনোহর,
সাজায়ে বিচিত্র বাসে ক্ষুদ্র কলেবর,
খাওয়াইয়া সর-ননী, চুম্বিয়া বদন,
বলিতেন—'যাও বাছা! কর গোচারণ;'
শুনিতাম শিঙ্গাস্বরে শ্রীদাম বলাই,
ডাকিতেছে—'আয়! আয়! আয়রে কানাই'।
দেখিতাম হাম্বারবে ডাকি গাভীগণ,
চেয়ে আছে মুখ পানে স্থির দুনয়ন।
পাঁচনি দক্ষিণ করে, বাম করে বেণু,
পৃষ্ঠে শৃঙ্গ, যাইতাম চরাইতে ধেনু।
গোপাল, মহিষপাল বিচিত্র বরণ,
অজ মেষ নানা জাতি, উড়াইয়া ধূলি
যাইত; ছুটিত বেগে ক্ষুদ্র পুচ্ছ তুলি
বৎসগণ; যাইতাম নাচিয়া নাচিয়া
পিছে পিছে দুই ভাই বেণু বাজাইয়া।
শত শত শৃঙ্গ বেণু উঠিত বাজিয়া,
শত শত গোপশিশু মিলিত আসিয়া
নিজ নিজ পাল সহ, সেই সম্ভাষণে,
নবীন উৎসাহে সবে পশিতাম বনে।
সকলি নবীন। নীল নবীন গগনে
হাসিত নবীন রবি; নীলিমা নবীন
ভাসিত কালিন্দী-নীল-নবীন-জীবনে।
নবীন প্রভাতানিল বহিত কাননে
নবীন পল্লবে চুম্বি নবীন শিশির,
নবীন কুসুমরাশি, চুম্বি গোবর্দ্ধনে
নবীন কিরণে ধৌত সৌন্দর্য্য নবীন।

প্রকৃতির নবীনতা,—সদ্য, সুধাময়,—
প্রভাতে করিত পূর্ণ নবীন হৃদয়।

"পশিয়া নিবিড় বনে আনন্দে গো-পাল,
শ্যাম-মখমলসম সুকোমল-তৃণে,
চরিত আপন মনে; আপনার মনে,
গাইতাম, খেলিতাম গোপাল আমরা।
সেই গীত-ক্রীড়া-হাস্য-মধুর পঞ্চমে,—
অনুকরি গোবর্দ্ধন আপনার মনে
গাইত, হাসিত যত, ব্যঙ্গ করি তত
গাইতাম, হাসিতাম আনন্দে আমরা।
'কুশল ত গোবর্দ্ধন?'—প্রভাতে আসিয়া
জিজ্ঞাসিলে গিরিবরে,—ত্রস্তে গিরিবর
'কুশল ত গোপগণ?'—করিত উত্তর।
দুলিতাম কভু শাখে ফলফুলমত;
কভু খাইতাম ফল; আবার কখন
করিতাম মধ্যাহ্নের তাপ নিবারণ
নিবিড় ছায়ায়। তুলি কভু বনফুল
সাজিতাম বনমালী। কভু শৃঙ্গে উঠি
দেখিতাম বৃন্দাবন বিশাল কানন,
যেন ক্ষুদ্র উপবন; রহিয়াছে ফুটি
তৃণাহারী নানা জীব পুষ্পের মতন।
পুণ্য অদ্রি-পদতলে পবিত্র সুন্দর
পুষ্পপাত্র বৃন্দাবন। সৌধসুশোভিত
শোভিত মথুরাপুরী নৈবেদ্যের মত।
অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টি ত্রিবলী সুন্দরী
শোভিত যমুনা,—দুই যূথিকামালার
মধ্যে সুশোভিতা মালা অপরাজিতার।

"সায়াহ্নে আবার বন হইত পূরিত
সুগভীর শৃঙ্গনাদে, বেণুর ঝঙ্কারে।

'শামলী', 'ধবলী', 'লালী'?—বলি উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিত রাখালগণ; আসিত ছুটিয়া
'শামলী', 'ধবলী', 'লালী', লইয়া বদনে
অভুক্ত তৃণের গ্রাস; ঘ্রাণিত আদরে
আপন রাখাল-দেহ;—কত মনোহর
সে নীরব কৃতজ্ঞতা, নির্ব্বাক্ উত্তর।
উড়াইয়া ধূলি, খন্ড জলধর মত
চলিত মন্থরে গৃহে পালে পালে পালে।
মন্দ মন্দ গরজন ঘন হাম্বারব,
বিজলী রাখালবালা, গোপশিশুগণ
নাচাইয়া ধরা চূড়া, পক্ষ-প্রসারিত
শোভিত আবদ্ধমালা বলাকার মত।

*　　　*　　　*

"দশম বৎসর যবে, যমুনার তীরে
একদা মধ্যাহ্নে বসি ভাই দুই জন
একটি বকুলমূলে, শান্ত নীল নীরে
দেখিতেছি নভোনিভ শান্ত নীলিমায়
মধ্যাহ্নকিরণখেলা। ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিগণ
সুবর্ণশফরীমত খেলিছে কেমন
সংখ্যাতীত! অকস্মাৎ দেখিনু সম্মুখে
যদুকুল-পুরোহিত গর্গ মহামতি।
মার্জ্জিত-রজতসম শ্বেত শ্মশ্রুজালে
শোভিতেছে, শ্বেত আলুলায়িত কুন্তলে,
বিভূতিমণ্ডিত শ্বেত প্রসন্ন বদন,
শারদ-জলদাবৃত শশাঙ্ক যেমন।
শ্বেত পরিধান, শ্বেত উত্তরীয় বুকে;
শ্বেত মর্ম্মরের মূর্ত্তি স্থাপিত সম্মুখে।
পদতলে যমুনার বেলা মনোহর,
শ্বেত মর্ম্মরের বেদী পবিত্র সুন্দর।

"দেবমূর্ত্তি স্থিরভাবে চাহি মম পানে
কহিলেন—'বৎস কৃষ্ণ! যেই গ্রহগণ
আছে ঝলকিত তব অদৃষ্ট-গগনে,
তব পরিণাম, বৎস, নহে গোচারণ।
জন্মি আর্য্য-হিমাদ্রির সর্ব্বোচ্চ শিখরে
দুই কীর্ত্তিস্রোতস্বতী দুইটি নির্ঝরে,
উড়াইয়া বিঘ্নরূপী শত ঐরাবত,
বিদারিয়া প্রতিকূল শৃঙ্গ শত শত,
গঙ্গাযমুনার মত তটিনীযুগল
মিলিবেন অর্দ্ধপথে;—সেই সম্মিলন
মানবের মহাতীর্থ। স্রোত সম্মিলিত
ছুটিবে অপ্রতিহত, করিয়া বিলীন
শত শত কীর্ত্তিস্রোত, করিয়া মোচন
দলিত ধরার ভার, হইবে পতিত
মানবের অদৃষ্টের মহাপারাবারে,—
অনন্ত অতলস্পর্শ! ব্যাপি ভবিষ্যৎ
ঢালিবেক শত মুখে অজস্র ধারায়
পতিত-পাবন সুধা অনন্ত অমৃত।
তব গোচারণক্ষেত্র হবে বসুন্ধরা,
সমগ্র মানবজাতি গোপাল তোমার:
ভ্রমিবে সংসারারণ্যে হ'য়ে দিক্‌হারা
দেখি পদচিহ্ন, শুনি বেণুর ঝঙ্কার।
স্থিরভাবে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিয়া মিলিত—
নর-নারায়ণ-মূর্ত্তি!—রহিবে সতত
সর্ব্বধ্বংসী কালস্রোতে হিমাদ্রির মত।
গ্রহগণ মিথ্যাবাদী নহে কদাচন।
মহাব্রতে ব্রতী তুমি! আইস গোপাল,
আজি শুভক্ষণে আমি করিব দীক্ষিত
পূত-যমুনার জলে নিভৃতে দু'জনে।
শস্ত্রে, শাস্ত্রে যথাবিধি করিব শিক্ষিত

উভয়ে নিভৃতে; বৎস! গোপের কুমার,
তোমাদের অধ্যয়নে নাহি অধিকার'।"

"এ কি ভবিষ্যদ্‌বাণী! মধ্যম জীবনে
যাহার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিনি এখনো,
শিশু গোরক্ষক তাহা বুঝিবে কেমনে?
অবগাহি যমুনার পবিত্র সলিলে,
পড়ি দুই ভাই দুই চরণে ঋষির
করিলাম প্রণিপাত। পবিত্র সলিলে,
চাহি আকাশের পানে গলদশ্রুনীরে,
করিলেন সংস্কার; ভাই দুই জন
পাইলাম যেন, পার্থ, নবীন জীবন।
গোচারণ-অবসরে, অদূরে আশ্রমে
মহর্ষির, শিখিতাম নিভৃতে উভয়ে
নানা শস্ত্র, নানা শাস্ত্র। সেই শিক্ষাবলে
শুনিয়াছ ধনঞ্জয়, কৈশোরে কেমনে
বধিলাম অঘ, বক, প্রলম্ব, পূতনা,
হিংসাকারী পশুপক্ষী, অনার্য্য তস্কর,
করিলাম কোন মতে কালীয় দমন,—
মহাপরাক্রমী নাগ,—ভয়েতে যাহার
গোপ-গাভী না পারিত ভ্রমিতে কাননে
নির্ভয়ে, করিতে পান যমুনার জল।

"কিশোর বয়স যবে, পার্থ, এক দিন
পশিয়াছি গোচারণে নিবিড় কাননে
বহুদূর। অকস্মাৎ ছাইল গগন
নিবিড় জলদজাল, হইল পতিত
ঘোর সন্ধ্যাচ্ছায়া যেন কাননশোভায়।
তট-বিঘাতিনী দূর সিন্ধুর নির্ঘোষে

আসিতেছে বারিধারা; দুই, চারি, দশ,—
পড়িতে লাগিল ফোঁটা; ছুটিল গো-পাল
হাম্বারবে উচ্চপুচ্ছে তরুর আশ্রয়ে।
আমরা রাখালগণ বালকবালিকা,—
কেহ গিরিকোটরেতে, কেহ তরুতলে
প্রশস্ত পল্লবছত্রে,—লইনু আশ্রয়।
কেহ বনকদলীর, কচুর পাতায়
নিবারিছে বৃষ্টিধারা; মেঘ-প্রস্রবণ
অবিরল জলধারা করিছে বর্ষণ।

* * *

"থামিল বর্ষণ; বেলা তৃতীয় প্রহর।
হাসিল কাননশোভা সজলা শ্যামলা
মেঘমুক্ত রবি-করে। কাতরে আমারে
কহিল রাখালগণ—'গোষ্ঠ বহু দূর;
কি খাইব বল, প্রাণ ক্ষুধায় আকুল?'
দেখিনু অদূরে বহু ঋষির আশ্রম;
বলিলাম—'ভিক্ষা তরে যাও সখাগণ।'
ব্রাহ্মণ যজ্ঞের অন্ন না দিল রাখালে,—
নীচ গোপজাতি! শ্রান্ত বালকবালিকা
ক্ষুধাতুর ম্লানমুখে আসিল ফিরিয়া।
ক্রোধে বলরাম গর্জি বলিলা তখন—
'লুটিব আশ্রম চল!' নিবারিয়া তারে
কহিনু—'গোপনে ঋষিপত্নীগণ কাছে
চাহ গিয়া ভিক্ষা সবে। রমণী-হৃদয়,
শৈলময় সংসারের জাহ্নবী-আলয়,
দ্রবিল, বহিল গঙ্গা,—ঋষিপত্নীগণ,
দেখিতে অসুর-ত্রাস কৃষ্ণ বলরাম,
গোপনেতে অন্ন সহ আসিয়া কাননে
করিলেন শিশুদের ক্ষুধা নিবারণ।

সেই দয়া, সেই প্রীতি, স্নেহ-পারাবার,—
কাননে দ্বিতীয় বর্ষা হইল সঞ্চার!
চিকুর-প্রপাত মেঘ; বিজলী সে হাসি;
সুশীতল বারিধারা স্নেহসুধারাশি!
কেবল দুইটি শিশু না করিল পান
বারিবিন্দু! কে তাহারা? কৃষ্ণ, বলরাম!

"একাকী নির্জনে এক তরুর ছায়ায়,
একটি উপলখণ্ডে করিয়া শয়ন,
চাহি অনন্তের শান্ত দীপ্ত নীলিমায়,
ভাবিতেছি,—জীবনের ভাবনা প্রথম,—
একই মানব সব; একই শরীর;
একই শোণিত-মাংস, ইন্দ্রিয়সকল;
জন্ম মৃত্যু একরূপ; তবে কি কারণ
নীচ গোপজাতি, আর সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণ?
চারি বর্ণ; চারি বেদ; দেবতা তেত্রিশ;
নিরমম জীবঘাতী যজ্ঞ বহুতর;
জন্ম মৃত্যু; ধর্ম্মাধর্ম্ম;—ভাবিতে ভাবিতে
হইলাম তন্দ্রাগত। ক্রমে দিঙ্‌মণ্ডল
কোটী কোটী চন্দ্রালোকে উঠিল ভাসিয়া।
দেখিলাম সুশীতল আলোক-সাগরে
শোভিছে সহস্রদল। মৃণাল তাহার
ক্ষুদ্র বসুন্ধরা শ্যামা, রয়েছে স্থাপিত
অনন্ত আলোক-গর্ভে। শতদল-দল
শোভিতেছে সংখ্যাতীত সবিতৃমণ্ডল।
নয়নে লাগিল ধাঁধা। দেখিলাম যেন
বিরাট্-মূরতি এক পদ্মে অধিষ্ঠিত।
চতুর্ভুজ, চতুর্দ্দিক্; শোভিতেছে করে
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম; শোভে সমুজ্জ্বল
কিরণকিরীট হার কুণ্ডল কেয়ূর।

কিরণের পীতবাস, অনন্ত অসীম,
শোভে নীলমণিময় মহাকলেবরে,—
কিরণের উৎস সেই কিরণ-সাগরে।
অনন্ত অচিন্ত্য এক কি মহা-শকতি
সেই মহাবপুঃ হ'তে হইয়া নিঃসৃত,
রবি-করে করে যথা স্ফটিক দীপিত,
করিতেছে মহাপদ্ম নিত্য বিমথিত।
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র পরমাণু তার
হইতেছে রূপান্তর; কিন্তু অনির্ব্বাণ,
প্রভাকর-কর স্বচ্ছ স্ফটিকে যেমতি।
সেই জ্ঞানাতীত শক্তি, সেই মহাপ্রাণ,
অবিচ্ছিন্ন সর্ব্বত্রই আছে বিদ্যমান,
করিয়া অচিন্ত্য এক একত্ববিধান!
হইল বিরাট্-ধ্বনি—'দেখ, অন্ধ নর!
প্রকৃতির পুরুষের মহাসম্মিলন,—
একমেবাদ্বিতীয়ম্!—পূর্ণ সনাতন!
প্রকৃতি পদ্মিনী; শক্তিরূপী নারায়ণ,—
নরের আশ্রয়, বিষ্ণু, সর্ব্বভূতময়!
উভয় অনন্ত, নিত্য, উভয় অব্যয়!
জন্মমৃত্যু রূপান্তর। দেখ অধিষ্ঠিত
বিশ্বাম্বুজে বিশ্বেশ্বর! হ'তেছে জ্ঞাপিত
জ্ঞান-পাঞ্চজন্যে নীতিচক্র সুদর্শন।
নীতির লঙ্ঘন-পাপ হ'তেছে দণ্ডিত
ভীষণ গদায়; পুণ্য-নীতির পালন
শত-সুখ-শতদল করিছে বর্দ্ধন।'
শুনিলাম—'একজাতি মানবসকল;
এক বেদ—মহাবিশ্ব, অনন্ত অসীম;
একই ব্রাহ্মণ তার—মানব-হৃদয়;
একমাত্র মহাযজ্ঞ—স্বধর্ম্ম-সাধন;
যজ্ঞেশ্বর—নারায়ণ। সন্দিগ্ধ মানব!

আপনার কর্ম্মক্ষেত্রে হও অগ্রসর,
দেখিয়া কর্ত্তব্য-রেখা, জ্ঞানের আলোকে,
বিস্তৃত সম্মুখে পুণ্যভাগীরথীমত!
সুদর্শন-নীতিচক্রে নমি ভক্তিভরে,
কর্ম্মস্রোতে জীব-তরী দেও ভাসাইয়া!'
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে শতদল-দল
মিশাইল গ্রহে গ্রহে; মৃণাল, ধরায়;
নীল অনন্তের সনে নীল কলেবর।

"সুখস্বপ্নশেষে শিশু জননীর কোলে
জাগিয়া যেমতি দেখে মায়ের বদন
প্রেমপূর্ণ; দেখিলাম জাগিয়া তেমতি
বন-প্রকৃতির মুখ, প্রীতি-পারাবার।
কি এক নবীন শোভা, আলোক নবীন,
কিবা এক কোমলতা, শান্তি, পবিত্রতা,
পড়িতেছে উছলিয়া! বালক-হৃদয়,
বালকের ক্ষুদ্র প্রাণ, গেল মিশাইয়া,
সেই প্রকৃতির সনে; মিশিল তুষার
অনন্ত সলিলে, গীত, যন্ত্রের সুতানে
হইল মধুর লয়! সমস্ত জগৎ
আমার শরীর। আহা! সমস্ত প্রাণীতে
আমার হৃদয়-প্রাণ! গাইল সমীর
কি যেন গভীর গীত! কহিল প্রকৃতি
কি যেন গভীর কথা! ভরিল হৃদয়
কি উচ্ছ্বাসে, কি উৎসাহে! জানু পাতি ভূমে
বহুক্ষণ রহিলাম কি যেন চাহিয়া
অনন্ত আকাশপটে। অশ্রু দুই ধারা
নীরবে বহিতেছিল—যমুনা, জাহ্নবী।

"'কৃষ্ণ!'—কে ডাকিল? ত্রস্তে ফিরায়ে নয়ন
দেখিনু অসুর এক স্তম্ভিতের মত

দাঁড়াইয়া পার্শ্বে মম। লইনু সাপটি
শরাসন। স্থিরমূর্ত্তি ঈষৎ হাসিয়া
কহিল—বীরেন্দ্র! কর ত্যাগ শরাসন;
নহি শত্রু আমি তব। অন্যথা তোমার
হইত না নিদ্রাভঙ্গ আজি কদাচন।
চাহি সন্ধি; নহে যুদ্ধ বাসনা আমার।
শুনিয়াছ তুমি কৃষ্ণ! দুরন্ত কংসের
অত্যাচার?

আমি। শুনিয়াছি।

অসুর। এস তবে মিলি
শার্দ্দূলের রক্ততৃষা করি নিবারণ।

আমি। কংস মথুরার পতি; গো-রক্ষক আমি,—
পতঙ্গ হিমাদ্রি কাছে।

অসুর। যেই পরাক্রম
কাননের অংকে অংকে হয়েছে অংকিত,
নাগেন্দ্র কালীয়বক্ষে, অসুর-হৃদয়ে,—
নহে পতঙ্গের তাহা।

আমি। অসহায় আমি!

অসুর। হইব সহায়। হবে সহায় তোমার
গোপজাতি যথা তথা শতসংখ্যাতীত,
সমগ্র মথুরাবাসী।

আমি। বিনা দেবকীর
অষ্টম-গর্ভের পুত্র, শুনেছি, অসুর,
অবধ্য অন্যের কংস।

অসুর। কোথায় সে শিশু?

আমি। শুনিয়াছি, নাগরাজ বাসুকি আপনি
রাখিয়াছে লুকাইয়া।

অসুর। তাঁর পুত্র আমি!
"হইলাম প্রতিশ্রুত করিব না আর
নাগজাতি বিদলিত। কাঁদিত হৃদয়

কংস-অত্যাচারে ঘোর, স্বজাতি-নিগ্রহে,
উগ্রসেন-কারাবাসে; কাঁদিত সতত
বসুদেব-দেবকীর নিদারুণ শোকে;—
মানব-হৃদয়-ধর্ম্ম, রহস্য নিগূঢ়,
কে বুঝিতে পারে আহা! হইনু দীক্ষিত
মথুরা-উদ্ধার-ব্রতে; কর্ত্তব্যের রেখা
স্বপ্নাদিষ্ট দেখিলাম অঙ্কিত হৃদয়ে।

"অনুসারি সেই রেখা, হইয়া চালিত
কি অজ্ঞাত শক্তিবলে বলিতে না পারি,
নিবারিনু ইন্দ্রযজ্ঞ। যজ্ঞে জীবঘাতে
পাইতাম বড় ব্যথা। করিনু প্রচার,—
'কেবা ইন্দ্র? বর্ষে মেঘ স্বভাবে চালিত,
সঞ্জীবনী সুধারাশি; স্বভাবে চালিত
ভ্রমে রবি, শশী, তারা; বহে সমীরণ।
স্বভাব-নিয়ন্তা এক বিষ্ণু বিশ্বেশ্বর;
স্বভাবের অনুবর্ত্তী বিশ্ব চরাচর।
গোপালন আমাদের স্বভাব সুন্দর;
গো-ব্রাহ্মণ, গোবর্দ্ধন পূজ্য আমাদের।
পূজ তাহাদেরে, কর স্বধর্ম্ম-পালন;
পূজি বিশ্ব, পূজ বিশ্বরূপ নারায়ণ।
দেও গো-মহিষে নব তৃণ সুকোমল!
দিয়া গোবর্দ্ধনে নানা অন্ন উপহার,
কর বিতরণ তাহা ব্রাহ্মণে চণ্ডালে!
সাজায়ে গো-পাল, সাজি গোপগোপীগণ,
আনন্দে শকটে কর গিরি-প্রদক্ষিণ!

"ভাদ্র-মাস; যমুনার সদ্যোবিপ্লাবিত,
সদ্য বরিষায় ধৌত, সদ্য সুসজ্জিত

স্বভাব-মন্দিরে, উচ্চ স্বভাবের বেদী
পুণ্য গোবর্দ্ধনশিরে, হইল পূজিত
স্বপ্নদৃষ্ট মহামূর্ত্তি! হলো প্রতিষ্ঠিত
গোপদের নিরমল হৃদয়গগনে
নবীন ধর্ম্মের বীজ নক্ষত্রের মত।

"ইন্দ্র-উপাসক অজ্ঞ ব্রাহ্মণসকল
অন্ধ অনুচর সৈন্যে, মেঘমালা সম,
আচ্ছাদিল গোবর্দ্ধন; করিল বর্ষণ
শরজাল অনিবার মুষলধারায়।
কি যে শক্তি নারায়ণ করিলা প্রদান
অশিক্ষিত গোরক্ষকে, করিয়া সহায়
বলদেব, গোপগণ, সপ্ত দিবানিশি
মূঢ় ইন্দ্র-উপাসক সৈন্য-প্রতিকূলে
বাহুবলে গোবর্দ্ধন করিনু ধারণ।
সপ্ত দিন শত্রুগণ হইয়া মথিত
গোপমথনের দণ্ডে, পৃষ্ঠ দেখাইয়া
পলাইল বায়ুভরে মেঘদল যথা,
নবীন ধর্ম্মের ধ্বজা হইল স্থাপিত
গোবর্দ্ধনশিরে, পার্থ, উড়িল আকাশে
সুনীল পতাকা বক্ষে শ্বেত সুদর্শন।

"সেই পুণ্য-পতাকার ছায়া সুশীতল
করিবে কি আচ্ছাদিত সমস্ত ভারত
আ-হিমাদ্রি-পারাবার? হইয়া স্থাপিত
ভারতসাম্রাজ্যগর্ব্বে ধ্বজাদণ্ড তার
পতিত ভারতবর্ষ করিবে উদ্ধার?
সে দিন হইতে সেই কিশোর গোপাল
হইল সরল গোপ-আরাধ্য ঈশ্বর।

সে দিন হইতে যেই ভক্তি-প্রস্রবণ
বহিতে লাগিল, গোপ-গোপাঙ্গনাগণ
গেল ভাসি সেই স্রোতে; ভাসিলাম আমি
সরল ভক্তির সেই প্রথম উচ্ছ্বাসে।

"গেল বর্ষা, ধনঞ্জয়! আসিল শরৎ।
মেঘভাঙ্গা, পৌর্ণমাসী কত মনোহর
নীল যমুনার তীরে, শ্যাম বৃন্দাবনে!
ঈষৎ ঈষৎ হাসি আসিল যখন
শরতের সুশীতল সুচন্দ্রা শর্ব্বরী,
যূথিকা জ্যোৎস্নামাখা কাননবিতানে
যূথিকা জ্যোৎস্নারূপা গোপাঙ্গনা সহ,
রাসোৎসবে গোপগণ হইল মগন।
বনফলে বনফুলে, ফুল্ল শতদলে,
ফুল্ল যমুনার জলে, হইলা পূজিত
নারায়ণ শতদল-আসনে আসীন,—
বন-শোভা ফুলফলে নবীন পল্লবে
নির্ম্মিত মন্দিরে সদ্য, সদ্য মনোহর
পত্রে পুষ্পে সুসজ্জিত মূরতি সুন্দর।
নরনারী শিশু বৃদ্ধ নাচি সংকীর্ত্তনে
গাহিতেছে 'হরিনাম' আনন্দে মধুরে।
সরল পবিত্র কণ্ঠ প্লাবিছে পুলিন,
প্লাবিছে যমুনাগর্ভ, শারদ গগন।
প্রেমেতে অধীর নরনারী সংখ্যাতীত
কেহ বা মূর্চ্ছিত, কেহ আকুল হৃদয়ে
সেই হরিনামামৃত করিতেছে পান।

*　　　*　　　*

"প্লাবিয়া সঙ্গীত-পূর্ণ আনন্দের ধ্বনি,
শারদ-কৌমুদী-ধৌত নির্ম্মল গগনে

সহসা ধ্বনিল শঙ্খ; সুদর্শনরূপে
চলিল সুধাংশু আগে; চলিলাম আমি
স্বপনে চালিত ক্ষুদ্র বালকের মত
আত্মহারা; পশিলাম নিবিড় কাননে।
মিশাইল শঙ্খধ্বনি, মিশাইল ধীরে
সুদর্শন সুধাংশুতে, সুধাংশু আকাশে,—
মূর্চ্ছিত হইয়া, পার্থ, পড়িনু ভূতলে।

"তৃতীয় প্রহর নিশি মূর্চ্ছান্তে, অর্জুন!
দেখিলাম যমুনার পুলিনে বিবশা
আত্মহারা গোপাঙ্গনা খুঁজিছে আমায়,
জননী যশোদা সহ, উন্মাদিনীপ্রায়।
আমাকে পাইয়া পুনঃ প্রেমেতে অধীরা
নাচিতে লাগিল সবে ধরি করে কর,
মম নাম, কীর্ত্তি-গান, গাইয়া গাইয়া;
পড়িল পুলিনে কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া।
কেহ দাসীভাবে মম সেবিল চরণ;
কেহ মাতৃস্নেহে মম চুম্বিল বদন;
কেহ সখীভাবে বক্ষে করিল ধারণ;
কেহ বা বিবশা প্রেমে দিল আলিঙ্গন!
পতি পুত্র পিতা মাতা ভুলেছে আলয়,
আমি পতি, আমি পুত্র, সখা প্রেমময়।
সেই ভক্তি, সেই প্রেম,—ভক্তির চরম,—
কিশোর শিশুতে সেই আত্ম-সমর্পণ;
নাহি জ্ঞান, নাহি ইচ্ছা, হৃদয় তন্ময়,—
অর্জুন! ধর্ম্মের ক্ষেত্র রমণী-হৃদয়!

* * *

আসিল বসন্ত পার্থ! দেখিতে দেখিতে
বসন্তের প্রীতিপূর্ণ শেষ পৌর্ণমাসী,—

পূর্ণ চন্দ্রমুখী বামা। বিমুক্ত-কবরী
নীলাকাশ; কুন্তলাগ্র সজ্জিত কুসুমে
ব্যাপিয়াছে ধরাতল; অলক-আঁধারে
মার্জ্জিত রজতকান্তি প্রীতি-প্রস্রবণ!
প্রীতির উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইল হৃদয়।
প্রীতিভরে নারায়ণে পূজিয়া আবার
বসন্তের ফলে, পুষ্পে, পলাশে, মন্দারে,
করিলাম প্রতিষ্ঠিত বসন্ত-উৎসব।
কিশোর-কিশোরী, ফুল্ল যুবক-যুবতী,
প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, সাজি সবে বাসন্তী বসনে
আনন্দ উৎসবে পূর্ণ করিল কানন।
ফাল্গুনের ফল্গূৎসব দেখেছ ফাল্গুনি!—
কি আর কহিব আমি? আবির, কুঙ্কুম
আবরিয়া বৃন্দাবন ছাইল গগন,
সায়াহ্নে সিন্দূরমাখা মেঘমালামত
ভাসিল কালিন্দীবক্ষে; বহিল সমীরে;
ছুটিল অসংখ্য জলযন্ত্র প্রস্রবণে।
এক দিকে কোমলতা; বীর্য্য অন্যতরে।
জ্যোৎস্না আতপে রণ। ভুজ শরাসন;
আবির-কুঙ্কুম-শর উভয়ে বর্ষণ
করিতেছে অবিরল। কভু বামাগণ
করিতেছে পলায়ন মানি পরাভব,—
নিবিড় কুন্তল-মেঘে, মেঘনাদমত,
বিদ্যুৎ বরণ ঢাকি; উচ্চ হাস্যধ্বনি
বাজিছে বিজয়-শঙ্খ পূরিয়া কানন।
ধীর সমীরণে, তীরে নীরে যমুনার,
বহিছে সঙ্গীতস্রোত রহিয়া রহিয়া।
কেহ নাচে, কেহ গায়, শাখায় শাখায়
দুলিতেছে নরনারী বিচিত্র দোলায়
শত শত; দুলিতেছে বাসন্ত অনিলে

জীবন্ত কুসুমগুচ্ছ। কুসুমদোলায়
দোলাইছে বনমালী সাজায়ে আমায়,
সুমধুর সংকীর্ত্তনে নাচিয়া নাচিয়া,
বরষিয়া সুবাসিত আবির কুঙ্কুম
অজস্র ধারায়, প্রেমে বিবশ অধীর।
বহিছে যমুনা প্রেমে, হাসিছে জ্যোৎস্না,
হাসিতেছে বৃন্দাবন প্রেমে ফুল্লমন।

"প্রেমে উচ্ছ্বসিত সেই আনন্দ-কাননে
আসি ছদ্ম-গোপবেশে নাগ শত শত,
সেই উৎসবের স্রোত করিল বর্দ্ধন
দিবানিশি ধীরে ধীরে। গভীর নিশীথে
নাগ-গোপ-সেনা দশ সহস্র দুর্জয়,
ধীরে যমুনার মত বহিল নীরবে
নিদ্রিত মথুরা পানে; হইল সঞ্চিত
নগর অদূরে ঘন নিবিড় কাননে।
বাসন্তী পূর্ণিমা-নিশি পোহাল যখন,
পোহাল কংসের পাপ-জীবন-স্বপন।

"কেমনে নগরে পশি দধিদুগ্ধবাহী
ছদ্ম-সেনাদল সহ কিশোরযুগল
আক্রমিনু দুর্গদ্বার; ঘোর ভেরীনাদে
প্লাবিনু মথুরা দশ সহস্র সেনায়;
ভাঙ্গিলাম যজ্ঞধনু; বধিলাম শেষে
কংসরাজে দ্বন্দ্বযুদ্ধে; হাসিতে হাসিতে
করিলাম বিনা যুদ্ধে মথুরাবিজয়;—
শুনিয়াছ সব্যসাচী! মুহূর্ত্তে তখন
পশিনু বিদ্যুদ্‌বেগে কংস-কারাগারে।

অহো! কি যে শোকদৃশ্য দেখিনু নয়নে!
অষ্ট সন্তানের শোকে শোকাতুর মুখ
অশ্রুতে অঙ্কিত, ঘোর-যন্ত্রণা-মণ্ডিত,
দীর্ঘ-জটা-সমাচ্ছন্ন! অশ্রুরেখাবাহী
তখনো দুইটি ক্ষীণ ধারা অবিরল
বহিতেছে শোকপূর্ণ! কহিল বাসুকি—
'বীরেন্দ্র! সম্মুখে তব জনক জননী!'
'জনক জননী মম!'—মূর্চ্ছিত হইয়া
উভয়ের পদমূলে পড়িতে ভূতলে,
পড়িলাম সেই স্বর্গে,—হতভাগ্য আমি!—
জীবনে প্রথম সেই জননীর কোলে!

"শুনিয়াছ ধনঞ্জয়! জামাতার শোকে
শোকার্ত্ত মগধেশ্বর সপ্তদশবার
আক্রমি মথুরাপুরী, হ'ল পরাজিত
সপ্তদশবার রণে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে,
তরঙ্গে তরঙ্গে এই সমরপ্রবাহ
ষোড়শ সহস্র মম বীর অনুপম
নিল ভাসাইয়া; পূর্ণ হইল মথুরা
অনাথার হাহাকারে; পড়িল সরিয়া
নাগপতি সৈন্য সহ ঘোর মনোবাদে।
দেখিলাম দিব্য চক্ষে, নহে উগ্রসেন
শত্রু মগধের। পার্থ! দেখিলাম শেষ,
বৃথা শোণিতের স্রোতে কালের প্রবাহে
জীবনের ব্রত মম যেতেছে ভাসিয়া।
রৈবতকে এই দুর্গ করিয়া নির্ম্মাণ,
সিন্ধুগর্ভে ওই পুরী, বিদীর্ণ হৃদয়ে
ষোড়শ সহস্র সেই অনাথার সহ
ত্যজিলাম ব্রজভূমি। ত্যজিলাম হায়

শৈশবের স্নেহ-স্বর্গ অংক যশোদার;
কৈশোরের ক্রীড়াঙ্গন চারু বৃন্দাবন;—
যমুনাপুলিন; সেই মথুরা নবীন
যৌবনের রঙ্গভূমি; জীবন-নাটকে
খুলিল দ্বিতীয় দৃশ্যে অংক অন্যতর!"

—নবীনচন্দ্র সেন

কীর্ত্তিনাশা

১

সকলি কি স্বপ্ন! বল' ছিল কি এখানে
অভ্রভেদী সেই একবিংশতি রতন?
যেই সৌধচূড়া হ'তে বিশাল পদ্মায়,
বোধ হ'তো ঠিক উপবীতের মতন?
সে বিশাল রাজপুরী ছিল কি এখানে,
পড়িয়াছে ছায়া যার বঙ্গ-ইতিহাসে?
যাহার বিশাল ছায়া লঙ্ঘিয়া পদ্মায়,
প'ড়েছিল এদেশের হৃদয়-আকাশে?

২

সে রাজনগর এ কি? সকলি স্বপন!
স্বপনের মত সব গেছে লুকাইয়া!
বঙ্গ-সিংহাসন ছিল আকাঙ্ক্ষা যাহার,
একটি ইষ্টক তার নাহি নিদর্শন!
অনল-সলিল-গর্ভে পড়িল ভাঙ্গিয়া
কর্ত্তা, কীর্ত্তি,—কি সাদৃশ্য! পশিল অতল
চক্র, চক্রী; হায়! এই বিষময় ফল,
অমর কলংকমাত্র রহিল কেবল।

৩

কীর্ত্তিনাশা মানবের ভীষণ শিক্ষক।
ইষ্টক উপরে করি ইষ্টক স্থাপন,
লভিবারে অমরতা বাসনা যাহার,—
লিখিতে বাসনা যার রজতের ধারে
কালগর্ভে অমরতা, আসি একবার
রাজবল্লভের এই কীর্ত্তির শ্মশানে,
দেখুক তোমার নীরে স্তম্ভিত-নয়নে
তাহার অদৃষ্টলিপি; ভাবী সমাচার
তব মৃদু কলকলে শুনুক শ্রবণে!

৪

মরি কিবা অভিমানে যাইছ বহিয়া—
সন্ধ্যালোকে কীর্ত্তিনাশা! আনন্দে যেমতি
বিজয়ী বীরেন্দ্র যায় মৃদু-মন্দগতি
উপেক্ষি' বিজিত শত্রু, চলেছ তেমতি
উপেক্ষিয়া ভগ্ন তীর। কি শান্ত হৃদয়—

গণা যায় একে একে তারকাসকল
প্রতিবিম্বে নীল জলে! কি স্রোত মধুর
ঝরিবে না গোলাপের কামিনীর দল।

৫

এত অভিমান যদি; ধর তবে, নদি,
ধর একবার সেই ভীষণ আকার,
রাজবল্লভের পুরী গ্রাসিলে যেরূপে।
ভীষণ-ঘূর্ণিত স্রোতে ছাড়িয়া হুঙ্কার
অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে, তরঙ্গ-ফুৎকারে
প্রকম্পিত দিঙমণ্ডল করি বিধূনিত,—
যে মূর্ত্তিতে বালকের ক্রীড়াযষ্টিমত,
ডুবালে সে কীর্ত্তিরাশি, কল্পনা-অতীত,—

৬

ধর' সেই মূর্ত্তি,—আমি দেখাব তোমায়
বঙ্গ-ইতিহাসের সে পৃষ্ঠা ভয়ঙ্কর।
দেখাব বিপ্লব-চিত্র, ঘূর্ণচক্রে যার
ডুবিলেন এই রাজনগর-ঈশ্বর!
তুচ্ছ এই ক্ষুদ্রপুরী,—সেই ঝটিকায়
একটি বিশাল রাজ্য পড়েছে ভাঙ্গিয়া।
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র শাস্তি,—দেখহ চাহিয়া
কি শাস্তি পশ্চাতে তুমি গিয়াছ রাখিয়া!
তুচ্ছ তব ক্ষুদ্র সৃষ্টি, ওই বালুচর—
একই নিশ্বাসে যাহা পার মিশাইতে,—
সে বিপ্লবে যেই রাজ্য গিয়াছ সৃজিয়া
না ধরে শকতি কাল কণা খসাইতে!

৭

দূর হোক ইতিহাস : দেখ একবার
মানব-হৃদয়-রাজ্য। দেখ নিরন্তর
বহিতেছে কি ঝটিকা! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কতই গগনস্পর্শী হর্ম্ম্য মনোহর
ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
কত রূপান্তর তার! উঠিছে জাগিয়া
কতই নূতন সৃষ্টি, কত পুরাতন
নয়ন না পালটিতে যাইছে ভাসিয়া!

৮

কীর্ত্তিনাশা!—কিবা নাম, কিবা অভিমান,
পার তুমি মানবের কি কীর্ত্তি নাশিতে?
বঙ্গ-ইতিহাসের সে কাল-পৃষ্ঠা হ'তে
একটি অক্ষর তুমি পার কি মুছিতে?
মুছিলে যেমন এই ধরাপৃষ্ঠ হ'তে
রাজবল্লভের কীর্ত্তি, পার কি মুছিতে
সেই পৃষ্ঠা হ'তে সেই কলুষিত নাম?
সেই পৃষ্ঠা অন্যরূপ পার কি লিখিতে?

৯

কীর্ত্তিনাশা! বৃথা নাম! বৃথা অভিমান!
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্ত্তি নাশিতে তোমার?
নাশিতে করের সৃষ্টি সর্ব্বশক্তিমান্,
মানস সৃষ্টিতে তব নাহি অধিকার!
ভারতের পরাক্রান্ত নৃপতিনিচয়
হয়েছে অদৃশ্য সহ রাজ্য-সিংহাসন,

ত্রিকালের সীমা ওই দেখ নিরূপিয়া
দাঁড়ায়ে রয়েছে তিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
নশ্বর জোনাকিরাশি গিয়াছে নিবিয়া,
অমর তারকাবলি রয়েছে চাহিয়া।

১০

তুচ্ছ তুমি কীর্ত্তিনাশা! মহাকাল-স্রোত
ওই দেখ দূর হ'তে যাইছে নমিয়া
তাহাদের কীর্ত্তিরাশি। কর-পরশনে
চন্দ্রবংশ, সূর্য্যবংশ রয়েছে বাঁচিয়া!
একটি চরণ-রেণু যেই পুণ্যবান্
পাইয়াছে, তার কীর্ত্তি করিতে বিনাশ
নাহিক শকতি তব, পারিবে না তুমি,
কীর্ত্তিনাশা! কিংবা কাল সর্ব্ব-কীর্ত্তিগ্রাস।

১১

আমি কীর্ত্তি-হীন নর; না ডরি তোমায়,
তব সংহারক মূর্ত্তি ধর', কীর্ত্তিনাশা!
তব ভগ্ন তীরে ওই মূলশূন্য তরু,
আমার অধিক রাখে জীবনের আশা।
তাহারো ফলিবে ফল, ফুটিবে কুসুম;
নিষ্ফল জীবন মম। পড়েছে ঝরিয়া
আছিলা যে কটি ফুল, থাক সেই তরু,
দয়া করি কীর্ত্তিহীনে নেও ভাসাইয়া।

—নবীনচন্দ্র সেন

অতুল

১

শরতের শুক্লা ষষ্ঠী—যামিনী সুন্দর
লইয়া পাথালি কোলে শিশু শশধর,
ছাড়িয়া সূতিকাগার-তমঃ সুগভীর,
গগন-অঙ্গনে যেন হয়েছে বাহির!
এসেছে পাড়ার মেয়ে তারা সমুদয়,
দেখিতে বিধুর মুখ সুধার নিলয়!
আনন্দ-সলিলে ভাসে কুমুদ নির্মল,
পুলকে পাগল যেন চকোরের দল,
উপবনে হাসে যত কুসুম-বালিকা,
সুগন্ধ রজনীগন্ধা স্বর্ণ-শেফালিকা!
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল উল্লাস,
জননী-স্নেহের আজ বিল্ব-অধিবাস!

বাজে শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে ঢাক-ঢোল,
পাড়া পাড়া, বাড়ী বাড়ী মহা গণ্ডগোল ;
এসেছে প্রবাসী পিতা পতি পুত্র ভাই,
আনন্দ-সাগরে যেন ভাসিছে সবাই!
নূতন বসন আর নূতন ভূষায়,
সুখের সজীব বিম্ব শিশু শোভা পায়!
খেলিতেছে নব বেশে বালক-বালিকা,
স্বস্তিক-মঙ্গল মুখে পারিজাতে লিখা!
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল মিলন,
জননী-স্নেহের আজ মহা উদ্বোধন!

২

একখানি গ্রাম ভাসে জলময় মাঠে,
গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোঁটা সাগর-ললাটে!
একখানি বাড়ী তায় আঁধার কেবল,
কলঙ্কী শশাঙ্ক তার পরিচয়-স্থল!
জগৎ উজ্জ্বল যার রজত-কিরণে,
সে নহে সমর্থ তার তমো-নিবারণে!
জড়ের জীবন জাগে অমৃতে যাহার,
শত মৃত্যু ঢালে তাহে সুধাকর তার!
কোমল শীতল আলো তারার হীরক,
অযুত অঙ্গার-খণ্ড জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্!
জগৎ-জীবন স্নিগ্ধ শীত সমীরণ,
সেও যেন বহে বুকে বাষ্পীয় মরণ!
ডাকিছে নিশায় কাক—সেও অমঙ্গল,
উপরে আকাশ কাঁপে নীচে কাঁপে জল!
পেচক কর্কশ কণ্ঠে দেয় রূঢ় তালি,
একটী মায়ের বুক রহিয়াছে খালি!
দুই হাতে অভাগিনী টেনে ছিঁড়ে চুল,
চীৎকারে আকাশ ভাঙ্গে—'অতুল! অতুল'!

৩

অস্ত গেছে দশমীর দীপ্ত শশধর,
আচ্ছাদিয়া অন্ধকারে আকাশ-গহ্বর ;
যেন কার ভবিষ্যের ভীষণ উদরে,
তারকার স্বপ্নগুলি হাবুডুবু করে!

তৃতীয় প্রহর গত—নিখিল ভুবন
একই শয্যায় শুয়ে ঘুমে অচেতন।

তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল!
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্ব্বত,
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহাশয্যাবৎ!
নিরাশায় নিষ্পেষিত মহা মরুভূমে,
কত বক্ষ অস্থিচূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে!
ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল,
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল!
দিগ্‌বদ্ধ শ্যামমাঠ অনিবদ্ধ নীবি,
স্খলিত-অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী!
অনন্ত শান্তির সুধা ভুঞ্জিছে সবাই,
একটী মায়ের চোখে শুধু ঘুম নাই!
চিরদাহ-জাগরণ তার বুকে দিয়া,
ঘুম যায় চিতাচুল্লী নিবিয়া নিবিয়া!

দাঁড়ায়ে বাহির বাড়ী অভাগী জননী
ভাবিতেছে শূন্যপানে চেয়ে একাকিনী.
আসিয়াছে বাড়ী বাড়ী ছেলেপিলে সব,
বিজয়ার বিসর্জ্জন-উৎসব নীরব!
কোলে নিয়া জননীরা আপন সন্তান,
কপোলে দিয়েছে চুম্ব শিরে দূর্ব্বাধান।
সকলে পেয়েছে বুকে বুকভরা ধন,
আমার অতুল দেরি করে কি কারণ?

অরুণের অগ্র জ্যোতি মৃদু পরকাশ,
প্লাবিয়া রজত-স্বর্ণে পূরব আকাশ!
অভাগিনী পাগলিনী আনন্দে ভাসিয়া,
দুই ভুজ মেলে যায়, কোলে নিতে গিয়া

চীৎকারে, 'অতুল মোর আসিতেছে অই,'
খুঁজিতে উড়িল কাক—'ক-ই, ক-ই, ক-ই?'
মূরছিয়া ধরাতলে পড়িলা জননী,
তুলিতে সহস্র কর মেলে দিনমণি!
শেফালী ঝরিল আগে তারকা নিবিল,
রজনী সজনী তার শোকে প্রাণ দিল?

দেখিল পাড়ার শেষে লোকজন জমি,
জননী-স্নেহের সেই বিজয়া দশমী!

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

বধূ

"বেলা যে প'ড়ে এলো, জল্‌কে চল্‌,"—
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে-জল।
কোথা সে-বাঁধাঘাট, অশথ-তল।
ছিলাম আনমনে একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে "জল্‌কে চল্‌"।।

কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।

গভীর থির নীরে, ভাসিয়া যাই ধীরে,
পিক কুহরে তীরে অমিয়-মাখা।
পথে আসিতে ফিরে, আঁধার তরু-শিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা।।

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি',
সেখানে ছুটিতাম সকালে উঠি'।
শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো র'য়েছে ফুটি'।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনে' ফুলে ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে ব'সে থাকি,
আঁচল পদতলে প'ড়েছে লুটি'।।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এ-ধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁসে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে, যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।।

হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া।
বিরাট্ মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া!
কোথা সে খোলা-মাঠ, উদার পথঘাট
পাখীর গান কই, বনের ছায়া।।

কে যেন চারি দিকে দাঁড়িয়ে আছে
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে।
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।

আমার আঁখিজল কেহ না বোঝে!
অবাক্ হ'য়ে সবে কারণ খোঁজে।
"কিছুতে নাহি তোষ, এ ত বিষম দোষ,
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ও যে।
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি
ও কেন কোণে ব'সে নয়ন বোজে।।"

কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ,
কেহ বা ভালো বলে, বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।।

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন ক'রে কাটে সারাটা বেলা।
ইটের 'পরে ইট, মাঝে মানুষ-কীট,
নাইক ভালোবাসা নাইক খেলা।।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস্ হাঁ গো।
উঠিলে নব শশী, ছাদের 'পরে বসি
আর কি উপকথা বলিবি না গো।

হৃদয়-বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা, আঁখিজলে রজনী জাগো।
কুসুম তুলি' লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।।

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে।
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।
নিমেষ তরে তাই আপনা ভুলি'
ব্যাকুল ছুটে' যাই দুয়ার খুলি'।
অমনি চারি ধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি'।।

দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।
ডাক্ লো ডাক্ তোরা, বল্ লো বল্—
"বেলা যে প'ড়ে এলো, জল্‌কে চল্।"
কবে পড়িবে বেলা ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস্ যদি কেহ আমায় বল্!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ষশেষ

(১৩০৫ সালে ৩০শে চৈত্র ঝড়ের দিনে রচিত)

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা
গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জনছায়া সঞ্চারিয়া,
হানি' দীর্ঘ ধারা।
বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান,
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্ব্বশেষ গান।।

ধূসর পাংশুল মাঠ, ধেনুগণ ধায় ঊর্দ্ধমুখে,
ছুটে চলে চাষী,
ত্বরিতে নামায় পা'ল নদীপথে ত্রস্ত তরী যত
তীরপ্রান্তে আসি'।
পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘে সায়াহ্নের পিঙ্গল আভাস
রাঙাইছে আঁখি,—
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ শূন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলে যায়,
উৎকণ্ঠিত পাখী।।

বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝঙ্কার-ঝঞ্জনা,
তোলো উচ্চসুর,
হৃদয় নির্দ্দয়-ঘাতে ঝর্ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর।

গাও গান প্রাণভরা ঝড়ের মতন ঊর্দ্ধবেগে
অনন্ত আকাশে।
উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা
বিপুল নিশ্বাসে।।

আনন্দে আতঙ্কে মিশি—ক্রন্দনে উল্লাসে গরজিয়া
মত্ত হাহারবে
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
নৃত্য হোক তবে।
ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত্ত-আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

মুক্ত করি' দিনু দ্বার, আকাশের যত বৃষ্টি ঝড়
আয় মোর বুকে
শঙ্খের মতন তুলি' একটি ফুৎকার হানি' দাও
হৃদয়ের মুখে।
বিজয়গর্জন-স্বনে অভ্রভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গল নির্ঘোষ,
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্ম্মম
কঠিন সন্তোষ।।

সে পূর্ণ উদাত্ত ধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্র-সম
সরল গম্ভীর
সমস্ত অন্তর হ'তে মুহূর্ত্তে অখণ্ড মূর্ত্তি ধরি'
হউক বাহির।

নাহি তাহে দুঃখ-সুখ পুরাতন তাপ-পরিতাপ
কম্প লজ্জা ভয়,
শুধু তাহা সদ্যঃস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়।।

হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি',
পুঞ্জপুঞ্জ রূপে,
ব্যাপ্ত করি' লুপ্ত করি' স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে
ঘন ঘোর স্তূপে।
কোথা হ'তে আচম্বিতে মুহূর্ত্তেকে দিগ্‌দিগন্তর
করি' অন্তরাল
স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর তোমার সঘন অন্ধকারে
রহ' ক্ষণকাল।।

তোমার ইঙ্গিত যেন ঘন গূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,—
তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ুগর্জ্জে আসে,—
তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ম বেগে
বিদ্ধ করি' হানে,
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে।।

এবার আসোনি তুমি বসন্তের আবেশ-হিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি',
এবার আসোনি তুমি মর্ম্মরিত কূজনে গুঞ্জনে,—
ধন্য ধন্য তুমি।

রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছো বিজয়ী রাজসম
গর্ব্বিত নির্ভয়,—
বজ্রমন্দ্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম,—
জয়, তব জয়।।

হে দুর্দ্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল।
জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি' চতুর্দ্দিকে
বাহিরায় ফল—
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি' বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব্ব আকারে
তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হ'য়েছো প্রকাশ,—
প্রণমি তোমারে।।

তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ, শ্যামল,
অক্লান্ত, অম্লান।
সদ্যোজাত মহাবীর, কী এনেছো করিয়া বহন
কিছু নাহি জানো।
উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের—
জ্বলদর্চ্চি-রেখা ;
করজোড়ে চেয়ে আছি ঊর্দ্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা।।

হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান
ঝনন রণন,
বক্ষের পঞ্জর ভেদি' অন্তরেতে হউক কম্পিত
সুতীব্র স্বনন।

হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী,
করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াবো উঠি', আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
অর্পিব পরাণ।।

চাবো না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি',—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জ্জন করি'।।

শুধু দিন-যাপনের শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয় :
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি'
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।।

যে-পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথ-প্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট্ স্বরূপ
যুগ-যুগান্তের।

শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন ক'রে ঊর্ধ্বে ল'য়ে যাও
পংককুণ্ড হ'তে,
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি ক'রে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।।

তারপরে ফেলে দাও, চূর্ণ করো যাহা ইচ্ছা তব,
ভগ্ন করো পাখা।
যেখানে নিক্ষেপ কর হৃতপত্র, চ্যুত পুষ্পদল,
ছিন্নভিন্ন শাখা,
ক্ষণিক খেলনা তব, দয়াহীন তব দস্যুতার
লুণ্ঠনাবশেষ,
সেথা মোরে ফেলে দিয়ো অনন্ত-তমিস্র সেই
বিস্মৃতির দেশ।।

নবাংকুর ইক্ষুবণে এখনো ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বিশ্রামবিহীন :
মেঘের অন্তরপথে অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে
চ'লে গেল দিন।
শান্ত ঝড়ে, ঝিল্লীরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে,
মুক্ত বাতায়নে
বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি' দিনু অঞ্জলিয়া
নিশীথ-গগনে।।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অমৃতবার্ত্তা

একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে
কে তুমি, মহান্ প্রাণ কী আনন্দবলে
উচ্চারি' উঠিলে উচ্চে, 'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি'
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।'

আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি'
সে মহা-আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্ত বাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্তে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্ত্তা।
রে মৃত ভারত!
শুধু এক সেই আছে, নাহি অন্য পথ।

--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপ্রমত্ত

যে ভক্তি তোমারে ল'য়ে ধৈর্য্য নাহি মানে,
মুহূর্ত্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
দ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
ান্ত উচ্ছল-ফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি, নাথ।।

দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধাপূর্ণ করি মঙ্গলকলস
সংসারভবনদ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর—সর্ব্ব কর্ম্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভচেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে, সর্ব্ব প্রেমে দিবে তৃপ্তি,
সর্ব্ব দুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্ব্ব সুখে দীপ্তি
দাহহীন।।

সংবরিয়া ভাব-অশ্রু-নীর
চিত্ত রবে পরিপূর্ণ অমত্ত গম্ভীর।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাঙা মন্দির

১

পুণ্যলোভীর নাই হ'ল ভিড় শূন্য তোমার অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
অর্ঘ্যের আলো নাই বা সাজালো পুষ্পে প্রদীপে চন্দনে
যাত্রীরা তব বিস্মৃতপরিচয়।
সম্মুখ-পানে দেখো দেখি চেয়ে,
ফাল্গুনে তব প্রাঙ্গণ ছেয়ে
বনফুলদল ঐ এল ধেয়ে উল্লাসে চারিধারে।
দক্ষিণবায়ে কোন্ আহ্বান
শূন্যে জাগায় বন্দনাগান,
কী খেয়াতরীর পায় সন্ধান আসে পৃথ্বীর পারে।
গন্ধের থালি, বর্ণের ডালি আনে নির্জ্জন অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
বকুল শিমুল আকন্দফুল কাঞ্চন জবা রঙ্গণে,
পূজাতরঙ্গ দুলে অম্বরময়।

২

প্রতিমা না-হয় হয়েছে চূর্ণ, বেদীতে না-হয় শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
না-হয় ধূলায় হ'ল লুণ্ঠিত আছিল যে-চূড়া উন্নতা,
সজ্জা না থাকে কিসের লজ্জাভয়?
বাহিরে তোমার ঐ দেখো ছবি,
ভগ্নভিত্তিলগ্ন মাধবী,
নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি হেরিয়া হাসিছে স্নেহে।

বাতাসে পুলকি' আলোকে আকুলি'
আন্দোলি' উঠে মঞ্জরীগুলি
নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি' প্রাচীন তোমার গেহে।
সুন্দর এসে ঐ হেসে হেসে ভরি' দিল তব শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
ভিত্তিরন্ধ্রে বাজে আনন্দে ঢাকি' দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য 'জয় জয়'।

৩

সেবার প্রহরে নাই আসিল রে যত সন্ন্যাসী-সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
নাই মুখরিল পার্ব্বণ-ক্ষণ ঘন জনতার গর্জ্জনে,
অতিথিভোগের না রহিল সঞ্চয়—
পূজার মঞ্চে বিহঙ্গদল
কুলায় বাঁধিয়া করে কোলাহল,
তাই তো হেথায় জীববৎসল আসিছেন ফিরে ফিরে।
নিত্যসেবার পেয়ে আয়োজন
তৃপ্তপরাণে করিছে কূজন,
উৎসবরসে সেই তো পূজন জীবন-উৎসতীরে।
নাইকো দেবতা ভেবে সেই কথা গেল সন্ন্যাসী-সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
সেই অবকাশে দেবতা যে আসে, প্রসাদ-অমৃত-মজ্জনে
স্খলিত ভিত্তি হ'ল যে পুণ্যময়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐকতান

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্ত্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব কত না অপরিচিত তরু
র'য়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন ;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—
এই সুরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক
র'য়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা-একতান
কত না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।
দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়,
আমার অন্তরে বারবার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।

দক্ষিণ মেরুর ঊর্দ্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা,
সে আমার অর্দ্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা ক'রেছে স্পর্শ অপূর্ব্ব আলোকে।
সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানাদিক্ হ'তে—
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ ;
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ—
নিখিলের সংগীতের স্বাদ।।

সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্ব্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হ'য়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল ;—
বহুদূর-প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্ম্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্ব্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

জীবনে জীবন যোগ করা
না হ'লে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা—
আমার সুরের অপূর্ণতা
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্ব্বত্রগামী।।

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্ম্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা ক'রেছে অর্জ্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি' কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারিনি দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজদুরি।
এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্ব্বাক মনের
মর্ম্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।
প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাওতো উদ্ধারি'।
সাহিত্যের ঐকতান-সংগীত-সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—

মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি :—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাগরিকা

সাগর-জলে সিনান করি' সজল এলোচুলে
বসিয়া ছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির 'পরে কুটিল-রেখা লুটিল চারিপাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকর-চূড় মুকুটখানি পরি' ললাট 'পরে,
ধনুক-বাণ ধরি' দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী,
কহিনু, "আমি এসেছি পরদেশী।।"

চমকি' ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি' শিলা-আসন ফেলে,
সুধালে, "কেন এলে?"
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুল-বনে।"
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতী, তুলিনু চাঁপাফুল।
দুজনে মিলি' সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু একমনে।
(কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল-যে পরকাশি'
ধূর্জ্জটির মুখের পানে পার্ব্বতীর হাসি।।)

সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরি-শিখর 'পরে,
একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতী-মালা মাথে,
কাঁকন দুটি ছিল দু'খানি হাতে।
চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি
"অতিথি আমি," কহিনু দ্বারে আসি'।
তরাস-ভরে চকিত-করে প্রদীপখানি জেবলে,
চাহিলে মুখে, কহিলে, "কেন এলে?"
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে।"
চাহিলে হাসি-মুখে,
আধো-চাঁদের কনক-মালা দোলানু তব বুকে।।

মকর-চূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতন-সাজ করিল ঝলমল।

মধুর হোলো বিধুর হোলো মাধবী নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
পূর্ণ-চাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগর-জলে দোলে।।

ফুরাল দিন কখন্ নাহি জানি,
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আমার তরী-খানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এল সাগর-তলে দারুণ ঢেউ তুলে'।
লবণ-জলে ভরি'
আঁধার রাতে ডুবাল মোর রতন-ভরা তরী।
আবার ভাঙ্গা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে,
ভূষণ-হীন মলিন দীনবেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউল-দ্বার খুলি'
তেমনি ক'রে র'য়েছে ভ'রে ডালিতে ফুলগুলি।।

হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
তরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগর-জলে যবে,
নীরব তব নম্র নতমুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।
দেখিনু চুপে-চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত-কলিত কল্লোলে।।

মিনতি মম শুন হে সুন্দরি,
আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপ-খানি ধরি'।

এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুক-বাণ নাহি আমার হাতে,
এবার আমি আনিনি ডালি দখিন সমীরণে
সাগর-কূলে তোমার ফুল-বনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কি না।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাজাহান

এই সৌধরাজিপানে চাহি যতবার
অতল বিস্ময় মাঝে তত ডুবে যাই।
সৌন্দর্য্যে পুণ্যের বাস। ভাবিয়া না পাই,
ভ্রাতৃরক্তে সিংহাসনে অভিষেক যার,
এত শুভ্রতার মাঝে কেমনে বিহার
করিত সে। বিধি, যারে স্নেহ দাও নাই,
তারে কেন আঁখি দিলে, তোমারে শুধাই?
অথবা প্রস্তরে হিয়া গঠেছিলে তার?-
মুছে গেছে ধরা হ'তে শোণিতের দাগ,
রুধির-রঞ্জিত হস্ত ধূলি-পরিণত,

সে হস্তের শ্বেত শোভা করিতে প্রচার,
এই উচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ রয়েছে সজাগ ;
প্রিয়ার প্রণয় তার জানাইছে কত,
তাজ, দীন ভারতের রত্ন অলংকার।

—কামিনী রায়

বর্ষামঙ্গল

অয়ি শ্যামাঙ্গিনি ধনি, অয়ি বর্ষা করুণারূপিণি!
ম্লান নেত্রে দর দর বিগলিত একি বারি ঝরে,
বিরহিণী ব্রজবধূ যেন আহা হ'য়ে উন্মাদিনী
ঝঙ্কারিছে বীণা, সেই রাগিণীর অক্ষরে অক্ষরে
ভাঙ্গি' পড়ে হিয়া তার আহা মরি গলিয়া ঝরিয়া!
হে বরষা! হে সুধাপরশা! তুমি বসুধার তরে
গোপনে সঞ্চিত করি' রেখেছিলে কত না অমিয়া!
সুধাবৃষ্টি, পুষ্পবৃষ্টি শিখিয়াছ বলো কার বরে?
নিবিড় কুন্তলজাল হেরি' তব হে মনোমোহিনি,
আনন্দে অধীর আজি, একি নৃত্য ধ'রেছে শিখিনী :
একি গান ধরিয়াছে চাতকিনী, মেদুর অম্বরে।

২

তব অদর্শনে দেবি! উষ্ণশ্বাসে আকুলা ব্যাকুলা
ভয়ত্রস্তা বসুন্ধরা ছিল আহা দুটি আঁখি বুজে,
স্পর্শে তব হর্ষে আহা আজি সে গো বাসন্ত-দুকূলা
একি পুষ্পময় চেলি ঝিলিমিলি সবুজে সবুজে!

হে মোহিনি! নীপে নীপে ঢালি' দিয়া অমৃত-মদিরা
জাগায়েছ অঙ্গে অঙ্গে অপরূপ অপূর্ব্ব পুলক!
সোহাগে আদরে যত্নে চুম্বি' তার শিরা উপশিরা
জাগায়েছ যূথিকার অঙ্গে অঙ্গে অমৃত কোরক!
প্লাবিয়াছ চারিধার কি সৌরভে, লাবণ্য-জোয়ারে!
কোলভরা করিয়াছ বসুধারে পুষ্পের সম্ভারে,
রঞ্জিয়াছ পুষ্পে পুষ্পে ধরিত্রীর বিচিত্র অলক!

৩

বসন্তের রাণী যবে করে ল'য়ে ফুটন্ত গোলাপ,
কুন্তলে অশোকগুচ্ছ, কমকণ্ঠে কর্ণিকার-মালা,
হাসিয়া বসন্ত সহ করে চুপে মধুর আলাপ,
সেই দৃশ্যে সারা বিশ্ব হেসে উঠে হইয়া উজালা।
শারদীয়া লক্ষ্মী যবে সুসজ্জিতা ধবল কমলে
হয় মহাগৌরবিণী অঙ্গে ধরি' জ্যোৎস্নার দুকূল,
ভাবি' তারে ঋতুরাণী বসুমতী তিতি' অশ্রুজলে,
ঢালে তার শ্রীচরণে একরাশি শেফালিকা ফুল।
কিন্তু তাহা মহাভুল!—হে বরষা, আমি বেশ জানি,
বাসন্তী শারদী জিনি' তুমিই গো ঋতুকুলরাণী,
ঝুমুকা-অপরাজিতা ফুলে তুমি ভুবনে অতুল।

৪

গন্ধরাজ-গন্ধে তব সুরভিত সুচারু অধর।
হে বরষা! ওকি তব হস্তে শোভে? লাবণ্য-ভাণ্ডার
এ ফুল তো ফুল নয়! এ যে চির শোভার নির্ঝর ;
বসোরা-গোলাপ জিনি কোথা পেলে এ "গুল আনার"
দশদিক্ আমোদিত করিয়াছ "হাস্না-হানা"'য়
মুনির মানস টলে তোমার ও কেতকীর বাসে।

তোমার বকুলফুলে, তোমার ও রজনীগন্ধায়
কি যাদু লুকানো আছে? মুগ্ধ বিশ্ব আনন্দ-উল্লাসে!
হউক বসন্তরাণী গৌরাঙ্গিণী—হে শ্যামা বরষা,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যাম কান্তি তবু তব অমৃত-পরশা!
মধুর তিমিরে তব কি রুচির বিদ্যুৎ প্রকাশে
আর্দ্রকেশে আর্দ্রবেশে প্রকৃতির চিত্রশালে বসি—
তুলিকা লইয়া হাতে, ভাবে ভোর অয়ি অপরূপে,
নানাবর্ণে নানাফুলে কর যবে অতুল রূপসী,
হে বরষা! আমি তব গুণপনা হেরি চুপে চুপে!

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

মানব-বন্দনা

১

সেই আদি-যুগে যবে অসহায় নর
নেত্র মেলি' ভবে,
চাহিয়া আকাশ-পানে—কারে ডেকেছিল,
দেবে, না মানবে?
কাতর আহ্বান সেই মেঘে মেঘে উঠি'
লুটি' গ্রহে গ্রহে,
ফিরিয়া কি আসে নাই, না পেয়ে উত্তর,
ধরায় আগ্রহে?

সেই ক্ষুব্ধ অন্ধকারে, মরুৎ-গর্জ্জনে,
কার অন্বেষণ?
সে নহে বন্দনা-গীতি, ভয়ার্ত্ত—ক্ষুধার্ত্ত
খুঁজিছে স্বজন!

২

(আরক্ত প্রভাত-সূর্য্য উদিল যখন
ভেদিয়া তিমিরে,)
ধরিত্রী অরণ্যে ভরা, কর্দ্দমে পিচ্ছিল—
সলিলে, শিশিরে।
শাখায় ঝাপটি' পাখা গরুড় চীৎকারে,
কাণ্ডে সর্পকুল;
সম্মুখে শ্বাপদ-সংঘ বদন ব্যাদানি'
আছাড়ে লাঙগুল;
দংশিছে দংশক গাত্রে, পদে সরীসৃপ,
শূন্যে শ্যেন উড়ে;—
কে তাহারে উদ্ধারিল? দেব, না মানব—
প্রস্তরে লগুড়ে?

৩

শীর্ণ অবসন্ন দেহ, গতিশক্তি-হীন,
ক্ষুধায় অস্থির;
কে দিল তুলিয়া মুখে স্বাদু পক্ক ফল,
পত্রপুটে নীর?
কে দিল মুছায়ে অশ্রু? কে বুলা'ল কর
সর্ব্বাঙ্গে আদরে?
কে নব-পল্লবে দিল রচিয়া শয়ন
আপন গহ্বরে?

দিল করে পুষ্পগুচ্ছ, শিরে পুষ্পলতা,
অতিথি-সৎকার ;
নিশীথে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায়
স্বপন-সম্ভার !

৪

শৈশবে কাহার সাথে জলে স্থলে ভ্রমি'
শিকার-সন্ধান ?
কে শিখাল ধনুর্ব্বেদ, বহিত্র-চালনা,
চর্ম্ম-পরিধান ?
অর্দ্ধ-দগ্ধ মৃগমাংস কার সাথে বসি'
করিনু ভক্ষণ ?
কাষ্ঠে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালি' কার হস্ত ধরি'
কুর্দ্দন নর্ত্তন ?
কে শিখাল শিলাস্তূপে, অশ্বত্থের মূলে
করিতে প্রণাম ?
কে শিখাল ঋতুভেদ, চন্দ্র-সূর্য্য-মেঘে,
দেব-দেবী-নাম ?

৫

কৈশোরে কাহার সনে মৃত্তিকা-কর্ষণে
হইনু বাহির ?
মধ্যাহ্নে কে দিল পাত্রে শালি-অন্ন ঢালি'
দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর ?
সায়াহ্নে কুটীরচ্ছায়ে কার কণ্ঠ-সাথে
নিবিদ্ উচ্চারি ?
কার আশীর্ব্বাদ ল'য়ে অগ্নি সাক্ষী করি'
হইনু সংসারী ?

কে দিল ঔষধ রোগে, ক্ষতে প্রলেপন—
স্নেহে অনুরাগে?
কার ছন্দে—সোম-গন্ধে—ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু
নিল যজ্ঞ-ভাগে?

৬

যৌবনে সাহায্যে কার নগর-পত্তন,
প্রাসাদ-নির্ম্মাণ?
কার ঋক্-সাম-যজুঃ, চরক-সুশ্রুত,
সংহিতা-পুরাণ?
কে গঠিল দুর্গ, সেতু, পরিখা, প্রণালী,
পথ, ঘাট, মাঠ?
কে আজ পৃথিবী-রাজ—জলে স্থলে ব্যোমে
কার রাজ্যপাট?
পঞ্চভূত বশীভূত, প্রকৃতি উন্নীত,
কার জ্ঞানে বলে?
ভুঞ্জিতে কাহার রাজ্য—জন্মিলেন হরি
মথুরা-কোশলে?

৭

প্রবীণ সমাজ-পদে, আজি প্রৌঢ় আমি
জুড়ি' দুই কর,
নমি, হে বিবর্ত্ত-বুদ্ধি! বিদ্যুৎ-মোহন
বজ্রমুষ্টিধর!
চরণে ঝটিকাগতি—ছুটিছ উধাও -
দলি' নীহারিকা!
উদ্দীপ্ত তৈজসনেত্র—হেরিছ নির্ভয়ে
সপ্তসূর্য্য-শিখা!

গ্রহে গ্রহে আবর্ত্তন—গভীর নিনাদ
শুনিছ শ্রবণে!
দোলে মহাকাল-কোলে অণু-পরমাণু-
বুঝিছ স্পর্শনে!

৮

নমি, হে সার্থক-কাম! স্বরূপ তোমার
নিত্য অভিনব!
নব-দেহে নহ নর, অমর-অধিক
স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য তব।
লয়ে সলাঙ্গুল দেহ, স্থূলবুদ্ধি তুমি
জন্মিলে জগতে,—
শুষিলে সাগর শেষে, রসাইলে মরু,
উড়ালে পর্ব্বতে!
গঠিলে আপন মূর্ত্তি দেবতা-লাঞ্ছন,
কালের পৃষ্ঠায়!
গড়িছ—ভাঙ্গিছ তর্কে, দর্শনে, বিজ্ঞানে
আপন স্রষ্টায়!

৯

নমি, হে বিশ্বগ-ভাব! আজন্ম-চঞ্চল
বিচিত্র, বিপুল!
হেলিছ—দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি',
ভাঙ্গি' সীমা—কূল!
কি ঘর্ষণ—কি ধর্ষণ, লম্ফন—গর্জ্জন,
দ্বন্দ্ব—মহামার!
কে ডুবিল—কে উঠিল, নাহি দয়ামায়া,
নাহিক নিস্তার!

নাহি তৃপ্তি, নাহি শ্রান্তি, নাহি ভ্রান্তি, ভয়!
কোথায়—কোথায়?
চিরদিন এক লক্ষ্য,—জীবন-বিকাশ
পরিপূর্ণ তায়!

১০

নমি তোমা, নরদেব! কি গর্ব্বে গৌরবে
দাঁড়ায়েছ তুমি!
সর্ব্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেঘ,
পদে শষ্পভূমি।
পশ্চাতে মন্দির-শ্রেণী, সুবর্ণ-কলস
ঝলসে কিরণে :
বালকণ্ঠ-সমুত্থিত নবীন উদ্‌গীথ
গগনে পবনে।
হৃদয়-স্পন্দন সনে ঘুরিছে জগৎ,
চলিছে সময় :
ভ্রূভঙ্গে ফিরিছে সঙ্গে—ক্রম, ব্যতিক্রম,
উদয়, বিলয়!

১১

নমি আমি প্রতিজনে,—আদ্বিজ-চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস!
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু,
সমগ্রে প্রকাশ!
নমি, কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি, তক্ষণ,
কর্ম্ম-চর্ম্ম-কার!
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহ অদ্রি-ভার!

কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়!
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে,—
আত্মার আত্মীয়!

—অক্ষয়কুমার বড়াল

সেথা আমি কি গাহিব গান?

সেথা আমি কি গাহিব গান?
যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সামঝঙ্কারে
কাঁপিত দূর বিমান।

যেথা, স্বরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ,
তুলিত মোহন তান।

যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
করি' হরিগুণ গান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান্।

যেথা, যোগীশ্বর-পুণ্যপরশে,
মূর্ত্ত রাগ উদিল হরষে;
মুগ্ধ কমলাকান্ত-চরণে
জাহ্নবী জনম পান।

যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি' ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।

আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ?

—রজনীকান্ত সেন

দরিদ্র

অনেক সৌন্দর্য্য আছে হৃদয় ভরিয়া,
সহস্র মাণিক্য জ্বলে অন্তর-আঁধারে :
অনন্ত সঙ্গীতরাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া
দিবস-রজনী করে উন্মাদ আমারে!

গাহে পাখী, বহে বায়ু বসন্তের মত,
নানাবর্ণে শত পুষ্প ফুটে মনোবনে ;
জগতের কাছে তবু দরিদ্র সতত
মরমে মরিয়া থাকি আপনার মনে।

তোমরা ডেকেছ তাই আনিয়াছি আজ
ভাষায় গাঁথিয়া পুষ্প মন-মালঞ্চের ;
তোমরা দেখিছ শুধু বাহিরের সাজ,
সৌন্দর্য্য লুকায়ে আছে গৃহে অন্তরের।

হৃদয়-সম্পদ্‌রাশি ফুটে না ভাষায়,
বাহিরে আনিলে সব সৌন্দর্য্য হারায়।

--চিত্তরঞ্জন দাশ

শিকল-ভাঙার গান

পরের শিকল ভাঙিস্‌ পরে,
নিজের নিগড় ভাংগ্‌ রে ভাই,
আপন কারায় বদ্ধ তোরা,
পরের কারায় বন্দী তাই।

হারে মূর্খ! হারে অন্ধ!
ভাইয়ে ভাইয়ে করিস্‌ দ্বন্দ্ব?
দেশের শক্তি করিস্‌ মন্দ,
তোদের—তুচ্ছ করে সবাই তাই।

সার ত্যজিয়ে খোসার বড়াই,
মন্দিরে মস্‌জিদে লড়াই ;
প্রবেশ ক'রে দেখ্‌ রে দু'ভাই,
—অন্দরে যে একজনাই!

দেশ-মাতার আর বিশ্ব-মাতার,
ম্লেচ্ছ, কাফের, এক পরিবার ;
নয় তুরস্ক, নয়কো তাতার,
জন্মমৃত্যুর এই যে ঠাঁই।

ভিন্ন জাত আর ভিন্ন বংশ
একজাতি তাই একশ' অংশ ;
হিন্দু রে, তুই হ'বি ধ্বংস,
না ঘুচালে এই বালাই।

ভাইকে ছুঁলে পদতলে,
শুদ্ধ হোস্ তুই গঙ্গাজলে :
ওরে, সেই অছুৎ ছেলেই তুলে কোলে,
তুষ্ট হন যে গঙ্গামাঈ।

খাবিনে জল ভাইয়ের দেওয়া,
খাস্‌নে অন্ন তাদের ছোঁওয়া,
ওরে, শবরীর আধ-খাওয়া মেওয়া
—রঘুনাথ ত খেলেন তাই!

তোরাই আবার সভাস্থলে,
হাঁকিস্ 'সাম্য' উচ্চ রোলে,
সমতন্ত্র চাস্ সকলে,
বিশ্ব-প্রেমের দিস্ দোহাই।

জাতির গলায় জাতের ফাঁস,
ধর্ম্ম কর্‌ছে সর্ব্বনাশ,
নিজের পায়ে পর্‌লি পাশ,
দাসত্ব ঘোচে না তাই।

ছাড় দেখি রে রেষারেষি,
কর,—প্রাণে প্রাণে মেশামিশি,
তখন তোদের সব বিদেশী
'দাস" না ব'লে ব'ল্‌বে "ভাই"।

—অতুলপ্রসাদ সেন

সাধনা

বক্ষে তব বক্ষ দিয়ে শুয়ে আছি আমি,
হে ধরিত্রি, জীবধাত্রি! নিত্য দিনযামী
মাতৃহৃদয়ের মোর ব্যাকুল স্পন্দন
প্রবাসী সন্তান লাগি', নিয়ত ক্রন্দন
তারি লুপ্ত স্পর্শ তরে, করি' দাও লয়
বিপুল বক্ষের তব মহাশব্দময়
অনন্ত স্পন্দন-মাঝে : শিখাও আমায়
সে পুণ্য-রহস্য-মন্ত্র—যার মহিমায়
প্রত্যেক নিমেষে সহি' বিয়োগ-বেদন
লক্ষ কোটী সন্তানের, প্রশান্তবদন :
তবু ফুটাতেছ ফুল, জ্বালিছ আলোক
উজলিয়া রাত্রিদিন দ্যুলোক, ভূলোক!

—প্রিয়ংবদা দেবী

হরিদ্বারে

দিগম্বরের জটাজাল হ'তে গিরিকন্দর-বর্ত্মে,
দুরিত-হারিণী সুরধুনী হেথা অবতরিছেন মর্ত্ত্যে ;
দেবের করুণা ঝরে বসুধায়,
ধায় তরঙ্গে ত্রিবেণী-ধারায়,
ঐরাবতের মত্ত দর্প চূর্ণি' সলিলাবর্ত্তে।

ওই 'সতীঘাট,' প্রতিধ্বনিছে ব্যোম-বিদারণ-শব্দ,
গরজে গভীর শোকের বিষাণ, ঈশান-হৃদয় স্তব্ধ।
অপমান-শেলে বিক্ষত প্রাণ,
দাক্ষায়ণীর অভিশাপ-বাণ
ভেদিয়াছে হোথা বেদীর পাষাণ, নিনাদি' অতীত অব্দ।

অবগাহি' নীল পাবন প্রবাহে এ অধম আজি ধন্য,
উধাও ছুটিছে মানস-তুরগ লঙ্ঘিয়া মায়ারণ্য।
আরাত্রিকের উদার শঙ্খ
ঘোষিছে কাহার অভয়-ডঙ্ক,
কোথা হিরণ্য-বর্ণ মহান্, সৌম্য সুপ্রসন্ন ?

এই আমিত্ব-অহঙ্কারের কল-কোলাহলে ক্লান্ত
হৃদয় আজিকে নিঃশ্বাস ফেলে কারাগার-নিষ্ক্রান্ত !
মূক কীটসম কত যুগ আর
হাসিব কাঁদিব হেথা বার বার ?
কবে যে ফুরাবে বিরহ-বিকার, টুটিবে গহন ধ্বান্ত !

রূপের ভিখারী রিপু-কিংকর, রে বিষয়-সুরা-সিক্ত,
আয় দান-বীর বলির মতন নিঃস্ব, নিখিল-রিক্ত।
পাবি পরসাদ প্রেয় দেবতার,
চল্ তীরে তীরে এ 'নীল-ধারা'র—
অন্তর-মরু হোক্ সুমধুর প্রেমরস-সম্পৃক্ত।

চল্ রে উজানে উৎসের পানে গঙ্গোত্তরী-গর্ভে,
চৌদিকে চির-মৌন অচল উষ্ণীষ তোলে গর্ব্বে ;
গজমোতি-হার উরসে পরিয়া,
কিরণ-মেখলা তুষার-দরিয়া
ঝঙ্কারহীন চরণে তুহিন বরষিছে দিক্ সর্ব্বে।

চল্ পিছে ফেলি' 'পঞ্চপ্রয়াগ,' দিব্য 'অলকনন্দা'
উদ্‌গীত যেথা তাপস-কণ্ঠে ত্রয়ী সে বিরাট-ছন্দা ;—
জীবাত্মা যেথা পরমাত্মায়
পুণ্য-লগনে লীন হ'য়ে যায়,
ফোটে মুকুলিতা কল্পলতায় অমৃত যোজনগন্ধা।

জনম-মরণ-বাসনার তীরে উতরিব নির্দ্বন্দ্ব—
নিরঞ্জনের চরণে যাচিব মুক্তির চিরানন্দ।
এস গো পরম-ভাগ্যবন্ত,
ভক্তির রথে এস তুরন্ত,
এস হেথা এই তীর্থ-রেণুতে মিশে যাও নিস্পন্দ।

—করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাজিতা

পরাজিতা তুই সকল ফুলের কাছে,
তবু কেন তোর 'অ-পরাজিতা' নাম?
গন্ধ কি তোর বিন্দুমাত্র আছে?
বর্ণ—সেও ত নয় নয়নাভিরাম!

ক্ষুদ্র শেফালি, তারো মধু-সৌরভ;
ক্ষুদ্র অতসী, তারো কাঞ্চন-ভাতি;
গরবিণি, তোর কিসে তবে গৌরব—
রূপগুণহীন বিড়ম্বনার খ্যাতি!

কালো আঁখিপুটে শিশির-অশ্রু ঝরে—
ফুল কহে—মোর কিছু নাই কিছু নাই,
তোমরা যে নামে ডাকিয়াছ দয়া ক'রে,
আমি শুধু তাই, তাই—আমি শুধু তাই!

ফুলসজ্জায় লজ্জায় যাইনাক,
পুষ্পমালায় নাহিক আমার স্থান্;
প্রিয়-উপহারে ভুলেও কি মোরে ডাক'?
বিবাহ-বাসরে থাকি আমি ম্রিয়মাণ।

মোর ঠাঁই শুধু দেবের চরণতলে,
পূজা—শুধু পূজা জীবনের মোর ব্রত;
তিনিও কি মোরে ফিরাবেন আঁখিজলে—
অন্তরযামী—তিনিও তোমারি মত?

—যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

দ্বৈপায়নে দুর্য্যোধন

দূর দিগন্তে সন্ধ্যাসায়রে কালোয় মিলিছে রক্তরেখা,
নীচে নির্জ্জন প্রান্তর 'পরে কা'র ও মূর্ত্তি লুটিছে একা?
—কে আমি, জান না? ভুলিনি সে নাম—রাজা আমি—রাজা দুর্য্যোধন!
কুরুক্ষেত্র শেষ হ'ল নাকি? কোথা আমি? এ কি দ্বৈপায়ন?
মহিষি, মহিষি—রাণি ভানুমতি, কোথা গেলে সতি, দুঃসময়?
—রথ, মোর রথ— সারথি, সারথি—কৈ, কোথা গেল রক্ষিচয়?
উহু—বড় ব্যথা, দারুণ যাতনা—রাজবৈদ্যেরে কে আনে ডাকি'?
রাজার বীর্য্য, বীরের ধৈর্য্য—সেও আজি হার মানিবে নাকি?
- তবু, তবু আমি করি না শঙ্কা, একাকী যুঝিব নির্ব্বিকার;
অধর্ম্মরণে পরাজয় তবু করিব সবলে অস্বীকার।

—হায় রে ভাগ্য! তাও যে পারি না, ভগ্ন এ উরু ধূলায় লুটে,
আশ্রয়হারা বীর্য্য আমার হাহাকারে শুধু কাঁদিয়া উঠে!
—বৃকোদর, তুই পাণ্ডবগ্লানি, পাণ্ডুর গালে লেপিলি কালি,
চোরের মতন দহিলি ধর্ম্মে আপনার হাতে আগুন জ্বালি';
ক্ষত্রবংশে অক্ষত্রিয়—বায়ুপুত্রেরই প্রমাণ ঠিক,
কলঙ্কী ঐ পাণ্ডবনামে ধিক্ ধিক্ তোর শতেক ধিক্!
—বিশ্বে কি কারো চক্ষু ছিল না—হায় রে, বিশ্বে কেই বা আছে?
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বিগত, কে লভে শাস্তি কাহার কাছে!
—সবই সেই শঠ কৃষ্ণের কাজ, ক্রূর চক্রীর কুমন্ত্রণা;
ধর্ম্মরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য—মুখে যার বাণী-বিড়ম্বনা!
কৃষ্ণার সাথে দুষ্টের দল সখা বলি যার দাস্য করে,
যদুবংশের সেই কলঙ্ক চালায় তাদেরি হাস্যভরে!

কোথা বলরাম উদারবীর্য্য—শুভ্রোজ্জ্বল রৈবতক?
কুলপাংশুল এই তার ভ্রাতা—পক্ষপাতী ও প্রবঞ্চক!

উহু—সেই ব্যথা, আবার, আবার! কে ও? কাছে এস হে সঞ্জয়,
দুর্জ্জয় তব দুর্য্যোধনের হের আজি দশা-বিপর্য্যয়।
কুরুকুল—সে কি নির্ম্মূল তবে? কুরুক্ষেত্র ধ্বংস নাকি?
বলো না মন্ত্রি, নির্ব্বাক্ কেন? বুঝিবার আরও আছে কি বাকী!
ভাবিতেছ মনে, দুর্য্যোধনেরে শুনাবে না সেই অশুভ কথা,—
হায় তাত! এই মৃত্যুর কূলে আছে তার কোনো সার্থকতা?

আজ মনে পড়ে, রাজসভাগৃহে ক্ষত্তার সেই যুক্তপাণি,
এদিনের কথা সেদিন জানিলে কহি তারে সেই তিক্ত বাণী?
রাজবংশের সম্ভ্রম চাহি তবু কোনো তাপ নাহি এ মনে,
দুর্য্যোধনের মর্য্যাদাবোধ কে না জানে তার শত্রুজনে?
ধর্ম্ম তাহার কর্ম্ম তাহার রাজরাজেন্দ্রযোগ্য সবই,—
মানী পেত মান, গুণী আহ্বান, অর্থী ফিরিত অর্থ লভি'।
—ওহো সেই কথা! দ্যূতক্রীড়ায় ক্ষত্রাধিকার বিদিত লোকে,
কে বলিবে পাপ? কোনো অনুতাপ-বাষ্প তা লাগি' নাহি এ চোখে।
হিংসায় যদি গণ' অপরাধ, কাপুরুষ তুমি; সাক্ষ্য তার—
দেবতা-দৈত্যে নিত্য বিরোধ জ্ঞাতি হ'য়ে, কে বা অন্যে ছার!
হিংসা জীবের সহজ ধর্ম্ম হিংসা-অন্নে পুষ্ট-প্রাণ,
ধ্বংসে যে বীজ কালের কাম্য, বংশে তাহাই মূর্ত্তিমান্!

সূচ্যগ্রের ভূমি দিই নাই পাণ্ডবে, সে কি কৃপণ ব'লে?
দুর্য্যোধনের দরাজ হস্ত কে না জানে এই পৃথ্বীতলে?
তা নয় মন্ত্রি, ন্যায়ের দাবিতে অধিকার চাহে শত্রুগণ!
প্রার্থনা হ'লে রাজ্য বিলায়ে বনে চ'লে যেত দুর্য্যোধন।
মন্ত্রি, মন্ত্রি, সব ছেড়ে গেছে—বৈদ্য কেহ কি নাহিক আর?
সংবাদ দাও, ডাকাও ডাকাও, এ কণ্ঠহার—পুরস্কার।
ঊর্দ্ধ্ব আকাশে সন্ধ্যা ঘনায়, প্রান্তর-শিরে বনের পারে,
দূরে হ্রদজল কালো হ'য়ে আসে ঘন ঘনায়িত অন্ধকারে!

কুরুক্ষেত্র প্রান্তর ভরি' জ্ব'লে উঠে শত আলেয়া আঁখি,
নিশাচর যত হিংস্র শ্বাপদ হুঙ্কার দিয়া ফিরিছে ডাকি' ;
—সঞ্জয়, তুমি রহ ক্ষণকাল, হয়ত এ মোর শেষের রাতি,
জয়-পরাজয় প্রশ্ন সে নয়, জানি তা জীবের জীবনসাথী!
কোনো ক্ষোভ মোর নাহি এ জীবনে, স্বভাব-রাজা এ দুর্য্যোধন,
নিন্দা-খ্যাতির ঊর্দ্ধ্বে তাহার সর্ব্বশঙ্কী সিংহাসন!

শত প্রণিপাত জানাইও শুধু পিতার চরণে মন্ত্রিবর,
ব'লো—আমি সেই মহান্ পিতার মহিমান্বিত বংশধর।
মৃত্যুরে আমি সহজ গর্ব্বে নিত্যকালের ভৃত্য গণি,
হরে সে জীবন, পারে না হরিতে কীর্ত্তি তাহার চিরন্তনী!
হউক পিতার নয়ন অন্ধ, ভাগ্যের হাতে কি বা না হয়?
পুত্রের 'পরে জানি স্নেহ তাঁর অপার, তবু সে অন্ধ নয়!
সন্তান লাগি' মঙ্গল মাগি' রাজশাসনের নিগড়ে বাঁধি'
যুদ্ধের পথে লৌকিক মতে পারিতেন তিনি হইতে বাদী ;
মন্ত্রদাতার অভাব ছিল না, কৃষ্ণ, বিদুর, ভীষ্মবীর,
পুত্রের 'পরে বিশ্বাসে তবু শ্রদ্ধানত সে উচ্চশির।
কাপুরুষতার শান্তি হইতে সংগ্রামও শ্রেয় নিত্যকাল,
পুত্রস্নেহে সে রাজধর্ম্ম ভুলেন নি সেই পৃথ্বীপাল।
মানী পুত্রের মান্য পিতা সে মনশ্চক্ষে দিব্য জ্যোতি—
চরণে তাঁহার তাই বার বার দেহ-মনে শেষ জানাই নতি।

—রাত্রি ঘনায়, বন্ধু বিদায়, ফিরে যাও ঘরে প্রণাম ল'য়ে,
দুর্য্যোধনের দৃপ্ত মহিমা জাগুক শিয়রে সঙ্গী হ'য়ে!
বেদব্যাসের পূত-নামযুত দুলুক অদূরে দ্বৈপায়ন,
ক্ষাত্র তেজের দীপ্ত তারকা জ্বলুক আঁধারে দুর্য্যোধন!

—যতীন্দ্রমোহন বাগচী

কৃষ্ণা রজনী

১

বুঝি সে দিন সজনি এমনি রজনী আঁধিয়ার,
এমনি প্রখর-ঝটিকামুখর চারিধার।
সতী সাবিত্রী মৃত পতি কোলে
একাকিনী ভাসে নয়নের জলে,
শিয়রে শমন কত কথা বলে
দমকে দামিনী বারেবার।
বুঝি সে দিনো সজনি এমনি রজনী আঁধিয়ার।

২

বুঝি সে দিনো এমনি গুরু গর্জ্জন
মত্ত পবনে বরুণরাজ্য টলমল।
গাঙগুড়ের নীরে ভাসাইয়া ভেলা,
মৃতপতি-দেহ আবরি' বেহুলা
চলে অসহায়া একাকিনী বালা
ঝরে নিশিদিন আঁখিজল,
বুঝি সে দিনো এমনি গুরু গর্জ্জন অবিরল।

৩

বুঝি সে দিনো এমনি ধাঁধায় বিজলি দু'নয়ন
আঁধার নিশার আঁধার বাড়ায়ে অনুখন।
বারাণসীধামে গঙ্গার তীরে,
ধূলিলুণ্ঠিতা শৈব্যার ক্রোড়ে
চণ্ডালবেশী নৃপতি নেহারে
মৃত পুত্রের সে বদন,
বুঝি সে দিনো এমনি ঝলকে বিজলি খনে খন।

৪

বুঝি সে দিনো এমনি জলের কাতর কলকল,
বনমর্ম্মরে ত্রস্ত চকিত মৃগদল।
দময়ন্তীরে ফেলি বনমাঝ
কোথা পলাইয়া গেল নলরাজ,
কাঁদে রাজবধূ অনাথিনী আজ
মলিন বদনশতদল ;
বুঝি সে দিনো এমনি জলের কাতর কলকল।

৫

(তব সনে মিশি আছে নিশি কত হাহাকার,
কত শ্মশানের অংগার কত আঁখিধার।
শোকের কালিমা যুগযুগ ধরি'
তোমার আঁধার দিয়াছে যে গড়ি'
কত সুষমাব কত চিতা মরি
নিভেছে জ্বলেছে অনিবার।
তব সনে মিশি আছে নিশি কত হাহাকার।)

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

পথের দাবী

১

পথে দেখেছিনু হা'ঘরে বালক কাঁপিছে দারুণ শীতে,
ব'লেছিনু তারে বাসায় যাইতে ছিন্ন বসন নিতে।
সে গেল ফিরিয়া না পেয়ে আমায়,
আমি তদবধি খুঁজে মরি তায়,
আজি এ বাদলে ম্লান মুখ তার উঁকিঝুঁকি মারে চিতে।

২

ধুনি জ্বালিবার কড়ি দিব বলি' গিয়াছিনু আমি ভুলি',
নিশিতে সাধুর ক্লেশ হ'ল কত মন করে বলাবলি।
আকাশেতে আজি শুনি ডাক তার
সরমেতে মরি মরম মাঝার
চোখে আসে জল ক্ষমা মাগি আমি হইয়া কৃতাঞ্জলি।

৩

রেলে যেতে কবে লয়েছিনু ফল, দিলাম পয়সা ছুড়ি',
কোথায় পড়িল ভিড়ের মাঝার খুঁজিতে লাগিল বুড়ী।
গাড়ী চ'লে এলো জানিনে ত আহা
গরিব মালিক পেলে কিনা তাহা
আজ মনে হয় সে রয়েছে চাহি' নামায়ে ফলের ঝুড়ি।

৪

দিতে ভুলে গেনু দূর যাত্রীর চেয়ে-লওয়া পাখাখানি,
কোথায় পাঠাবো জানিনে ঠিকানা, রেলে জমা দিনু আনি'।
আজি সে আসিয়া পাখা চায় যেন
বলে 'ফিরে তুমি দাও নাই কেন?'
বুঝিতে পারিনে সামলাব কিসে এত বড় রাহাজানি।

৫

মন্দিরপথে মালা দিতে এলে লই নাই তাহা গলে,
ভিখারী বালকে ফিরায়ে দিয়াছি কোথা কটু কথা ব'লে।
কোথা ব্যথা দেখি ঝরে নাই আঁখি,
কোথা কি অর্ঘ্য আসি নাই রাখি,
পূজ্যে কোথায় পূজিতে ভুলেছি ভকতির শতদলে।

৬

দীর্ঘপথেতে পরিচয় হ'লো যে সব সুহৃদ্ সনে
লওয়া হয় নাই খবর তাদের বেদনা দিয়াছি মনে।
আজ জেগে উঠে তাহাদের স্মৃতি
অযাচিত কৃপা, অযাচিত প্রীতি,
হায় এ বেতার বুকের সেতারে বাজিছে ক্ষণে ক্ষণে।

৭

স্মৃতির সুরভি বুকেতে ধরিয়া ভয়ে ভয়ে আজ ভাবি,
পথ ফুরাইল মিটিল না কই এখনো পথের দাবী।
এদের লাগিয়া হয় ত আবার,
পেতে হবে ক্লেশ আসা ও যাবার,
কিরাতের দাবী না মিটায়ে ঘরে আনিলাম মৃগনাভি।

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

তিনটি ফুল

চম্পা

আমারে ফুটিতে হ'ল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্ম্মম গ্রীষ্মের পদানত।
রুদ্র তপস্যার বনে আধ ত্রাসে আধেক উল্লাসে
একাকী আসিতে হ'ল—সাহসিকা অপ্সরার মত।

বনানী শোষণক্লিষ্ট মর্ম্মরি' উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর,
জন্ম-যবনিকাপ্রান্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার,
দেখিলাম জলস্থল শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জ্জর।

তবু এনু বাহিরিয়া বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,
চম্পা আমি, খরতাপে আমি কভু ঝরিব না মরি',
উগ্রমদ্যসম রৌদ্র, যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান,
বিধাতার আশীর্ব্বাদে আমি তা সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া ঊষার আতপ্ত কর ধরি',
মূর্চ্ছে দেহ, মোহে মন, মুহুর্মুহু: করি অনুভব,
সূর্য্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি',
দিনদেবে নমস্কার! আমি চম্পা,—সূর্য্যের সৌরভ।

আকন্দ

স্ফটিকের মত শুভ্র ছিলাম আদিম পুষ্পবনে,
নীল হ'য়ে গেছি নীলকণ্ঠের কণ্ঠ-আলিঙ্গনে।
বিষাদের বিষ ভখিয়া পেয়েছি গরলের নীলরুচি,
স্থাণুর ধেয়ানে পেলব এ তনু হয়েছে পাথরকুচি।

রুদ্র নিদাঘে খর বৈশাখে রুদ্রেরি পূজা করি,
আধ-নিমীলিত পাপড়ি আমার ঢুলু ঢুলু আঁখি স্মরি'।
নীলকণ্ঠের কণ্ঠ ঘিরিয়া সর্পের আনাগোনা,
আমি তারি সনে আছি একাসনে পেয়েছি প্রসাদকণা।

জবা

আমারে লইয়া সুখী হও তুমি ওগো দেবী শবাসনা,
আর খুঁজিও না মানব-শোণিত, আর তুমি খুঁজিও না।
আর মানুষের হৃৎপিন্ডটা নিয়ো না খড়্গে ছিঁড়ে,
হাহাকার তুমি তুল' না গো আর সুখের নিভৃত নীড়ে।
এই দেখ আমি উঠেছি ফুটিয়া উজলি' পুষ্পসভা,
ব্যথিত ধরার হৃৎপিন্ডটি আমি যে রক্তজবা।
তোমার চরণে নিবেদিত আমি, আমি যে তোমার বলি,
দৃষ্টি-ভোগের রাঙগা খর্পরে রক্ত কলিজা-কলি।
আমারে লইয়া খুশী হও ওগো, নম' দেবি নম' নম',
ধরার অর্ঘ্য করিয়া গ্রহণ, ধরার শিশুরে ক্ষম'।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বারাণসী

যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল—'দেখা যায় বারাণসী!'
চমকি চাহিনু, স্বর্গ-সুষমা মর্ত্ত্যে প'ড়েছে খসি'।
এ পারে সবুজ বজরার ক্ষেত, ও পারে পুণ্য-পুরী,
দেবের টোপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ-ঝুরি;
শারদ দিনের কনক আলোকে কিবা ছবি ঝলমল,—
অযুত যুগের পূজা-উপচার,—হেম চম্পকদল!
আধ-চাঁদখানি রচনা করিয়া গঙ্গা রয়েছে মাঝে,
স্নেহ-সুশীতল হাওয়াটি লাগায় তপ্ত-দিনের কাজে।
জয়! জয়! বারাণসী!
হিন্দুর হৃদি-গগনের তুমি চির-উজ্জ্বল শশী।

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে।
এই সেই কাশী ব্রহ্মদত্ত রাজা ছিল এইখানে,
খ্যাত যাঁর নাম শাক্যমুনির জাতকে, গাথায়, গানে;—
যাঁর রাজত্ব-সময়ে বুদ্ধ জন্মিলা বার বার;
ন্যায়-ধর্ম্মের মর্য্যাদা প্রেমে করিতে সমুদ্ধার।
এই সেই কাশী—ভারতবাসীর হৃদয়ের রাজধানী,
এই বারাণসী জাগ্রত চোখে স্বপন মিলায় আনি'!

এই পথ দিয়া ভীষ্ম গেছেন ভারত-ধুরন্ধর—
কাশী-নরেশের কন্যারা যবে হইল স্বয়ংবর।
সত্য পালিতে হরিশ্চন্দ্র এই কাশীধামে, হায়,
পুত্র-জায়ায় বিক্রয় করি' বিকাইলা আপনায়।

তেজের মূর্ত্তি বিশ্বামিত্র সাধনায় করি' জয়—
হেথা লভিলেন তিনটি বিদ্যা,—সৃষ্টি, পালন, লয় ;
বিদ্যায় যিনি জ্যোতির পুঞ্জ করিলেন সমাহার ;—
নূতন স্বর্গ করিলেন যিনি আপনি আবিষ্কার।

শুদ্ধোদনের স্নেহের দুলাল ত্যজিয়া সিংহাসন
করুণা-ধর্ম্ম হেথায় প্রথম করিলা প্রবর্ত্তন।
এই বারাণসী কোশল-দেবীর বিবাহের যৌতুক,—
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিত-মুখ!
নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পৈঠায়,
শ্রমণগণের আশীর্ব্বচনে প্রাণ মন উথলায়!
সমুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ।
চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্ম্মাশোকের মৈত্রী-করুণ অনুশাসনের লিপি!
মহাচীন হ'তে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,
স্তূপের গাত্র চিত্র করিছে সূক্ষ্ম সোণার পাতে।
জয়! জয়! জয় কাশী!
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র, মূর্ত্ত ভকতিরাশি!

এই কাশীধামে ভক্ত তুলসী লিখেছেন রামকথা,—
ভকতি যাঁহার অপ্রমত্ত প্রভুপদে সংযতা।
এই কাশীধামে জোলাদের ছেলে কবীর রচিল গান,
যাঁহার দোঁহায় মিলেছিলে দুঁহু হিন্দু মুসলমান।
এই কাশীধামে বাঙালীর রাজা মরেছে প্রতাপ রায়,
যাঁর সাধনায় নবীন জীবন জেগেছিল বাংলায়।
মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব!
মনে লয় মোর হেথা একদিন মিলিবে নিখিল জীব ;

আত্মার সাথে হ'বে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলনধৰ্ম্মী মানুষ মিলিবে ; নহে এ স্বপ্নকথা।
জয় কাশী! জয়! জয়!
সারা জগতের ভকতি-কেন্দ্র হবে তুমি নিশ্চয়!

স্ফটিক-শিলার বিপুল-বিলাস-মাত্র নহ তো তুমি,
আমি জানি তুমি আনন্দধাম ছুঁয়ে আছ মরুভূমি :
আমি জানি তুমি ঢাকিয়াছ হাসি ভ্রূকুটির মসীলেপে,
অমৃত-পাত্র লুকায়ে রেখেছ সময় হয়নি ভেবে ;
তৃষিত জগৎ খুঁজিতেছে পথ, ডেকে লও, বারাণসি!
পথিকের প্রীতে প্রদীপ জ্বালিয়া কেন আছ দূরে বসি?
মধু-বিদ্যায় বিশ্ব-মানবে দীক্ষিত কর আজ,
ঘুচাও বিরোধ, দম্ভ ও ক্রোধ, ক্ষতি, ক্ষোভ, ভয়, লাজ।
সার্থক হ'ক সকল মানব, জয়ী হ'ক ভালবাসা,
সংস্কারের পাষাণ-গুহায় পচুক কর্ম্মনাশা।

ব্যাসের প্রয়াস ব্যর্থ সে কভু হ'বেনাকো একেবারে,
সবারেই দিতে হবে গো মুকতি এ বিপুল সংসারে।
তুমি কি কখনো করিতে পার গো শুচি-অশুচির ভেদ?
তুমি যে জেনেছ চরাচর-ব্যাপী চিরজনমের বেদ।
স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম অবধি অভেদ ব'লেছ তুমি,—
ভেদের গণ্ডী তুমি রাখিয়ো না, অয়ি বারাণসী-ভূমি!
ঘোষণা ক'রেছ আশ্রয়ে তব ক্ষুধিত রবে না কেহ ;—
প্রাণের অন্ন দিবে না কি হায়? কেবলি পুষিবে দেহ?

দাও সুধা দাও, পরাণের ক্ষুধা চিরনিবৃত্ত হোক্,
বিশ্বনাথের আকাশের তলে মিলুক সকল লোক।
অখিল জনের হৃদয়ে রাজ্য কর তুমি বিস্তার,
সকল নদীর সকল হৃদির হও তুমি পারাবার।

পর যে মন্ত্রে আপনার হয় সে মন্ত্র তুমি জানো,
বিমুখ বিরূপ জগত-জনেরে মুগ্ধ করিয়া আনো।
বিচিত্র মালা কর বিরচন নানা বরণের ফুলে,
অবিরোধে লোক সার্থক হোক্ পাশাপাশি মিলেজুলে :
দূর ভবিষ্য নিখিল বিশ্ব যে ধনের আশা করে—
তুমি বিতরিয়া দাও সে অমৃত জগত-জনের করে।
জয়! বারাণসী জয়!
অভেদ-মন্ত্রে জয় কর তুমি জগতের সংশয়।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

নমস্কার

নমস্কার! করি নমস্কার!
কবিতা-কমলকুঞ্জ উল্লসিত আবির্ভাবে যার,
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইঙ্গিতে,
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গ নদী রহে তরঙ্গিতে,
কূজনে গুঞ্জনে গানে মর্ত্ত হ'ল স্ফূর্ত্তি-পারাবার,
অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

স্ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যু-হারা তানে :
ছাতারে মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র-সুধা পান :
তত্ত্বের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

চন্দন-তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি ;
দুর্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি
অকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার,
বেণুবীণা জিনি' মিঠা বাণী যার খনি সুষমার,
চিত্ত-প্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কণ্ঠহার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্নতমঃ অভিচার-নিশি,
আবেদনে আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি'-মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি,
ভীরুতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম-অরাতি,
শোণিত-নিষেক-শূন্য নৈযুজ্যের নিত্য-পক্ষপাতী,
বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্তহার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

রুদ্ধকণ্ঠ পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী অমারাতে,
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে,
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জ্জন ছাপায়ে
অতিচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে,
তুচ্ছ করি' রাজ-রোষ উপরাজে দিল যে ধিক্কার,—
নমস্কার! করি নমস্কার!

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্য ভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা,—
"জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দন্তুর সভ্যতা!"
ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত পারা—
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র, দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা—
শিহরি' কবন্ধ মাগে যার পাশে শান্তিবারি-ধার—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

স্বদেশে যে সর্ব্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্ত সিন্ধু আর দশ দিক্,—
বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দোরথী নিত্য-বন্দনীয়,
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,
নিত্য তারুণ্যের টিকা ভালে যার, চিত্ত-চমৎকার,—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

ষাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যার,
নিশীথে মশাল জেবলে যার আগে নাচে দিনেমার,
ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতার
শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার,
দ্বন্দ্ব ভুলি 'হূণ' 'গল' যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার,
নমস্কার! তারে নমস্কার!

নয়নে শান্তির কান্তি, হাস্য যার স্বর্গের মন্দার,
পক্ককেশে যে লভিল বরমাল্য রম্যা অরোরার :
বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য সহচর,
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধ্বে মেলে পাখা যাহার অন্তর,
বিশ্বযোগে যুক্ত যে গো "বাণীমূর্ত্তি স্বদেশ-আত্মার"
বারংবার তারে নমস্কার!

চারি মহাদেশ যার ভক্ত, করে ভক্তি নিবেদন,
গুরু বলি' শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নির্দ্বন্দ্ব-সাধনার—
নমস্কার! নমস্কার! বারংবার তারে নমস্কার!

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

নব নিদাঘ

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ নব নিদাঘের ঘোর।
ওরে মন, আয় সাঙ্গ করিয়া সকল কর্ম্ম তোর!
বিছায়ে নে মোর শিথিল শরীর শ্লথ আঁচলের প্রায়;
চেয়ে থাক্ দূরে, অর্ধ শয়নে আধখোলা জানলায়।

দুপুর বেলার রূপালি রৌদ্রে ফুলদল পড়ে নুয়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি' উড়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে;
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া গুমট করিয়া আছে,
অমনি গান কি গন্ধের মতো ঘুরে বেড়া মোর কাছে!

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র ঝিঁঝির পাখার মত,
অগ্নিকুণ্ড জ্বালি' কে হাপরে ফুঁ দিতেছে অবিরত?
দিকে দিকে দিকে, জানি না কি পাখী হাতুড়ি ঠুকিছে ডালে,
কোন্ রূপসীর স্বপ্ন-মেখলা গড়িছে বিশ্বশালে?

কালো দীঘিজলে গাহন করিতে নেমেছে গাছের ছায়া,
নিদ্রিত মাঠে নির্জ্জন ঘাটে জাগিছে এ কার মায়া?
মরীচিকা চাহি' শ্রান্ত পথিক ফুকারে ফটিক জল,
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়া ছাড়ে না অশথতল।

আজিকে বিশ্ব কি মধুমধুর মদির নেশায় ভোর!
মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার ঘূর্ণি হাওয়ার ঘোর।
বাসনা তাহার মরীচিকা হ'য়ে আঁকা পড়ে দূর পটে;
কল্পনা তার গুন গুন ক'রে অলিগুঞ্জনে রটে!

শীতল শিলায় শ্রান্তি বিছায়ে শিথিল অঙ্গ রেখে,
নিমীল নয়নে মলিন বিরহ মিলনস্বপন দেখে!
সুদূর অতীত কাছে আসে আজ গোপন সেতু বাহি'!
অদেখা অগম দাঁড়ায়েছে যেন মোর মুখপানে চাহি'!

এসেছে তাহারা দিগন্ত-হারা সাহারা-প্রান্ত হ'তে,
এসেছে রে কারা কোন্ বসোরার খর্জ্জুরবীথিপথে ;
কত বেদুয়ীন্ পার ক'রে মরু দীপ্ত অগ্নিঢালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে তরুণী ইরাণী বালা!

মর্ম্মরে গাঁথা মর্ম্মবেদীতে, কে পাতি' পদ্মপাতা,
পত্রলেখায় লিখিতে অঙ্গ ঘুমে ঢুলে' পড়ে মাথা!
আঁখি মুদে একা প'ড়ে আছি এই সুখস্মৃতিঘেরা নীড়ে,
প্রাণ ভ'রে যায় চেনা অচেনার মিলনমধুর ভিড়ে!

বেলা প'ড়ে আসে, বধূ চলে ঘাটে ভরিতে সাঁজের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে নিল চ্যুত ছায়া-অঞ্চল!
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে নিদাঘনিশীথ ঘোর,
ওরে মন আয়, ছিঁড়ে ফেলে আয় সকল কর্ম্ম-ডোর।

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গঙ্গাস্তোত্র

চির-ক্রন্দনময়ী গঙ্গে!
কুলু কুলু কল কল প্রবাহিত আঁখি-জল
দেব-মানবের একসঙ্গে!

বিশ্বের ক্রন্দন-বিচলিত নারায়ণ
আঁখি তার অশ্রুতে ভরিল,—
গোলোকে হ'ল না ঠাঁই শিবজটা বাহি' তাই
শতধারা ধরণীতে ঝরিল।

হিমগিরি-নির্ঝরে তোমার জীবন গড়ে,—
মিথ্যা মা মিথ্যা এ কাহিনী;
যুগে যুগে নরনারী-অফুরাণ-আঁখিবারি
পুষ্ট করিছে তব বাহিনী।

তব তীর-ধীর-বায়ু হরিল কত না আয়ু,
কত আলো স্রোতোজলে মিলালো!
ভরি' তব ভাংগা পাড় কত কোটী হাহাকার
ভাংগা বুক রাংগা আঁখি ঘুমালো!

ভরা কোল করি' খালি জননীরা আনে ডালি
যুগে যুগে মাগো তোরি অংকে,—
কত না বালুর চর সে ব্যথায় উর্ব্বর
বলি-অংকিত তট-পংকে!

অশ্রুপূত ও জল, পূত তব তটতল
লুপ্ত করিয়া কত কীর্ত্তি;
কত না চিতার ছাই মিশাইয়ে আছে, তাই
পবিত্র তব তট-মূর্ত্তি।

তাই আনি' তব মাটি গড়ি' নিজ দেবতাটি
তোমারি সলিলে যবে পূজি মা!
যুগে যুগে যত ব্যথা মানব পেয়েছে হেথা
তারি পূজা করি যে তা বুঝি না।

তাই গাহি তব তীরে, তাই নাহি তব নীরে,
তাই চাহি ঘুমাতে ও কোলে মা!
কলোকল্ কুলকুল্ এ ধারার কোথা মূল
কোথা কূল দিস্ যদি বোলে মা!

বন্দি ত্রিকালজয়ি গঙ্গে মূর্ত্তিময়ি—
অনন্ত-জীব-ব্যথা-প্রবাহ!
অনাদি ও ক্রন্দনে মিশাইনু ক্রন্দন এ,
বুঝে নে মা এ প্রাণের কি দাহ!

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

দীপ-শিখা

তপন যখন অস্ত-মগন ভুবন-ভ্রমণ-শেষে,
আমি তপনের স্বপন দেখি গো, পথিক-বধূর বেশে।
সারা দেহে মোর জ্বালিয়া অনল,
এলাইয়া দিই ধূম-কুন্তল,
কালো-অঞ্চল ছায়া হ'য়ে লোটে চরণের তলদেশে,
মোর দেহময় দাহনের জয় তপনের উদ্দেশে।

মাটির বাটিতে স্নেহরস শুষি', বুন্ত সে বর্ত্তিকা
ফুটায় হরষে তিমির-তোষিণী চম্পা-রূপিণী শিখা ;
বৃন্ত বাহিয়া যত স্নেহরস
যোগায় আমার জ্বালার হরষ—
আমি তৃষিতের প্রাণের নিশীথে বাসনা-বাসন্তিকা!
ধূম নয়, সে যে অলি-লাঞ্ছন কাঞ্চন-মল্লিকা!

আলোকের লাগি' আঁধার-প্রাচীরে নিশা মরে মাথা কুটে',
আমি সে ললাটে রক্তের ফোঁটা দিকে দিকে উঠি ফুটে!
কালোর অঙ্গে আলোকের ক্ষত—
সারারাত জাগি নিমেষ-নিহত,
জাগর-রক্ত আঁখির কাজল অশ্রুতে নাহি টুটে,
যত সে জ্বলুক, কালিটুকু থাকে লাগিয়া অক্ষিপুটে!

দিক্-অঙ্গনা গগনাঙ্গনে ফুল্কির ফুল গাঁথে—
অবোধ বনানী তাই হেরি' পরে জোনাকির হার মাথে!
মিছা মায়া সেই আলোর কণিকা,
মিছা হাসি হাসে আঁধার-গণিকা—
রক্ত-বিহীন পাণ্ডুর ভাতি, তাপ নাই তার সাথে,
বিদ্রূপ করে সখের দীপালি সুপ্ত দিবস-নাথে!

আমি যামিনীর নীল অঞ্চলে আগুনের ফুল বুনি,
আমি আঁধারের বুকের বাঁ-ধারে হৃৎ-স্পন্দন শুনি!
দিবা পুড়ে' মরে স্বামীর চিতায়—
আমি ছিনু তার সিঁদুর সিঁথায়,
জ্বলে' উঠে শুনি ভর-সন্ধ্যায় ঝিল্লির ঝুন্ঝুনি ;
আমি সারারাত কাল-রাত্রির আয়ুর প্রহর গুণি!

আমি দীপ-শিখা—আলোক-বালিকা—বসি যবে বাতায়নে,
দূর প্রান্তরে আলেয়া-ডাকিনী মিলায় আঁধার সনে ;
নিশার দুলাল প্রেত-কবন্ধ
নৃত্য অমনি করে যে বন্ধ!
উদ্গত-পাখা পিপীলিকা মরে রূপশিখা-চুম্বনে!
আমি বহ্নির তন্বী কুমারী তপনেরে জপি মনে!

আমি নিয়ে যাই অধীরা বধূরে অচেনার অভিসারে,
দেব-আয়তনে আরতি করি গো প্রেমহীন দেবতারে।
আমি কালো-চোখে পরাই কাজল,
বাসর-নিশাটি করি যে উজল,
আমি চেয়ে থাকি অনিমিখ-আঁখি মরণ-শয়নাগারে ;
প্রলয় ঘটাই, তবু নিবে যাই মলযের ফুৎকারে!

—মোহিতলাল মজুমদার

মৃত্যু-শোক

এই মর্ত্ত্যের মূর্ত্তি-মেখলা যে-রূপে বাঁধিল যারে,—
সেই অপরূপ রূপখানি যবে মিশে যায় নিরাকারে,
সারা ধরণীর বায়ু-মণ্ডল
প্রেমিকের চোখে করে ছল্‌ছল্‌,
দিবসের ছায়া-আলোকাঞ্চল অশ্রু মুছাতে নারে,
একটি সে রূপ না হেরি' নয়নে বুক ভরে হাহাকারে।

যেমনি সে হোক্—তাই সুন্দর, কেহ নহে তার মত!
জগতে কোথাও নাই সমতুল—তাই কাঁদি অবিরত।
বহুর মাঝারে সেই একজন,
এক সে দেহের একটি গঠন—
তার যাহা-কিছু তাহারি মতন,—একবার হ'লে গত,
এ ছায়া-আলোকে আর গড়িবে না কায়াখানি তার মত!

হায় দেহ!—নাই তুমি ছাড়া কেহ—জানি তাহা প্রাণে-প্রাণে,
স্মৃতি-পাগল মনের মমতা তাই ধায় তোমাপানে।
তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ,
দুঃখ-সুখের মহা-পরিবেশ!—দেহলীলা-অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি দর্শনে-বিজ্ঞানে!

তোমারেই চিনি, হে দেহ-দেবতা!—প্রলয়ের একাকার
তুমিই রুধিছ বহুবিধ রূপে তোমারে নমস্কার!
দেহে-দেহে তুমি, এত অভিনব!
দেহের বাহিরে কোথা বাস তব?
হাসি-ক্রন্দন—তব উৎসব! পিরীতির পারাবার!
অধরে, উরসে, চরণ-সরোজে আরতি যে অনিবার!

যাহারে হারাই তার মত নাই—এই শুধু মনে জাগে,
তাই আমরণ স্মৃতি-মন্দিরে নাম জপি অনুরাগে।
দেহ নাই আর, তবু দেহ দিয়া
প্রেতলোকে তারে রেখেছি বাঁধিয়া,
রূপ অরূপের দুয়ারে কাঁদিয়া তারি দরশন মাগে—
কায়া নাই, তবু ছায়াখানি তার রাখি নয়নের আগে!

দেহ নশ্বর, নহে তাঁর মত—ভুবনেশ্বর যিনি,
তাঁরে পাওয়া যায়, যোগী সাধকেরা সাধনায় লয় জিনি'।
আর তুমি, প্রেম!—দেহের কাঙাল!
হারাইলে আর পাবে না নাগাল,
শতযুগ এই জনম-জাঙাল ঘুরিলেও কোন দিনই
পড়িবে না চোখে সেই রূপ-রেখা—স্বপনের সঙ্গিনী।

যারে পাওয়া যায় কোটি বরষেও—কি তার মূল্য আছে?
তাই মহেশের অচল বক্ষে মহামায়া ঐ নাচে!
গলে দোলে, হের, মুণ্ডের মালা,
লোল রসনায় পিপাসার জ্বালা,
পিঠের তিমিরে মৃত-দিক্‌বালা দশদিক্ ব্যাপিয়াছে!—
মথিয়া চিত্ত, মহা অনিত্য নিত্যের বুকে নাচে!

যার সাথে দেখা শুধু একবার অসীমের সীমানায়,
জন্ম-নদীর জল-বুদ্বুদ মৃত্যুর মোহানায়!—
চল-তরঙ্গ তটের কিনারে
আছাড়ি' পড়িয়া গড়িছে যাহারে,
তার সে ভঙ্গি ধরিতে কে পারে স্রোতোমুখে পুনরায়?
তাই জীব যে গো শিবেরও অধিক দুর্লভ-কামনায়!

অসীম আঁধারে সে যে বিদ্যুৎ!—অদ্ভুত পরকাশ!
সাগরে-গগনে ক্ষণ আহ্বান—সৃষ্টির উল্লাস!
তাহারি বিহনে বিদারি' শ্মশান
কাঁদে সতী-হারা শিবের বিষাণ,
তারি নখকণা তীর্থ-নিশান—অমৃতের আশ্বাস!
পীঠে পীঠে তারি পাদপীঠ 'পরে পাষাণের পরিহাস!

তাই মনে হয়—দিবসে নিশীথে, তন্দ্রায় জাগরণে,
হারা-মুখ যবে ধেয়াই একেলা বেদনার তপোবনে—
যেন চলিয়াছি তরণী বাহিয়া
অস্ত-রঙগীন আকাশে চাহিয়া—
যেন সে গোধূলি-আলোকে নাহিয়া, সৈকত-অঙগনে,
মিলিতেছে আসি' নব নব বেশে নরনারী জনে-জনে।

তটভূমি 'পরে র'য়েছে দাঁড়ায়ে মূরতি সে অগণন,
যেন মায়াময় ছায়া-পুত্তল—জুড়াল না দু'নয়ন।
বুঝিনু তখনি, সে কোন্ পিপাসা –
কার অকারণ দরশন-আশা
আঁখিতে পরায় অশ্রু কুয়াসা,—কুণ্ঠায় ভরে মন,
এ মিলন-মেলা বিরহেরি খেলা, বৃথা এই আয়োজন!

একটি মূরতি খুঁজে খুঁজে ফিরি জনতার মাঝখানে—
নব-মহিমায় নেহারি তাহারে, স্বপনের সন্ধানে!
পলক ফেলিতে সে ছায়া মিলায়,
আপন শূন্য সবারে বিলায়!—
উৎসব-শোভা ম্লান হ'য়ে যায় আলোকের অবসানে,
মরণের ফুল বড় হ'য়ে ফোটে জীবনের উদ্যানে।

—মোহিতলাল মজুমদার

বিদ্যালয়-পথে

বাবলা-ফুলের গন্ধে সেই পথখানি পড়ে মনে,
যেই শীর্ণ পথ ধরি' চলিতাম কৈশোর-জীবনে
বিদ্যালয় পানে নিত্য। রাঙচিতা-বেড়া দিয়া ঘেরা
মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুটীর-অঙ্গনে বালকেরা
করিতেছে ছুটাছুটি। মা তাদের ব্যস্ত নানা কাজে।
জীর্ণ দরগার তলে চক্ষু মুদি' নিমগ্ন নামাজে
সারি সারি ভক্তজন। বাজে শঙ্খ শিবের মন্দিরে ;
বিরাট মন্দির জীর্ণ ঊর্দ্ধে উঠে বট-ধ্বজা শিরে,
বিশ্বনাথ মুষ্টিভিক্ষা লভে নিঃস্ব সেবকের হাতে।
ওলন্দাজী গোরস্তান—উপবন পুষ্পের শোভাতে ;
বিদেশী বণিকদল এসেছিল হ'তে বসুপতি,
বসুমতী অঙ্কে সেথা লভিয়াছে সুস্থির সদ্‌গতি।
ডাহিনে বিলের জলে ফুটে আছে কুমুদ-কমল,
বাঁয়ে বেণুকুঞ্জগুলি বায়ুভরে করে টলমল।
হাপরে ফেলিছে শ্বাস কামারের ছোট্ট কারখানা,
বকুলতলায় ছিল কয়দিন বেদিয়ার থানা,
প'ড়ে আছে পোড়া কাঠ। বাজে ঘণ্টা আর্ম্মানী গির্জ্জায়,
স্থবির যাজক এসে ধীরে ধীরে তোরণে দাঁড়ায়
শুধায় কুশল-প্রশ্ন। বাণিজ্যের ছলে পরবাসী
যাহারা হরিত বিত্ত—করিত তাহারা হেথা আসি'
দিনান্তের প্রায়শ্চিত্ত। গির্জ্জা আছে, ভক্ত আর নাই,
নির্ম্মূল আর্ম্মানীকুল, পুরোহিত আজিকে একাই
শুনিছে কালের ঘণ্টা। ঘটে ঘটে ক্ষরিতেছে ক্ষীর
খর্জ্জুরতরুর কণ্ঠে। তালীবনে দুলায় সমীর।

বাবুয়ের বাসাগুলি। খণ্ডখণ্ড এমনি কতই
চিত্র নিয়ে বনপথ মনে মোর জাগিছে স্বতই।

কণ্ঠে মোর দিল ভাষা বিদ্যামঠ, শুনাইল মোরে
দেশবিদেশের বাণী, মোর রিক্ত ঝুলিখানি ভরে'
পাথেয় সম্বল দিল, বারংবার তারে নমস্কার।
আর অই বনপথ জাগাইল জীবনে আমার
আশা, তৃষা, রসাবেশ, গাঢ় প্রীতি, গূঢ় অনুভূতি,
কল্পনারে দিল মুক্তি, ক্ষিপ্র গতি, গভীর আকূতি,
শিখাইল লীলাভঙ্গী। ভুলিব না, তারে ভুলিব না
শ্রমক্লান্ত তাপদগ্ধ এ জীবনে সঁপিছে সান্ত্বনা
আজিও তাহারি দান। জাগাইল মনের তনুতে
নব নেত্র, নব শ্রুতি,—এ দেহের অণুতে অণুতে
সঞ্চারিল রোমাঞ্চনা। ভুলিব না, কভু ভুলিব না,
ছায়ার অঞ্চল দিয়া মুছাত সে সকল বেদনা,
খেদ, ক্লান্তি, স্বেদ, শ্রান্তি, ঘুচাত সে মালিন্যের ভার,
জীবনের অঙ্গীভূত হ'য়ে গেছে সে সোহাগ তার।

কৈশোরের সরসতা অই পথে রয়েছে জড়ানো,
মুকুলিত জীবনের রেণুগুলি রয়েছে ছড়ানো
ও-পথের ধূলি 'পরে। কী বাঁধন ছিল যে নিবিড়
ও-পথের প্রতি তরুগুল্ম সাথে! প্রতিটি কুটীর
ছিল মোর পরিচিত। তরুশাখা হ'তে লতাগুলি
বাড়ায়ে পেলব বাহু শুধাইত পথটি আগুলি'
পুষ্পিত কুশলবাণী। কৈশোরের-মধুস্বপ্নে ভোর
জীবনে জীবন্ত আজি ছায়াঘন সব মায়া-ডোর
তাদের স্মৃতির সাথে। কবে কার অরুণ পল্লব
হ'লো পুষ্ট ঘনশ্যাম, কবে কার মঞ্জরী পেলব

হ'লো ফলে পরিণত—জানিতাম। বুকে আছে আঁকা
বৈশাখী ঝঞ্চায় কার কবে হায় ভেঙেছিল শাখা।

সব চেয়ে মনে পড়ে ফাল্গুনের অপরাহ্ণগুলি
উদ্ধত বাদামতরু ঊর্দ্ধপানে রক্তকেতু তুলি'
সমুদ্যত জয়গর্ব্বে ; অন্য পাশে বিশাল শিমুল
অস্তসূর্য্যে বক্ষোরক্ত নিঙাড়িয়া ফুটাইয়া ফুল
অর্ঘ্য দেয় উদঞ্জলি। তার মাঝ দিয়া পথখানি
আম্রকুঞ্জতলে মোরে স্নেহভরে নিয়ে যেত টানি'
মুকুলিত শাখা হ'তে যেথা বিন্দু বিন্দু মধু ক্ষরি'
পড়িত অধরে মোর। উঠিতাম সহসা শিহরি'
অতর্কিত কুহুতানে। মনে হ'তো কি যেন কি নাই
কি যেন হারিয়ে গেছে, ছিল মোর। কারে যেন চাই,
কিসের অভাবে যেন এ কৈশোর হ'লো মরুময়,
সবি যেন স্বপ্ন-মায়া। চিত্ত মোর দেশকাল-হারা
কোকিলের কণ্ঠে পেয়ে যেন কোন অজানার সাড়া
ছুটিত অনন্ত পানে। বৈশাখের প্রশান্ত প্রভাতে
এক হাতে গ্রন্থভার চম্পাহার লয়ে অন্য হাতে
চলিতাম ঘ্রাণমুগ্ধ গেয়ে গান দলিয়া বকুল,
সুরভি শীতল বায়ু অন্তরেও ফুটাত মুকুল,
সর্ব্বদেহে রোমাঞ্চকুর। ক্লিষ্ট যবে রবিকরজালে
মাতৃ-মমতার মত ছায়াখানি মোর তপ্ত ভালে
লভিতাম প্রতিদিন। কৈশোরের কত মুগ্ধ আশা
ও-পথের দুই পাশে গাছে গাছে বেঁধেছিল বাসা,
ধূলায় লুটায় আজ। জানে—জানে অই পথখানি
জীবনের গূঢ় তথ্য। কৈশোরের অকথিত বাণী
ও-পথের দুই পাশে পাখীদের কলকণ্ঠ ভরি'
রাখিয়া এসেছি আমি। দুই ধারে তৃণের মঞ্জরী

সিক্ত মোর আঁখিজলে। মোর সুখদুঃখ তার গায়
রেখেছে বিচিত্র করি আজো আলো-আঁধারি লীলায়
ধূলায় কাদায় তৃণে। মোর যত অতৃপ্ত কামনা
আজো সেথা ঝিল্লীতানে নিশিদিন করিছে শোচনা
দরদীর প্রতীক্ষায়। তারুণ্যের সোনার স্বপন
কর্ণিকার শাখে শাখে হ'য়ে আছে পুষ্পিত কাঞ্চন।

—শ্রীকালিদাস রায়

চাঁদ-সদাগর

দেবতা-মন্দিরে ভরা সিন্দূর-চন্দনে গড়া
কাব্য-তীর্থে উচ্চে তুলি' শির
তুমি দেবতারো বড়, আমার এ অর্ঘ্য ধরো,
শৈব সাধু চন্দ্রধর বীর।
এ বঙ্গের সমতলে তৃণ-লতা-গুল্মদলে
বজ্রজয়ী তুমি বনস্পতি,
জ্ঞানায়ুধ শাপাজিৎ হে অমর পরীক্ষিৎ,
শালপ্রাংশু মহাভুজ রথী।
সান্তালী পর্ব্বত 'পরে হিন্তালের যষ্টি করে
চির-দীপ্ত তোমার পৌরুষ,
তোমা ঘেরি চারিপাশে বাঁচে মরে কাঁদে হাসে
কোটি কোটি ভীরু অমানুষ।

মানুষে করিয়া খর্ব্ব যাহারা করিল গর্ব্ব
তাদের ক্লীবতা দলি' পায়,
অবিচল তুমি শৈব, কৃতাঞ্জলি হ'য়ে দৈব
মার্জ্জনা তোমার পদে চায়।

তব শিরে যমদণ্ড ভেঙে হ'লো সাত-খণ্ড,
পণ তব প্রাণেরো অধিক,
সাত পুত্র-শব 'পরি শিব শূলী শম্ভু স্মরি'
বামাচারী তুমি কাপালিক।

সনকার আর্ত্তনাদে চম্পকনগর কাঁদে
ডুবে যায় সপ্ত মধুকর,
কৌপীন করিয়া সার তোমার পুরুষকার
পথে পথে ফিরে দিগম্বর।

অশ্রুবিন্দু নাই চোখে দুর্ব্বিষহ মহাশোকে
নেত্র তব উগারে অনল,
শুধু তব জগদীশ কণ্ঠে ধরেছেন বিষ,
সর্ব্ব অঙ্গে তোমার গরল।

বিষে তনু নীলরুচি আত্মা তব শুভ্র শুচি,
নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্রোপম।
সহস্র ফণার মাঝে তোমার পৌরুষ রাজে
মহাবীর্য্য গরুড়ের সম।

হরিয়া নশ্বর ধন তোমা নিঃস্ব অকিঞ্চন
কে করিবে? এত স্পর্দ্ধা কার?
পুরুষার্থ-শিরোমণি শাশ্বত ধনে যে ধনী
বিশ্বে সেই নমস্য সবার।

তোমারে করিতে বন্দী ব্যর্থ দেবতার ফন্দী,
মানুষের সনে সন্ধি যাচে,
সর্ব্ব দৈব-দণ্ড-ভয় যে জন করেছে জয়,
দণ্ড-দাতা প্রার্থী তারি কাছে।

সারা বিশ্ব অসহায় নিয়তির জয় গায়,
দাসীত্বে নোওয়াতে তার শির,
একাই করিলে রণ, স্তম্ভিত দেবতাগণ,
কম্পমান পাষাণ-মন্দির।

যুগ যুগ ধরি' যত মূক জীব অবিরত
দৈব-দণ্ড আসিয়াছে সহি',
তোমার মাঝারে সবি পুঞ্জীভূত রূপ লভি'
রুদ্রকণ্ঠে হ'লো কি বিদ্রোহী?

সহস্র বৎসর ধরি ভয়ে কাঁপে থরহরি
নরনারী যূপবদ্ধ ছাগ,
বজ্রমন্দ্রে তার মাঝে শুনাইলে দেবরাজে
"মানুষেরো চাই যজ্ঞভাগ।"

শিখাইলে এই সত্য, তুচ্ছ নয় মনুষ্যত্ব,
দেব নয়, মানুষই অমর,
মানুষই দেবতা গড়ে, তাহারই কৃপার 'পরে
করে দেব-মহিমা নির্ভর।

হে ব্রহ্মজ্ঞ মহাযোগী, হইতে চাহনি ভোগী
সত্য-ব্রহ্মে করি' সঙ্কোচন,
সুখদুঃখ-দ্বন্দ্বাতীত, পান করি চিদমৃত
জিনেছিলে মৃত্যুর শাসন।

উদ্যত-কনকঘট সহস্র দেউলমঠ
কালদণ্ডে হ'য়ে গেছে গুঁড়া,
গরল সিন্ধুর মাঝে তোমার সে শৌর্য্য রাজে
চিরদিন মৈনাকের চূড়া।

—শ্রীকালিদাস রায়

পরপারের কামনা

নিখিলের এত শোভা, এত রূপ, এত হাসি-গান
ছাড়িয়া মরিতে মোর কভু নাহি চাহে মন প্রাণ!
এ বিশ্বের সবি আমি প্রাণ দিয়ে বাসিয়াছি ভালো,
আকাশ, বাতাস, জল, রবি, শশী, তারকার আলো।
সকলেরি সাথে মোর হ'য়ে গেছে বহু জানাশোনা ;
কত কি-যে মাখামাখি কত কি-যে মায়ামন্ত্র বোনা!
বাতাস আমারে ঘিরে খেলা করে মোর চারিপাশ,
অনন্তের কত কথা কহে নিতি নীলিম আকাশ।

চাঁদের মধুর হাসি, বিশ্বমুখে পুলক-চুম্বন,
মিটিমিটি চেয়ে-থাকা তারকার করুণ নয়ন ;
বসন্ত-নিদাঘ-শোভা, বিকশিত কুসুমের হাসি,
দিকে-দিকে শুধু গান, শুধু প্রেম—ভালোবাসাবাসি ;
বরষার বারিধারা, চমকিত চপলা দামিনী,
শরতের শান্ত সিত পুলকিত মধুর যামিনী,
হেমন্তের সংকুচিত দূর্ব্বাদলে নিশির শিশির,
শীতের শীতল বায়ু, হিম-ভরা নদনদী-নীর ;

প্রকৃতির নগ্ন শোভা, শস্যময় শ্যামল প্রান্তর,
গ্রাম্য-গীতি-মুখরিত কৃষকের সরল অন্তর ;
প্রতিদিন নানা ভাবে নিতি নব বিশ্বপরিচয়,
প্রতিদিন এত কাজ, এত কথা, এত অভিনয়,—
সকলি বিফল হবে? সকলি কি হবে ভুল দেখা?
সকলি কি স্বপ্নময় মায়াময় ছায়া দিয়ে লেখা?
সকলি ছাড়িয়া যাব? এ জগৎ প'ড়ে রবে পিছু?
আর আমি দু'নয়নে এ বিশ্বের হেরিব না কিছু?

মরণ কি টেনে দিবে আঁখি-কোণে অন্ধ আবরণ?
এ-পার ও-পার-মাঝে রবে নাকো স্মৃতির বন্ধন?
হে বিরাট, তব পাশে আজি মোর এই নিবেদন—
প্রভু, তুমি কৃপা করি' ইচ্ছা মোর করিও পূরণ—
মরণের পরপারে যেই বেশে, যেই দেশে যাই,
তোমার আকাশ আলো তবু যেন দেখিবারে পাই।
নিখিলের এই শোভা, এই হাসি, এই রূপরাশি,
মরিয়াও আমি যেন প্রাণ দিয়ে সবে ভালোবাসি।

—গোলাম মোস্তফা

ইন্দ্রপতন

তখনো অস্ত যায়নি সূর্য্য, সহসা হইল সুরু
অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরু গুরু গুরু গুরু!
আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন্ ইন্দ্রের আগমনী?
শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃংহিত ধ্বনি।
বাজে চিক্কুর-হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ংকর সাজে!

ঘনায় অশ্রু-বাষ্প-কুহেলি ঈশান-দিগঙ্গনে
স্তব্ধ বেদনা দিগ্‌-বালিকারা কি যেন কাঁদনি শোনে!
কাঁদিছে ধরার তরু, লতা, পাতা, কাঁদিতেছে পশুপাখী,
ধরার ইন্দ্র স্বর্গে চ'লেছে ধূলির মহিমা মাখি'!

বাজে আনন্দ-মৃদং গগনে, তড়িৎ-কুমারী নাচে;
মর্ত্ত্য-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ-ইন্দ্র-কাছে!
সপ্ত-আকাশ-সপ্তস্বরা হানে ঘন কর-তালি,
কাঁদিছে ধরায় তাহারি প্রতিধ্বনি—খালি, সব খালি।

হায় অসহায় সর্ব্বংসহা মৌনা ধরণী মাতা,
শুধু দেব-পূজা তরে কি মা তোর পুষ্প, হরিৎ-পাতা?
তোর বুকে কি মা চির-অতৃপ্ত র'বে সন্তান-ক্ষুধা?
তোমার মাটির পাত্রে কি গো মা ধরে না অমৃত-সুধা?

জীবন-সিন্ধু মথিয়া যে-কেহ আনিবে অমৃত-বারি
অমৃত-অধিপ দেবতার রোষ পড়িবে কি শিরে তারি?
হয়ত তাহাই, হয়ত নহে তা,—এটুকু জেনেছি খাঁটি,
তারে স্বর্গের আছে প্রয়োজন যারে ভালোবাসে মাটি!

কাঁটার মৃণালে উঠেছিল ফুটে যে চিত্ত-শতদল,
শোভেছিল যাহে বাণী-কমলার রক্ত-চরণ-তল,
সম্ভ্রমে নত পূজারী মৃত্যু ছিঁড়িল সে শতদলে-
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অর্পিবে বলি' নারায়ণ-পদতলে!

জানি জানি মোরা, শঙ্খ-চক্র-গদা যার হাতে শোভে—
পায়ের পদ্ম হাতে উঠে তাঁর অমর হইয়া র'বে!
'কত সান্ত্বনা আশা-মরীচিকা কত বিশ্বাস-দিশা
শোক-সাহারায় দেখা দেয় আসি', মেটে না প্রাণের তৃষা!

আজ শুধু জাগে তব অপরূপ সৃষ্টি-কাহিনী মনে,
তুমি দেখা দিলে অমিয়-কণ্ঠ বাণীর কমল-বনে!
কখন্ তোমার বীণা ছেয়ে গেল সোনার পদ্ম-দলে,
হেরিনু সহসা ত্যাগের তপন তোমার ললাট-তলে!

লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বাণী,
শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি কণ্ঠে গরল দানি',
বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা, যশোদা-দুলাল বাঁশী,
দিলেন অমিত তেজ ভাস্কর, মৃগাঙ্ক দিল হাসি।

চীর গৈরিক দিয়া আশিসিল ভারত-জননী কাঁদি'
প্রতাপ শিবাজী দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাঁধি'!
বুদ্ধ দিলেন ভিক্ষাভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি,
দেবতারা দিল মন্দার-মালা, মানব মাখালো ধূলি।

নিখিল-চিত্তরঞ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি'—
মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্ম্মী, জ্ঞানী!
হিমালয় হ'তে বিপুল বিরাট, উদার আকাশ হ'তে,
বাধা-কুঞ্জর তৃণসম ভেসে গেল তব প্রাণস্রোতে!

ছন্দোগানের অতীত হে ঋষি, জীবনে পারিনি তাই
বন্দিতে তোমা', আজ আনিয়াছি চিত্ত-চিতার ছাই—
বিভূতিতিলক! কৈলাস হ'তে ফিরেছ গরল পিয়া,
এনেছি অর্ঘ্য শ্মশানের কবি ভস্মবিভূতি নিয়া!

নাও অঞ্জলি, অঞ্জলি নাও, আজ আনিয়াছি গীতি
সারা জীবনের না-কওয়া-কথার ক্রন্দন-নীরে তিতি'!
এত ভালো মোরে বেসেছিলে তুমি, দাওনিক অবসর
তোমারেও ভালোবাসিবার, আজ তাই কাঁদে অন্তর!

তোমারে দেখিয়া কাহারও হৃদয়ে জাগেনিক সন্দেহ—
হিন্দু কিংবা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ।
তুমি আর্ত্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি,
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি!

হিন্দুর ছিলে আকবর, মুসলিমের আরংজিব,
যেখানে দেখেছ জীবের বেদনা, সেখানে দেখেছ শিব!
নিন্দা গ্লানির পঙ্ক মাখিয়া, বাউল, মিলন-হেতু
হিন্দু-মুসলমানের পরাণে তুমিই বাঁধিলে সেতু!

জানি না আজিকে কি অর্ঘ্য দেবে হিন্দু মুসলমান,
ঈর্ষ্যা-পঙ্কে পঙ্কজ হ'য়ে ফুটুক এদের প্রাণ!
হে অরিন্দম, মৃত্যুর তীরে ক'রেছ শত্রু জয়,
প্রেমিক! তোমার মৃত্যুশ্মশান আজিকে মিত্রময়!

তাই দেখি, যারা জীবনে তোমায় দিল কণ্টক-হুল,
আজ তাহারাই এনেছে অর্ঘ্য নয়ন-পাতার ফুল!
কে যে ছিলে তুমি জানিনাক কেহ, দেবতা কি আউলিয়া,
শুধু এই জানি, হেরে আর কারে ভরেনি এমন হিয়া।

* * *

অসুর-নাশিনী জগন্মাতার অকাল উদ্বোধনে
আঁখি উপাড়িতে গেছিলেন রাম, আজিকে পড়িছে মনে,
রাজর্ষি! আজি জীবন উপাড়ি' দিলে অঞ্জলি তুমি,
দনুজ-দলনী জাগে কিনা—আছে চাহিয়া ভারতভূমি।

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

ফরিয়াদ

এই ধরণীর ধূলিমাখা তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও আদি-পিতা ভগবান্!
আমার আঁখির দুখ-দীপ নিয়া
বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়া
যতটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি, ভ'রে ওঠে সারা প্রাণ!
এত ভালো তুমি? এত ভালোবাসো? এত তুমি মহীয়ান্?
ভগবান্! ভগবান্!

তোমার সৃষ্টি কত সুন্দর, কত সে মহৎ, পিতা!
সৃষ্টি-শিয়রে ব'সে কাঁদ তবু জননীর মত ভীতা!
নাহি সোয়াস্তি, নাহি যেন সুখ,
ভেঙে গড়, গ'ড়ে ভাঙো, উৎসুক—
আকাশ মুড়েছ মরকতে—পাছে আঁখি হয় রোদে ম্লান।
তোমার পবন করিছে বীজন জুড়াতে দগ্ধ প্রাণ।
ভগবান্! ভগবান্!

রবি শশী তারা প্রভাত সন্ধ্যা তোমার আদেশ কহে—
এই দিবা রাতি আকাশ বাতাস নহে একা কারো নহে।
এই ধরণীর যাহা সম্বল,—
বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল,
সুরসাল মাটী, সুধাসম জল, পাখীর কণ্ঠে গান,—
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর ফর্‌মান—
ভগবান্! ভগবান্!

শ্বেত, পীত, কালো করিয়া সৃজিলে মানবে, সে তব সাধ।
আমরা যে কালো, তুমি ভালো জান, নহে তাহা অপরাধ!
তুমি বল নাই, শুধু শ্বেতদ্বীপে
জোগাইবে আলো রবি-শশি-দীপে,
সাদা র'বে সবাকার টুঁটি টিপে, এ নহে তব বিধান।
সন্তান তব করিতেছে আজ তোমার অসম্মান।
ভগবান্! ভগবান্!

তব কনিষ্ঠা মেয়ে ধরণীরে দিলে দান ধূলামাটী,
তাই দিয়ে তার ছেলেদের মুখে ধরে সে দুধের বাটী।
ময়ূরের মত কলাপ মেলিয়া
তার আনন্দ বেড়ায় খেলিয়া—
সন্তান তার সুখী নয়, তারা লোভী, তারা শয়তান!
ঈর্ষ্যায় মাতি' করে কাটাকাটি, রচে নিতি ব্যবধান!
ভগবান্! ভগবান্!

তোমারে ঠেলিয়া তোমার আসনে বসিয়াছে আজ লোভী,
রসনা তাহার শ্যামল ধরায় করিছে সাহারা-গোবী।
মাটীর ঢিবিতে দু'দিন বসিয়া
রাজা সেজে করে পেষণ কষিয়া—
এ পেষণে তারি আসন ধ্বসিয়া রচিছে গোরস্থান!
ভাইএর মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়ে বীরের আখ্যা পান।
ভগবান্! ভগবান্!

জনগণে যারা জোঁকসম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তানসম পালে যারা জমি তারা জমি-দার নয়।

মাটীতে যাদের ঠেকে না চরণ
মাটীর মালিক তাঁহারাই হ'ন—
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান্‌।
নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান বিজ্ঞান।
ভগবান্‌! ভগবান্‌!

অন্যায় রণে যারা যত দড় তারা তত বড় জাতি,
সাত মহারথী শিশুরে বধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি।
তোমার চক্র রুধিয়াছে আজ
বেণের রৌপ্য-চাকায়, কি লাজ!
এত অনাচার স'য়ে যাও তুমি, তুমি মহামহীয়ান্‌!
পীড়িত মানব পারেনাক আর, স'বে না এ অপমান।
ভগবান্‌! ভগবান্‌!

ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিক আর!
'মরিয়া'র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে 'মার মার!'
রক্ত যা ছিল করেছে শোষণ,
নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ—
শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান—
'জয় নিপীড়িত জনগণ জয়! জয় নব উত্থান!
জয় জয় ভগবান্‌!'

তোমার দেওয়া এ বিপুল পৃথ্বী সকলে করিব ভোগ,
এই পৃথিবীর নাড়ী সাথে আছে সৃজন-দিনের যোগ!
তাজা ফুলে ফলে অঞ্জলি পুরে'
বেড়ায় ধরণী প্রতি ঘরে ঘুরে',
কে আছে এমন ডাকু যে হরিবে আমার গোলার ধান?
আমার ক্ষুধার অন্নে পেয়েছি আমার প্রাণের ঘ্রাণ—
এত দিনে ভগবান্‌!

যে-আকাশ হ'তে ঝরে তব দান আলো ও বৃষ্টি-ধারা,
সে-আকাশ হ'তে বেলুন উড়ায়ে গোলাগুলি হানে কা'রা?
উদার আকাশ বাতাসে কাহারা
করিয়া তুলিছে ভীতির সাহারা?
তোমার অসীম ঘিরিয়া পাহারা দিতেছে কা'র কামান?
হবে না সত্য দৈত্যমুক্ত? হবে না প্রতিবিধান?
ভগবান্! ভগবান্!

তোমার দত্ত হস্তেরে বাঁধে কার নিপীড়ন-চেড়ী?
আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ী?
ক্ষুধা তৃষা আছে, আছে মোর প্রাণ,
আমিও মানুষ, আমিও মহান্!
আমার অধীন এ মোর রসনা, এই খাড়া গর্দ্দান!
মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান—
এত দিনে ভগবান্!

চির অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির।
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি' ভেঙেছে কারা-প্রাচীর।
এতদিনে তার লাগিয়াছে ভালো—
আকাশ বাতাস বাহিরের আলো,
এবার বন্দী বুঝেছে, মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ।
মুক্ত-কণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে একতান—
জয় নিপীড়িত প্রাণ!
জয় নব অভিযান!
জয় নব উত্থান!

—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

সুদূরের আহ্বান

অগ্নি-আঁখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম,
চেন' কি তাদের ভাই?
দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুর্যোর বল্গা নাই?

পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে, আকাশের সীমা নাই,
ঘরের দেওয়াল তাই ফেটে চৌচির;
প্রভঞ্জনের বিবাগী মনের দোলা লেগে নাচে ভাই,
তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির!

বলি তবে ভাই শোন তবে আজ বলি,
অন্তরে আমি তাদেরই দলের দলী:
রক্তে আমার অমনি গতির নেশা;
নাসায় অগ্নি স্ফুরিছে যাহার, বিজলী ঠিকরে ক্ষুরে
আমি শুনিয়াছি সে হয়রাজের হ্রেষা।

যে শোণিতধারা ঘুমায়ে কাটাল পুরুষ চতুর্দ্দশ,
দেখি আজো ভাই লাল তার রঙ, তাজা তার জৌলস!
আজো তার মাঝে শুনি সে প্রথম সাগরের আহ্বান:
করি অনুভব কল্পনাতীত সৃষ্টির ঊষা হ'তে, তার জয় অভিযান!

তপতী কুমারী মরু আজ চাহে প্রথম পায়ের ধূলি:
অজানা নদীর উৎস ডাকিছে ঘোমটা আধেক খুলি,
নিসঙ্গ গিরিচূড়া,
তুহিন তুষার-শয়নে আমারে স্মরিছে বিরহাতুরা।

উত্তর মেরু মোরে ডাকে ভাই, দক্ষিণ মেরু টানে,
ঝটিকার মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে ;
গৃহবেষ্টনে বসি'
কখন্ প্রিয়ার কণ্ঠ বেড়িয়া হেরি পূর্ণিমা-শশী ?

সুশীতল-ধারা নদীটি বহুক মন্থরে তব তীরে,
গৃহবলিভুক্ পারাবতগুলি কূজন করুক ঘিরে,
পালিত তরুর ছায়ে থাক্ ঢাকা তোমাদের গৃহখানি
স্তোত্র রচিও, যদি পার তব প্রিয়ার আঁখি বাখানি,
ছোট এই আশা, সুখ,
ঈর্ষ্যা করি না, ঘৃণা নহে ভাই, শুধু নহি উৎসুক।

মনের গ্রন্থি জটিল বড় যে খুলিতে সহে না ত্বর ;
সোহাগের ভাষা কখন্ শিখি যে নাই মোটে অবসর ;
শুনে কাল হ'ল ভাই,
অরণ্য-পথ গভীর গহন, সাগরের তল নাই!

অগ্নি-আঁখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম,
আমি যে তাদের চিনি।
দুই তুরঙ্গ তাহাদের রথে, উদ্ধত উদ্দাম,
—শোন তার শিঞ্জিনী।

মোদের লগ্ন সপ্তমে ভাই রবির অট্টহাসি,
জন্ম-তারকা হ'য়ে গেছে ধূমকেতু!
নৌকা মোদের নোঙর জানে না, শুধু চলে স্রোতে ভাসি'—
কেন যে বুঝি না, বুঝিতে চাহি না হেতু!

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

জন্ম

কেন জন্ম হ'ল মম তাই বসি' ভাবি আজি মনে।
ফাল্গুন-উতলা-প্রাতে পুষ্প-সম কেন অকারণে
উঠেছিনু ফুটি' মম জননীর কোলে? দুঃখে-সুখে
দিবস-রজনী শুধু অনিবার চলেছি সম্মুখে।
প্রভাত-আলোক আজি অন্ধকার মেঘের মালায়,
বহিছে উত্তর-বায়ু, সঙ্গিহীন এ বন্দিশালায়
কে নিষ্ঠুর ফেলেছিল অসহায় শিশুটিরে টানি'
কিসের লাগিয়া? ধরণীর ধূলিতলে শির হানি'
শুধাই উত্তর তার। কেহ কিছু কহে নাকো আসি',
কঠিন পাষাণে লাগি' ফিরে আসে তিক্ত অশ্রুরাশি,
না বুঝিয়া ব্যথা-ভরে কেঁদে ওঠে সারা দেহমন,
জীবনে আঁধার নামে, নিভে যায় আকাশ-তপন।
কেন জন্ম লভেছিনু নাহি জানি, শুধু জানি মনে
জন্মিতে চাহিনি কভু। কেন অনাদরে অকারণে
ধরাতলে বিকশিল জীবন আমার? অর্থ খুঁজি'
চিত্ত মম পরিশ্রান্ত। তবু জানি, বুঝি নাহি বুঝি,
আমারে চলিতে হবে দিবানিশি সম্মুখের পানে,
অনন্ত আঁধার ভেদি' কোথা কোনো আলোর সন্ধানে।
আলো কি কোথাও আছে? তাহা নাহি জানে হিয়া মোর,
শুধু জানে চারি দিকে অন্ধকারে বহে অশ্রুলোর,—
দারিদ্র্য-যাতনারাশি, ক্ষুধিতের ক্ষুধার বেদনা,
বঞ্চিতের ক্ষুব্ধ রোষ, অন্যায়ের পুঞ্জ আবর্জ্জনা
জমিয়াছে যুগে-যুগে। এই মৃত্যু-নরকের মাঝে
স্বরগ আনিতে হবে, যে স্বপন-স্বরগ বিরাজে
সকল জাগ্রৎ-স্বপ্নে। সেই স্বর্গ কভু কি আসিবে,
তিমির-রজনী-শেষে পূর্ব্বাচলে অরুণ হাসিবে?

—হুমায়ুন কবীর

গদ্যাংশ

স্বপ্নদর্শন—কীৰ্ত্তিবিষয়ক

আহা কি দেখিলাম! এমন অদ্ভুত স্বপ্ন কখনও দেখি নাই। এমত কলরব-পরিপূর্ণ লোকাকীর্ণ স্থানও কোথাও দৃষ্টি করি নাই। এই অসীম ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে, এক পরম শোভাকর অপূৰ্ব্ব পৰ্ব্বত দর্শন করিলাম। সে পৰ্ব্বত এত উচ্চ যে, তাহার শিখর নভোমণ্ডলস্থ মেঘসমুদায় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহার পার্শ্ব-দেশ অত্যন্ত বন্ধুর ও দুরারোহ; মনুষ্যব্যতিরেকে আর কোন জন্তুর তথায় আরোহণ করিবার সামর্থ্য নাই। আমি অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, কখনও অনিমেষ ঊৰ্দ্ধ-নয়নে পৰ্ব্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলাম, কখনও বা লোকসমারোহ এবং তাহাদের বিবিধ-বিষয়ক যত্ন, চেষ্টা, ঔৎসুক্যাদি নিরীক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করতঃ ইতস্ততঃ পদচারণা করিতেছিলাম।

এই আশ্চর্য্য অদ্ভুত ব্যাপারের আদ্যন্ত কিছুই অনুভব করিতে না পারিয়া, ম্রিয়মান হইতেছিলম; এমন সময় এক পরমসুন্দরী বিদ্যাধরী আমার ললাট-দেশ বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ আমার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন,—"তুমি কি চিন্তা করিতেছ? এই প্রশস্ত ক্ষেত্রের নাম কৰ্ম্মক্ষেত্র, ঐ মহাশৈলের নাম কীৰ্ত্তিশৈল, উহার শিখর-দেশে কীৰ্ত্তিদেবী অধিষ্ঠিত আছেন। যাবতীয় কীৰ্ত্তি-সেবকেরা তাঁহার সেবার্থে তৎসন্নিধানে গমন করিতেছে।" বিদ্যাধরী-সমীপে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি অপার আনন্দ অনুভব করিলাম, এবং কহিলাম,—"দেবি! তোমার অসম্ভাবিত অনুগ্রহ লাভ করিয়া, আমি কৃতার্থ হইলাম; এক্ষণে যদি অভয় দান কর,

তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি; তুমি কে, আমাকে বিশেষ করিয়া বল।" তিনি কহিলেন,—"আমি বিদ্যাধরী, আমার নাম প্রজ্ঞা; তোমাকে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিয়া এখানে আবির্ভূত হইয়াছি। যদি কীর্ত্তিদেবীর মূর্ত্তি ও কীর্ত্তি-সেবকদিগের কৌতুক দর্শন করিবার বাসনা থাকে, আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর, সমস্ত দর্শন করাইব।"

আমি বিদ্যাধরীর এই আশ্বাসবাক্য বিশ্বাস করিয়া, পরম পুলকিতচিত্তে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবামাত্র পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে ঘন ঘন বংশীধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। আহা! সেই সুধাময় মধুর রব যাহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, তাহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহাদের চিত্ত-ভূমিতে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-নীর নিঃসৃত ও আশ্চর্য্য উৎসাহ-তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের মুখমণ্ডল এমন প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল যে, বোধ হইল, যেন তাহারা মরণ-ধর্ম্মশীল মানব-স্বভাব অতিক্রম করিয়া, অমরভাব প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে স্থানে যে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকেই সে সুধা-সিক্ত বংশীরব শ্রবণ করে নাই, আর কতকগুলি লোক অল্প অল্প শ্রবণ করিয়াও তাহার সুমধুর রসাস্বাদ-পুরঃসর সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, পরমারাধ্যা বিদ্যাধরীকে এ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি কহিলেন,—"ঐ বৃহৎ পর্ব্বতের পূর্ব্ব-পার্শ্বে যে তিন প্রত্যন্ত-পর্ব্বত দৃষ্টি করিতেছ, তাহার এক এক পর্ব্বতে এক একটা যক্ষ বাস করে। তাহারা দেবতুল্য বেশভূষা করিয়া, এক এক নিবিড় কুঞ্জে অবস্থিতিপূর্ব্বক লোকের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করে। সেই তিনটা যক্ষ যাহাদের অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে সমর্থ নয়। তাহাদের নাম কি জান? অজ্ঞান, আলস্য ও আমোদ।" বিদ্যাধরী যাহা বলিলেন, বাস্তবিকও তাহাই প্রত্যক্ষ হইল। সকল জাতীয় যাবতীয় হীন-বুদ্ধি অকর্ম্মণ্য সামান্য মনুষ্য তদ্‌গত-চিত্তে সেই কুটিল-স্বভাব বিশ্ব-বঞ্চক যক্ষদিগের কুমন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া, তাহাদের প্ররোচন-বাক্যে মুগ্ধ হইয়া থাকিল। কেবল উন্নতবুদ্ধি তেজীয়ান্ পুরুষেরা কীর্ত্তিদেবীর বংশীরব শ্রবণমাত্র মহোৎসাহ-প্রকাশ-পুরঃসর মহাশৈল আরোহণার্থ উদ্যত হইলেন। সেই সুধাময় মধুর শব্দ তাঁহাদের কর্ণকুহরে যতই প্রবিষ্ট হইল, ততই মিষ্ট বোধ হইয়া, তাঁহাদের উৎসাহ-শিখা প্রজ্বলিত করিতে লাগিল।

দেখিলাম, তাঁহারা অত্যন্ত ঔৎসুক্যসহকারে উল্লিখিত পর্ব্বতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। যে যে বস্তু সমভিব্যাহারে লইলে সে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার কোন-না-কোন বস্তু সঙ্গে করিয়া চলিলেন। কেহ একখানি শাণিত প্রখর তরবার, কেহ কোন পরিপাটী পুস্তক, কেহ একটি সুন্দর দূরবীক্ষণ, কেহ বা এক গোলযন্ত্র ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যক্তি এক এক সামগ্রী সঙ্গে করিয়া গমন করিতে লাগিলেন : ইহাতে দেখি, মনুষ্যবিরচিত সমস্ত প্রধান বস্তু তথায় সংগৃহীত হইয়াছে। যাত্রীরা সকলে নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া, নানা পথে আরোহণ করিতে লাগিল। অনেকে এরূপ সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়া চলিল যে, তদ্দ্বারা শিখর পর্যন্ত আরোহণ করিবার সম্ভাবনা নাই, কিয়দ্দূর উঠিয়াই স্থগিত হইতে হয়। ভূমণ্ডলস্থ শিল্পকর ও গ্রন্থকারদিগের মধ্যে বহুতর ব্যক্তি এই সকল সঙ্কীর্ণ পথের পথিক হইয়াছিলেন।

আমাদের বামপার্শ্বে অন্য এক সম্প্রদায় দর্শন করিলাম। তাঁহারা অতি কুটিল বন্ধুর পথ অবলম্বন করাতে, সর্ব্বদা দিগ্‌ভ্রম হইয়া বিপথগামী হইতেছিলেন। তাঁহারা পরিশ্রম ও কর্ম্ম-দক্ষতা বিষয়ে অন্য কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা ন্যূন না হইয়াও, অধিকদূর আরোহণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কেহ কেহ অনবরত এক প্রহর কাল ক্লেশ স্বীকার করিয়া যত দূর উত্থিত হইতেছিলেন, সহসা একবার পদস্খলন হইয়া, নিমেষমাত্রে তাহার দ্বিগুণ পথ অধোগমন করিলেন। দেখি, রাজ-নিয়ম-ব্যবসায়ী কত শত সুবিখ্যাত ব্যক্তিও এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মানস, জ্ঞানের সিংহাসন হরণ করিয়া, চতুরতা ও ধূর্ত্ততাকে প্রদান করেন।

এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতে করিতে, অনেক দূর আরোহণ করিলাম। আরোহণ করিয়া দেখি, পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী অন্য অন্য যত পথ দৃষ্টি করিয়াছিলাম, সমুদায় আসিয়া, দুই প্রশস্ত পথে মিলিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সমস্ত পথের সমুদায় যাত্রী এই দুই বৃহৎ পথে প্রবেশ করিয়া, দুই সম্প্রদায় হইল।

এই দুই প্রশস্ত পথের প্রবেশ-দ্বারের অনতিদূরে এক এক ভীষণাকার যক্ষ দণ্ডায়মান ছিল। তাহার একজন ধূম্রবর্ণ, দীর্ঘ-দন্ত ও কুটিল-নেত্র ; চর্ম্ম-পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক প্রকাণ্ড লৌহ-দণ্ড হস্তে করিয়া অবস্থান করিতেছিল। যাহারা তাহার সমীপস্থ পথে গমন করিতেছিল, তাহাদের

সকলেরই সম্মুখভাগে সেই দণ্ড ঘন ঘন চালনা করিতে লাগিল। লোকে তাহা দেখিবামাত্র ভয়ে কম্পমান হইয়া পশ্চাদ্ভাগে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক 'মৃত্যু' 'মৃত্যু' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আর যে যক্ষ দ্বিতীয় পথের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাহার নাম দ্বেষ। তাহার হস্তে যমদণ্ডের ন্যায় কোন সাংঘাতিক অস্ত্র ছিল না বটে, কিন্তু সে যে একপ্রকার বিকট ও উৎকট মুখভংগী করিয়া বিষপূরিত মৃদুস্বরে পর-পরিবাদ আরম্ভ করিল এবং অতি কুৎসিত ভ্রূভংগী প্রদর্শন করিয়া, সকলের প্রতি যেরূপ বিষদৃষ্টি করিতে লাগিল, তাহাতে মৃত্যু অপেক্ষাও তাহাকে ভয়ানক বোধ হইল। এমন কি, আমাদের সমভিব্যাহারী শত শত যাত্রী তাহার আকার-দর্শনে ও বাক্য-শ্রবণে ভগ্নোৎসাহ হইয়া, শৈলা-রোহণে নিবৃত্ত হইল। এই দুই রুক্ষ-স্বভাব যক্ষ দৃষ্টি করিয়া আমার যেরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, তাহা বলিবার নয়। কিন্তু পূর্ব্বকথিত বংশীধ্বনি পুনঃ পুনঃ কর্ণগোচর হওয়াতে, অভিনব উৎসাহ-সঞ্চার ও সাহস-বৃদ্ধি হইল, এবং তদ্দ্বারা হৃদয়-ভূমি ভীরুতারূপ কুজ্ঝটিকা হইতে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মুক্ত হইতে লাগিল। যাহাদের হস্তে প্রখর তরবার ছিল, তাহারা স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক দর্প করিয়া, প্রথমোক্ত পথে প্রস্থান করিল। অবশিষ্ট সদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট শিষ্ট ব্যক্তিসকল দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিয়া, অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে গমন করিতে লাগিলেন। প্রথমে উভয় পথই কিঞ্চিৎ কষ্ট-দায়ক বোধ হইল, পরে যখন উল্লিখিত যক্ষদ্বয় আমাদের দৃষ্টি-পথের বহির্ভূত হইল, তখন উভয় পথই তত্তৎ-পথের পথিকদিগের সাতিশয় সুখ-দায়ক বোধ হইতে লাগিল। যদিও আমি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম, কিন্তু দূর হইতে প্রথম পথের ভাব ও তদীয় যাত্রীদিগের ব্যবহার এক এক বার অবলোকন করিলাম। বলিতে কি, তাহা কোনমতেই আমার মনঃপূত ও পরিশুদ্ধ বোধ হইল না।

তদনন্তর আমরা পরম প্রফুল্লচিত্তে সুমধুর বংশী-স্বর শ্রবণ-পুরঃসর অতিশয় উৎসাহসহকারে সুচারু কীর্ত্তিশৈল আরোহণ করিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে প্রায় সকলেই দুইএকবার বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন ; এবং ক্রমে ক্রমে কৃতকার্য্য হইয়া, শিখর-দেশে উপনীত হইলেন। আহা! সে স্থানের কি অপূর্ব্ব শোভা! কি মনোহর ভাব! তাহার শোভা এখনও আমার চিত্ত-পটে চিত্রিত হইয়া রহিয়াছে। সে স্থানের সুন্দর সুস্নিগ্ধ সমীরণ কি নিরুপম সুখদায়ক! তাহার প্রত্যেক হিল্লোলে সর্ব্বাঙ্গে সুবিমল সুখ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। আমাদের বোধ

হইল, যেন কি অনির্ব্বচনীয় অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইতেছি। তৎপ্রদেশের আর এক অপূর্ব্ব গুণ আছে, শুনিলে সকলে চমৎকৃত হইবেন। তথায় দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব পূর্ব্ব-কৃত্য সমস্ত যতই স্মরণ করা যায়, ততই অন্তঃকরণ আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতে থাকে। আমরা ইতস্ততঃ পদচারণা-পূর্ব্বক মধ্যদেশে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা অবলোকন করিয়া, তদভিমুখে যাত্রা করিলাম। তাহার বহির্দ্বারোপরি "কীর্ত্তি-নিকেতন" এই কথাটি বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাহার চারিদিকে চারি রৌপ্যময় শুভ্রবর্ণ কবাট-সংযুক্ত প্রশস্ত দ্বার আছে এবং তাহার অভ্যন্তরে কীর্ত্তিদেবী এক সুচারু সুবর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, অনবরত বংশী-বাদন করিতেছেন। যাত্রিগণ শ্রবণ করিয়া হর্ষসাগরে অবগাহন করিলেন, এবং বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, সানন্দ মনে উৎসাহসহকারে কীর্ত্তি-নিকেতনে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রতি দ্বারে পুরাবৃত্তবিদ্ নামে কতকগুলি পণ্ডিত অবস্থিত ছিলেন। তাঁহারা অনেক ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে করিয়া, অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। ঐ সকল ব্যক্তি তাঁহাদের সহায়তা-ব্যতিরেকে তথায় প্রবেশ করিতে কদাচ সমর্থ হইতেন না। ভূমণ্ডলের চারি খণ্ডের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক চারি দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন ; আমিও পরম কৌতুকাবিষ্ট হইয়া, কীর্ত্তি-নিকেতনে প্রবেশ-পুরঃসর সমস্ত সন্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম, কীর্ত্তিদেবী স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, সকলকে যথাসম্ভব সংবর্দ্ধনাপূর্ব্বক সুমধুর স্বরে এক এক আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন। তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে এক এক আসনে উপবেশন করিলেন। কীর্ত্তিদেবীর পরম পবিত্র সুরম্য শোভা দর্শন, তাঁহার পুষ্পালঙ্কারের সুচারু সুদূরগামী সৌরভ গ্রহণ এবং তাঁহার সুধাসিক্ত সুমধুর বংশীরব শ্রবণ করিয়া, সকলে এক কালে মোহিত হইয়া গেল ; তাঁহার শরীরের সৌগন্ধ্যে সে স্থান অনবরত আমোদিত ছিল। আমি ইতস্ততঃ পদচারণপূর্ব্বক এক এক দিকের এক এক প্রকার মনোহর সৌরভ গ্রহণ করিয়া, পুলকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলাম।

দেবীর বামপার্শ্বে কতিপয় দীর্ঘকায়, বৃষস্কন্ধ, মহাবলপরাক্রান্ত বীর-পদবী-বিশিষ্ট মনুষ্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, অকুতোভয়ে উপবিষ্ট আছেন ; তাঁহাদের মুখশ্রীতে সাহস ও উৎসাহের সমুদায় লক্ষণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। আমি কোন কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ প্রকাশপূর্ব্বক অতিশয়

ঔৎসুক্যসহকারে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিতেছি দেখিয়া, আমার সমভি-ব্যাহারিণী বিদ্যাধরী কহিলেন,—"জান না? ইঁহারা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, অত্যুৎকট দুরূহ ব্যাপার সমুদায় সাধন করিয়াছেন। অবনীমণ্ডলে ইঁহাদের পাণ্ডব ও কৌরব পদবী প্রচারিত আছে।" কিন্তু প্রবল-প্রতাপান্বিত, প্রভূত-বলবিশিষ্ট, কতিপয় বিদেশীয় ব্যক্তিই সেই শ্রেণীর প্রধান আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। বিদ্যাধরী তাঁহাদের নাম ও গুণ কীর্ত্তন করিলেন; বিদেশীয় লোকের নাম উত্তমরূপে স্মরণ থাকে না। একজনের নাম বুঝি আলেক্‌জাণ্ডার, একজনের নাম সীজর, আর একজনের নাম হ্যানিবল্‌ ইত্যাদি। যে সমস্ত পুরাবৃত্তবিদ্‌ পণ্ডিতেরা এই সকল যাত্রীকে সমভিব্যাহারে করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এক এক যাত্রীর পার্শ্বদেশে অবস্থানপূর্ব্বক কীর্ত্তিদেবীর সমীপে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সেই সুযোগে আপনারাও পরিচিত ও তাঁহার অনুগৃহীত হইলেন।

কীর্ত্তিদেবীর দক্ষিণপার্শ্বের ভাব আর এক প্রকার। তথায় যে সমুদায় মহানুভব মনুষ্য বিরাজিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিলে, শোকাচ্ছন্ন বিষণ্ণ জনেরও অন্তঃকরণ একবার প্রফুল্ল হইতে পারে। তাঁহাদের সহাস্য বদন, সুধাময় মধুর বচন এবং আনন্দোৎফুল্ল চঞ্চল লোচন প্রত্যক্ষ করিয়া, আমি প্রীতিরূপ অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইলাম। তাঁহারা কীর্ত্তিদেবীর দক্ষিণপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন এবং কয়েকটি পরমসুন্দরী প্রিয়বাদিনী রমণী চিত্রবিচিত্র অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ ও পরম-শোভাকর মনোহর অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক তাঁহাদের সহযোগিনী-স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের কবি-পদবী সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং তাঁহার সহযোগিনী রমণীরা রাগিণী বলিয়া সর্ব্বস্থানে বিখ্যাত।

পূর্ব্বোক্ত বীরগণ যেমন এক এক পুরাবৃত্তবিদ্‌ পণ্ডিতের সমভিব্যাহারে তথায় প্রবেশ করিয়াছেন, কবিদিগকে সেরূপ কাহারও আনুকূল্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই; বরং তাঁহারাই অনেকানেক বীর্য্যবান্‌ ও গুণবান্‌ ব্যক্তির কীর্ত্তি-নিকেতন-প্রবেশ-বিষয়ে সহায়তা করিলেন। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান; তাঁহাদের করস্থিত পুস্তকের কোন মনোহারিণী শক্তি আছে, দ্বারবানেরা তাহা দেখিবামাত্র তাঁহাদিগকে যত্নসহকারে পথ প্রদান করিল।

দুই শ্মশ্রুধারী সহাস্য-বদন প্রাচীন পুরুষ এই শ্রেণীর মধ্যস্থলবর্ত্তী অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। প্রাচীনের মধ্যে এমন সুন্দর পুরুষ

আর দৃষ্টি করি নাই। বিদ্যাধরী কহিলেন,—"একজনের নাম বাল্মীকি, আর একজনের নাম হোমর।" দক্ষিণভাগে হোমর এবং তাঁহার বামভাগে বাল্মীকি এক এক খানি পরম রমণীয় পুস্তক হস্তে করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। বাল্মীকির বামপার্শ্বে এক পরম রূপবান্ যুবাপুরুষ চিত্রিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বিবিধ বর্ণ-বিভূষিত কুসুমাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ আসনের সৌরভে সর্ব্বস্থান আমোদিত হইতেছিল। তিনি নাকি উজ্জয়িনী-নিবাসী নৃপতি-বিশেষের সভাসদ্ থাকিয়া, নৃপতি অপেক্ষা শতগুণে কীর্ত্তিদেবীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। তাঁহার বামপার্শ্বে মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি, স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে যথাক্রমে এক এক অশেষ শোভাকর উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাল্মীকির যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাব ও অকৃত্রিম অনুপম শোভা, তাঁহাদের কাহারও সেরূপ নহে। তাঁহাদের উত্তম শোভা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু অনেকের শরীরের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বস্ত্রালংকারের শোভা অধিক। কেহ কেহ আপন আপন পরিচ্ছদ এ প্রকার কুটিল ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন যে, বহু যত্নে ও অনেক কষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া না দেখিলে, তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, তাহাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

ওদিকে হোমরের পার্শ্বে বার্জিল, ডাণ্টে, মিল্টন, সেক্সপিয়র, বায়রন প্রভৃতি শত শত রসার্দ্র-চিত্ত সুপ্রসিদ্ধ কবি যথাযোগ্য স্থানে অবস্থিত ছিলেন। সহৃদয় সেক্সপিয়র যে রত্নময় সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, তাহা এই শ্রেণীর সকল আসন হইতে উন্নত ও জ্যোতিষ্মান্ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এই শ্রেণীর অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া, আমার অন্তঃকরণ একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

ইঁহারা সকলে বিচিত্র কথা-প্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছিলেন ; তন্মধ্যে বাল্মীকি ও কালিদাসের একটি কথা শ্রবণ করিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলাম। তাঁহারা কহিলেন,—"আমাদের স্বজাতীয় নব্যসম্প্রদায়ী যুবকদিগের মধ্যে অনেকে আমাদিগকে যথোচিত আদর অপেক্ষা না করিয়া, ভিন্নজাতীয় কবি-দিগেরই অশেষ উপচারে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তবে সুখের বিষয় এই যে, ভিন্নজাতীয় পণ্ডিতেরা আমাদের প্রকৃত মর্য্যাদা জানিতে পারিয়া, বিশিষ্টরূপে শ্রদ্ধাসহকারে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। দেখ, তাঁহারা আমাদিগকে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও

সেরূপ পরিধেয় পরিধান করি নাই। এখন তদ্দৃষ্টে স্বজাতীয় নব্য ব্যক্তিরাও কেহ কেহ আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতেছেন।”

অতঃপর যাঁহারা কীর্ত্তিদেবীর সম্মুখস্থিত সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বর্ণন করি। তাঁহারা সকলেই প্রায় ধ্যান-মগ্ন এবং সকলেরই ললাট-দেশ প্রশস্ত। পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিভাজন বলিয়া বিশ্বাস ছিল, তাঁহাদের সকলকেই সেই স্থানে দৃষ্টি করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলাম। যাঁহারা ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যা-বিষয়ে বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তথায় তাঁহাদের সকলেরই সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। তথায় আমার সাতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ আর্য্যভট্ট, বরাহ-মিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য্য অম্লানবদনে প্রসন্ন মনে বিরাজ করিতেছিলেন। প্রথমে মহাত্মা আর্য্যভট্টকে কিছু ম্লান ও বিষণ্ণ দেখিয়াছিলাম ; পরে অকস্মাৎ তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল ও প্রদীপ্ত হইতে দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার কোন প্রিয়তর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। বাস্তবিকও তিনি কয়েকটি অসামান্য ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহানুভব মনুষ্যের প্রতি কটাক্ষপাত ও অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—“পূর্ব্বে কেহই আমার যথার্থ মর্য্যাদা অবগত হইতে পারেন নাই ; সুতরাং আমার কথায় আস্থা করা দূরে থাকুক, অত্যন্ত অশ্রদ্ধাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরন্তু এই সমস্ত বিদেশীয় বন্ধু আমার অভিপ্রায় অবলম্বন করিয়া, আমার শ্রম সার্থক ও মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।” তিনি যে সমুদায় বিদেশীয় ব্যক্তিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আমি তাঁহাদের পরিচয়লাভার্থ পরম কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, আমার সর্ব্বভিব্যাহারিণী বিদ্যাধরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন,—“একজনের নাম কোপর্নিকস, একজনের নাম গ্যালিলিও, এক-জনের নাম নিউটন্ ইত্যাদি।” এই শেষোক্ত নাম শ্রবণমাত্র, আমার অন্তঃকরণ পুলকিত ও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে ইঁহাকে পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য অপেক্ষা গরিষ্ঠ বলিয়া বোধ ছিল, এখানেও দেখিলাম, ইঁনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছেন। বেদব্যাস ও শঙ্করাচার্য্য এবং প্লেটো ও পিথাগোরস্‌কেও দর্শন করিলাম। প্রথমে তাঁহারা সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, পরে ভূমণ্ডলের পশ্চিমখণ্ড-নিবাসী কতকগুলি নব্য গ্রন্থকারের প্রখর মুখ-জ্যোতিঃ সহ্য করিতে না পারিয়া একপার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন।

এইরূপ কত দেশের কত গুণবান্ ও বিদ্যাবান্ ব্যক্তিকে একত্র দৃষ্টি করিলাম, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। সকলের আপন গুণ ও মর্য্যাদানুসারে আসন-গ্রহণ সম্পন্ন হইলে, তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে একে একে কীর্ত্তিদেবীর স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ কহিলেন,—"দেবি! আমি লোকদিগকে শিক্ষাদানার্থে মানসিক ও কায়িক ক্লেশ করিয়া, শরীর ক্লিষ্ট এবং অন্তঃকরণ নির্বীর্য্য করিয়াছি। কিন্তু অনেকেই তদর্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন না, এবং কেহই তাহার পুরস্কার প্রদান করেন না। অতএব, মাতঃ! তোমার শরণাপন্ন হইয়া নিবেদন করিতেছি, তোমার সানুগ্রহ কটাক্ষপাত-ব্যতিরেকে ভূ-মণ্ডলে আমার আর কোন পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।"

কেহ কহিলেন,—"দেবি! আমি কেবল তোমার প্রসাদ-লাভ-প্রত্যাশায় এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি; এবং অর্দ্ধরাত্র জাগরণপূর্ব্বক মনোহর কাব্য প্রস্তুত করিয়াছি: অতএব, জননি! আমার প্রতি সকরুণ-নেত্রে কটাক্ষপাত কর।"

যে সমস্ত মহাবীর দেবীর বামভাগে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ স্তব আরম্ভ করিলেন,—"দেবি! আমরা কেবল তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ঘোরতর সঙ্কট-সমুদায়ে পতিত হইয়াছি। তোমার নিমিত্ত কত শত নগর শোণিত-প্রবাহে প্লাবিত করিয়াছি, কত শত গ্রাম অগ্নি-সংযুক্ত করিয়া দগ্ধ করিয়াছি এবং কত শত জাতির স্বাধীনতা-রত্ন হরণ করিয়াছি। অতএব, দেবি! অতঃপর তোমার পাদ-পদ্মে স্থান দান কর।"

আমি শেষোক্ত লোকদিগের স্তোত্র-সমুদায় শ্রবণপূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম। কি! ইঁহাদের মধ্যে অনেকে কীর্ত্তিদেবীর সেবার্থে সর্ব্ব-সেবনীয় পরম পূজনীয় দেব-দেব ধর্ম্মকে অবহেলন ও কীর্ত্তি-শৈলে আরোহণার্থ পরম পবিত্র ধর্ম্মাচল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে আমার সর্ব্বাভিব্যাহারিণী হিতকারিণী বিদ্যাধরী কহিলেন,—"তুমিও কেন এ নিকেতনের এক আসন গ্রহণ করিয়া উপবেশন কর না।" আমি কহিলাম,—"বিদ্যাধরি! তুমি অনুকূল হইয়া আমাকে যে উপদেশ প্রদান করিলে তাহা শিরোধার্য্য। কিছুমাত্র যশঃস্পৃহা না থাকিলেই বা কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়া, এ স্থানে উপস্থিত হইব? কিন্তু যে সুখ্যাতি-প্রচার পরের বাগিন্দ্রিয়-পরিচালনার উপর নির্ভর করে, তাহার নিমিত্তে কোন স্থায়ী ধন বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নহে। আমি কীর্ত্তিদেবীকে কোন ক্রমে অশ্রদ্ধা করি না, এবং তাঁহার প্রসাদ-লাভার্থে ব্যাকুলও নহি। আমি যে দেবতার

যতদূর সেবা করা উচিত, তাহা করিব এবং দেবাধিপতি ধর্ম্মের আরাধনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিব; ইহাতে কীর্ত্তিদেবী আমার প্রতি অনুকূল হইয়া, কৃপাকটাক্ষ করেন, আমি সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে হৃদয়ধামে স্থান দান করিব। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া, যদি যাবতীয় লোকের অজ্ঞাত থাকি, সেও ভাল, পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া, কীর্ত্তিলাভের অভিলাষী নহি।"

এইরূপ চিন্তার বেগ প্রবল হওয়াতে, আমি সহসা জাগরিত হইয়া উঠিলাম। এখন নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিতেছি, কোথায় বা কীর্ত্তি-শৈল, কোথায় বা কীর্ত্তি-নিকেতন! আমি যে সমস্ত অতি শ্রদ্ধেয় পরম পূজনীয় মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, তাঁহারাই বা কোথায়? পূর্ব্ব-নিশায় যে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, তাহাতেই পতিত রহিয়াছি। প্রভাত সময়ের শিশির-সিক্ত সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গের আবরণ-বস্ত্র কম্পিত করিতেছে ও সর্ব্বশরীর শীতল করিতেছে।

—অক্ষয়কুমার দত্ত

আলেখ্য-দর্শন

সকলে আলেখ্য-দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতা কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! আলেখ্যের উপরিভাগে ঐ সমস্ত কি কি চিত্রিত রহিয়াছে? রাম কহিলেন, প্রিয়ে! ও সকল সমন্ত্রক জৃম্ভক অস্ত্র। ব্রহ্মাদি প্রাচীন গুরুগণ বেদরক্ষার নিমিত্ত দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া, ঐ সকল তপোময় তেজঃপুঞ্জ পরম অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। গুরুপরম্পরায় ভগবান্ কৃশাশ্বের নিকট সমাগত হইলে, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট হইতে ঐ সমস্ত মহাস্ত্র লাভ করেন। পরম কৃপালু রাজর্ষি সবিশেষ কৃপা-প্রদর্শনপূর্ব্বক তাড়কানিধনকালে অ.মাকে তৎসমুদায় প্রদান করিয়াছিলেন। তদবধি উহারা আমারই অধিকারে আছে, তোমার পুত্র হইলে, তাহাদিগকে আশ্রয় করিবে।

লক্ষ্মণ কহিলেন, দেবি! এদিকে মিথিলাবৃত্তান্ত অবলোকন করুন। সীতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, তাইত, ঠিক যেন আর্য্যপুত্র হরধনু উত্তোলন করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর পিতা আমার বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনিমেষনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আ মরি মরি! কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে! আবার, এদিকে বিবাহকালীন সভা; সেই সভায় তোমরা চারি ভাই তৎকালোচিত বেশভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া কেমন শোভা পাইতেছ! চিত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন সেই প্রদেশে ও সেই সময়ে বিদ্যমান রহিয়াছি। শুনিয়া, পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম কহিলেন, প্রিয়ে! যথার্থ কহিয়াছ, যখন মহর্ষি শতানন্দ তোমার কমনীয় কোমল করপল্লব আমার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, যেন সেই সময় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চিত্রপটের স্থলান্তরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া, লক্ষ্মণ কহিলেন, এই আর্য্যা, এই আর্য্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্ত্তি; কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ ঊর্ম্মিলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে ঊর্ম্মিলার দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! এদিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ কোন উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, দেবি! দেখুন দেখুন, হর-শরাসন-ভঙ্গবার্ত্তা-শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া, ক্ষত্রিয়-কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন আমাদিগের অযোধ্যাগমনপথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন, আবার, এদিকে দেখুন, ভুবন-বিজয়ী আর্য্য তাঁহার দর্প সংহার করিবার নিমিত্ত শরাসনে শর-সন্ধান করিয়াছেন। রাম আত্মপ্রশংসাবাদশ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইতেন, এজন্য কহিলেন, লক্ষ্মণ! এ চিত্রে আর আর নানা দর্শনীয় সত্ত্বেও, ঐ অংশ লইয়া আন্দোলন করিতেছ কেন? সীতা রাম-বাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, নাথ! এমন না হইলে সংসারের লোকে একবাক্য হইয়া, আপনার এত প্রশংসা করিবে কেন?

তৎপরেই অযোধ্যা-প্রবেশকালীন চিত্র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে, রাম অশ্রুপূর্ণ-লোচনে গদ্‌গদ-বচনে কহিতে লাগিলেন, আমরা বিবাহ করিয়া আসিলে কত উৎসবে দিনপাত হইয়াছিল; পিতৃদেবের কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ, মাতৃদেবীরা অভিনব বধূদিগকে পাইয়া কেমন আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন, সতত তাহাদিগের প্রতি কতই যত্ন, কতই মমতা প্রদর্শন করিতেন;

রাজভবন নিরন্তর আহ্লাদময় ও উৎসবপূর্ণ। হায়! সে সকল কি আহ্লাদ ও কি উৎসবের দিনই গিয়াছে! লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! এই মন্থরা। রাম মন্থরার নাম শ্রবণে অন্তঃকরণে বিরক্ত হইয়া, কোন উত্তর না দিয়া, অন্যদিকে দৃষ্টিসঞ্চারণপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ, শৃঙ্গবের নগরে যে তাপস-তরুতলে পরম বন্ধু নিষাদপতির সহিত সমাগম হইয়াছিল, উহা কেমন সুন্দর চিত্রিত রহিয়াছে!

সীতা দেখিয়া হর্ষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, নাথ! এদিকে জটাবন্ধন ও বল্কলধারণ-বৃত্তান্ত দেখুন। লক্ষ্মণ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, (ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা বৃদ্ধবয়সে পুত্রহস্তে রাজ্যলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন ; কিন্তু আর্য্যকে যৌবনকালেই সেই কঠোর আরণ্য-ব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।) পরে রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! মহর্ষি ভরদ্বাজ আমাদিগকে চিত্রকূট যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া, যাহার কথা কহিয়াছিলেন, এই সেই কালিন্দী-তটবর্ত্তী বটবৃক্ষ। তখন সীতা কহিলেন, কেমন নাথ! এই প্রদেশের কথা স্মরণ হয়? রাম কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? এইস্থলে তুমি পথশ্রমে ক্লান্তা ও কাতরা হইয়া আমার বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা গিয়াছিলে।

সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এদিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে! আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধারণ করিয়া আতপ-নিবারণ করিয়াছিলেন। রাম কহিলেন, প্রিয়ে! এই সেইসকল গিরিতরঙ্গিণী-তীরবর্ত্তী তপোবন. গৃহস্থগণ বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে, কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! (এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ-গিরি ; এই গিরির শিখর-দেশ আকাশপথে সতত-সঞ্চরমাণ জলধরপটলসংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত ; অধিত্যকা-প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ, শীতল ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।

রাম কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এইস্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম? আমরা কুটীরে থাকিতাম, লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া

আহারোপযোগী ফলমূলাদি আহরণ করিতেন ; গোদাবরীতীরে মৃদুমন্দগমনে ভ্রমণ করিয়া, প্রাহ্ণে ও অপরাহ্ণে নির্ম্মলসলিলকণবাহী শীতল সমীরণ সেবা করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল!

লক্ষ্মণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, আর্য্যে! এই পঞ্চবটী, এই শূর্পণখা। মুগ্ধস্বভাবা সীতা, যেন যথার্থই পূর্ব্ব অবস্থা উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া ম্লান-বদনে কহিলেন, হা নাথ! এই পর্য্যন্ত দেখাশুনা শেষ হইল। রাম হাস্যমুখে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, অয়ি বিয়োগ-কাতরে! এ চিত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা নহে। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চার করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই চিত্রদর্শনে জনস্থানবৃত্তান্ত বর্ত্তমানবৎ বোধ হইতেছে। (দুরাচার নিশাচরেরা হেমময়-মৃগচ্ছলে যে অতি বিষম অনর্থসংঘটন করিয়াছিল, যদিও সমুচিত বৈরনির্য্যাতন দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে, মর্ম্মবেদনা প্রদান করে।) সেই ঘটনার পর, আর্য্য মানবসমাগমশূন্য জনস্থান-ভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতর-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকন করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সীতা লক্ষ্মণমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! এ অভাগিনীর জন্য আর্য্যপুত্রকে কতই ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল! সেই সময় রামেরও নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! চিত্র দেখিয়া আপনি এত অভিভূত হইলেন কেন? রাম কহিলেন, বৎস! তৎকালে আমার যে বিষম অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদি বৈরনির্য্যাতনসঙ্কল্প অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরূক না থাকিত, তাহা হইলে আমি কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না। (চিত্র-দর্শনে সেই অবস্থা স্মরণ হওয়াতে বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থিসকল শিথিল হইয়া গেল। তুমি সকলই স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছ, তবে অনভিজ্ঞের মত কথা কহিতেছ কেন?)

লক্ষ্মণ শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন, এবং বিষয়ান্তর-সংঘটন দ্বারা রামের চিত্তবৃত্তির ভাবান্তর-সম্পাদন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এদিকে দণ্ডকারণ্য-ভূভাগ অবলোকন করুন ; এই স্থানে দুর্দ্ধর্ষ কবন্ধ রাক্ষসের বাস ছিল ; এদিকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গমুনির

আশ্রম ; এই সেই সিদ্ধশবরী শ্রমণা : এই দিকে পম্পা সরোবর। রাম পম্পা-শব্দ-শ্রবণে সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! পম্পা পরম রমণীয় সরোবর, আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম : দেখিলাম প্রফুল্ল কমলসকল মন্দ মারুতভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া সরোবরের অনির্ব্বচনীয় শোভাসম্পাদন করিতেছে : তাহাদের সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে ; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে ; হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ বিহঙ্গম মনের আনন্দে নির্ম্মল সলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে আমার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল ; সুতরাং সরোবরের শোভা সম্যক্ অবলোকন করিতে পারি নাই ; এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্গত হইবার মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র নয়নের যে অবকাশ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই কেবল এক একবার অস্পষ্ট অবলোকন করি।

সীতা চিত্রপটের এক অংশে দৃষ্টিসংযোগ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, ঐ যে পর্ব্বতে কুসুমিতকদম্বতরুশাখায় মদমত্ত ময়ূরময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্য্যপুত্র তরুতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি রোদন করিতে করিতে উঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি? লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্যে! ঐ পর্ব্বতের নাম মাল্যবান্, মাল্যবান্ বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান ; দেখুন নবজলধরসংযোগে শিখরদেশের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে আর্য্য একান্তবিকলচিত্ত হইয়াছিলেন।

রাম শুনিয়া, পূর্ব্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে একান্ত আকুল-হৃদয় হইয়া কহিলেন, বৎস! বিরত হও, বিরত হও, আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না, শুনিয়া আমার শোকসাগর অনিবার্য্য বেগে উথলিয়া উঠিতেছে, জানকী-বিরহ পুনর্ব্বার নবীভাব অবলম্বন করিতেছে। এই সময়ে সীতার আলস্য-লক্ষণ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আর চিত্র-দর্শনের প্রয়োজন নাই, আর্য্যা জানকীর ক্লান্তিবোধ হইতেছে ; এক্ষণে ইঁহার বিশ্রামসুখসেবা আবশ্যক ; আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঐহিকতা

অতি বালককালে একবার শিকারী পাখীর শিকার-শিক্ষা দেখিয়াছিলাম। একজন পাখীটিকে হাতের উপর করিয়া লইয়া যাইতেছিল এবং এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমাদের একটা টিয়া পাখী সেইমাত্র পলাইয়া নিকটবর্ত্তী নিমগাছের ডালে বসিয়া ছিল। আমি তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়া ছিলাম। যে ব্যক্তির হাতে শিক্রে বসিয়া ছিল, সে বোধ হয়, আমার দৃষ্টির অনুসরণে দৃষ্টিপাত করিয়া টিয়াটিকে দেখিল এবং তাহার শিক্রেকে ছাড়িল। তীরবেগে শিক্রে গিয়া টিয়ার উপরে পড়িল, আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। শিকারী বুঝিতে পারিল যে টিয়াটি পোষা। সে একটি শিস দিল, শিক্রে অমনি টিয়াকে ছাড়িয়া তাহার হাতের উপরে আসিয়া চঞ্চুপুট দিয়া আপনার পক্ষ কুট্টন করিতে লাগিল—কে বলিবে এই শিক্রে সেই শিক্রে।

বাল্যকালে ঐ অদ্ভুত দৃশ্য চিত্তপটে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল, কখনও অপনীত হয় নাই। অতএব বয়োধিক হইলে যখন প্রবৃত্তির পথ উৎকৃষ্ট কি নিবৃত্তির পথ উৎকৃষ্ট, ব্রাহ্মণ-সন্তানের হৃদয়ে এই বিচার স্বতঃই উত্থিত হইল, তখন জর্ম্মন দেশীয় রিখ্টর নামক একজন গ্রন্থকর্ত্তার শ্যেন পক্ষীর শিকার-সম্বন্ধীয় উপমাটি বড়ই মিষ্ট লাগিল, এবং প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-সম্বন্ধীয় বিচারের মীমাংসাও সেই উপমাটির বলে সম্পাদিত হইয়া গেল। রিখ্টর বলেন, শ্যেন পক্ষী যেমন স্বীয় প্রভুর ইঙ্গিতমাত্রে শিকারের প্রতি ধাবমান হয়, আবার ইঙ্গিতমাত্রে ফিরিয়া আইসে, মনুষ্যের মনও সেইরূপে শিক্ষিত হওয়া উচিত। বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান যে কার্য্যে প্রবৃত্তি দিবে, মানুষ তাহাই একান্ত-মনে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে সম্পন্ন করিবে। আবার বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহা হইতে নিবৃত্ত করিবে, বিনা বিলম্বে এবং বিনা ক্ষোভে সেই বিষয় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে। সমুদায় আর্য্যশাস্ত্রের শাসনও ঐরূপ। ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত এবং মনকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিয়া অনাসক্ত চিত্তে নিয়ত কার্য্যানুষ্ঠান করিতেই শাস্ত্রের উপদেশ, ইহাতে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়েরই সামঞ্জস্য বিধান হওয়ায় দুঃখের হ্রাস, চিত্তের প্রাসর্য্য এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্মে। ইহাই ঐহিক এবং পারমার্থিক উভয় শ্রেয়ের সাধনোপায়। ঐহিক সাধনের

প্রকৃত পথ পারমার্থিক সাধনের প্রকৃত পথ হইতে ভিন্ন নহে। "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।"

কিন্তু শাস্ত্রের মত এইরূপ পরিষ্কার, বিশুদ্ধ এবং প্রশস্ত হইলেও, আমাদিগের দেশে কতকটা ভিন্নরূপ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রবৃত্তির পথ এবং নিবৃত্তির পথ দুইটিকে মিলাইয়া যে উভয়-লোক-হিতকরী ব্যবহার-পদ্ধতি জন্মে, তাহা এখন আর তেমন যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া লওয়া হয় না। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি বাহ্যজগতের আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণের ন্যায় পরস্পর বিপরীত হইলেও যে যুগপৎ কার্য্যকারী তাহা একেবারে বিস্মৃত। এবং তাহার ফল এই হইয়াছে যে, যাহারা প্রবৃত্তির পথে যাইতেছে, তাহারা ক্রমে অধোগত হইয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে, আর যাহারা নিবৃত্তির পথে যাইতেছে মনে করে, তাহারাও অনেকে ভ্রষ্টাচার এবং স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে।

মানুষ পথ চলে কেমন করিয়া? একটি পা স্থির থাকে, অপরটি অগ্রসর হয়, আবার সেইটি স্থির হয়, পূর্ব্বেরটি অগ্রবর্ত্তী হয়। অতএব গমনরূপ একটি কার্য্যের মধ্যে স্থিরভাব এবং চলভাব দুইটিই বিদ্যমান থাকে। জীবন-বর্ত্মের চলনেও ঐরূপ হওয়া বিধেয়। প্রবৃত্তি-প্রভাবে অয়ন, নিবৃত্তি-প্রভাবে বিশ্রাম। প্রাণিশরীর জীবৎ থাকে কিরূপে? হৃৎকোষ সংকুচিত হয়, তাহা হইতে শোণিতধারা নির্গত হইয়া সমুদায় দেহে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে, আবার হৃৎকোষ প্রসারিত হয়, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তিত শোণিতধারা আসিয়া প্রবেশ করে। অতএব রক্ত-প্রবহণ-ব্যাপারে সঙ্কোচন এবং প্রসারণরূপ বিপরীত উভয় কার্য্যের সম্মিলন হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবনরক্ষাও ঐ প্রকারে হইয়া থাকে। জাগতিক যাবৎ পদার্থের বিভূতি জ্ঞানময় কোষে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই জ্ঞানময় কোষ হইতে কর্ম্মরূপে বহির্ভাগে আইসে। ফলতঃ জগতের সকল বস্তুতেই পরস্পর বিপরীত শক্তির যুগপৎ আবির্ভাব থাকে। আকর্ষণ না থাকিলে বিপ্রকর্ষণ বা তাপের প্রভাবে পরমাণুসকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত হইত। আবার বিপ্রকর্ষণ বা তাপ যদি কিছুমাত্র না থাকে, তাহা হইলে কোন দ্রব্যেরই বিস্তৃতি সম্ভবে না, সংঘাতের অশেষবলে সকলেই একেবারে রূপবিহীন হইয়া পড়ে। অতএব দুইটি বিভিন্ন এবং বিপরীত শক্তির যুগপৎ অবস্থানই জগতে প্রতীয়মান হয়, একমাত্র শক্তির কার্য্য কোথাও স্থূল দৃষ্টিতে দৃশ্যমান হয় না।

কিন্তু ব্যষ্টীভূত জগতের নিয়ম এইরূপ হইলেও শাস্ত্রকারেরা দেখিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই উভয় শক্তির মধ্যে সাধারণতঃ প্রবৃত্তির বলই অধিক। ভগবান্ ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাদিগের উপদেশে নিবৃত্তির শিক্ষাই অধিকতর হয়। প্রবৃত্তি প্রবলা—নিবৃত্তি দুর্ব্বলা। শাস্ত্রকারেরা উহাদিগের সামঞ্জস্য-বিধানের উদ্দেশ্যে যেটি দুর্ব্বলা, উপদেশাদি দ্বারা সেইটির সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অপরাপর জাতির শাস্ত্রকারদিগের অপেক্ষা আর্য্যশাস্ত্রকারেরা নিবৃত্তি-পক্ষের শিক্ষাদানে অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়াই কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তাঁহারা কেবলমাত্র নিবৃত্তিবিষয়ক শিক্ষাদানেই পটু। এরূপ ভ্রমানুমানের আরও একটি কারণ আছে। আর্য্যশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ যথা ভগবান্ শঙ্করস্বামী, নিবৃত্তি-মার্গের চরম ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল ব্যাখ্যাতৃবর্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া এবং আর্য্যশাস্ত্রের মূলীভূত অধিকারীর ভেদবিচার-বিষয়ে একান্ত অজ্ঞতাপ্রযুক্ত, অনেকেই আর্য্যশাস্ত্রকে ঐহিকতার বিরোধী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক আমাদিগের শাস্ত্রের শিক্ষা লোকদ্বয়ের শুভসাধিনী—শুদ্ধ পারলৌকিক উন্নতিসাধিনী নহে।

—ভূদেব মুখোপাধ্যায়

বৈশম্পায়নের আত্মকথা

ভারতবর্ষের মধ্যস্থলে বিন্ধ্যাচলের নিকটে এক অটবী আছে। উহাকে বিন্ধ্যাটবী কহে। ঐ অটবীর মধ্যে গোদাবরী নদীর তীরে ভগবান্ অগস্ত্যের আশ্রম ছিল। এই সেই স্থান, যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীতে পর্ণশালা

নির্ম্মাণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন,—যে স্থানে দুর্ব্বৃত্ত দশাননপ্রেরিত নিশাচর মারীচ কনকমৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক জানকীর নিকট হইতে রামচন্দ্রকে হরণ করিয়াছিল,—যে স্থানে মৈথিলীবিয়োগবিধুর রাম ও লক্ষ্মণ সাশ্রুনয়নে ও গদ্‌গদবচনে নানাপ্রকার বিলাপ ও অনুতাপ করিয়া তত্রস্থ পশুপক্ষীদিগকেও দুঃখিত এবং বৃক্ষদিগকেও পরিতাপিত করিয়াছিলেন। ঐ আশ্রমের অনতিদূরে পম্পানামক সরোবর আছে। ঐ সরোবরের পশ্চিম তীরে ভগবান্ রামচন্দ্র শর দ্বারা যে সপ্ততাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে এক প্রকাণ্ড শাল্মলীবৃক্ষ আছে। বৃহৎ এক অজগর সর্প সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া থাকাতে, বোধ হয় যেন, আলবাল রচিত রহিয়াছে। উহার শাখাপ্রশাখা এরূপ উন্নত ও বিস্তৃত, বোধ হয় যেন, হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক গগনমণ্ডলের দৈর্ঘ্য পরিমাণ করিয়া উঠিতেছে। স্কন্ধদেশ এরূপ উচ্চ, বোধ হয় যেন, একবারে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিবার আশয়ে মুখ বাড়াইতেছে। ঐ তরুর কোটরে, শাখাগ্রে, স্কন্ধদেশে ও বল্কলবিবরে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া শুক, সারিকা প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষী সুখে বাস করে। তরু অতিশয় প্রাচীন সুতরাং বিরলপল্লব হইয়াও পক্ষিশাবকদিগের দিবানিশি অবস্থিতি-প্রযুক্ত সর্ব্বদা নিবিড়পল্লবাকীর্ণ বোধ হয়। কোন কোন পক্ষিশাবকের পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই, তাহাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। পক্ষীরা রাত্রিকালে বৃক্ষকোটরে আপন আপন নীড়ে নিদ্রা যায়। প্রভাত হইলে আহারের অন্বেষণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হয়। তৎকালে বোধ হয় যেন, হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদলপরিপূর্ণ ক্ষেত্র আকাশমার্গ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা দিগ্দিগন্তে গমন করিয়া আহারদ্রব্য অন্বেষণপূর্ব্বক আপনারা ভোজন করে এবং শাবকদিগের নিমিত্ত চঞ্চুপুটে করিয়া খাদ্যসামগ্রী আনে ও যত্নপূর্ব্বক আহার করাইয়া দেয়।

সেই মহীরুহের এক জীর্ণ কোটরে আমার মাতাপিতা বাস করিতেন। কালক্রমে মাতা গর্ভবতী হইলেন এবং আমাকে প্রসব করিয়া সূতিকাপীড়ায় অভিভূত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। পিতা তৎকালে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার প্রিয়তমা জায়ার বিয়োগশোকে অতিশয় ব্যাকুল ও দুঃখিতচিত্ত হইলেন; তথাপি স্নেহবশতঃ আমাকেই অবলম্বন করিয়া আমার লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার গমন করিবার কিছুমাত্র শক্তি ছিল না, তথাপি আস্তে আস্তে সেই আবাসতরুতলে নামিয়া

পক্ষিকুলায়ভ্রষ্ট যে যৎকিঞ্চিৎ আহারদ্রব্য পাইতেন আমাকে আনিয়া দিতেন, আমার আহারাবশিষ্ট যাহা থাকিত আপনি ভোজন করিয়া যথাকথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেন।

একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে, নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে, গগনাঙ্গন-বিক্ষিপ্ত অন্ধকাররূপ ভস্মরাশি দিনকরের কিরণরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা দূরীকৃত হইলে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহনমানসে মানসসরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল। পক্ষিশাবকেরা নিঃশব্দে কোটরে রহিয়াছে ও আমি পিতার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে ভয়াবহ মৃগয়াকোলাহল শুনিতে পাইলাম। কোন দিকে সিংহসকল গম্ভীরস্বরে গর্জ্জন করিতে লাগিল ; কোন প্রদেশে তুরঙ্গ, কুরঙ্গ, মাতঙ্গ প্রভৃতি বনচর পশুসকল বন আন্দোলন করিয়া বেড়াইতে লাগিল ; কোন স্থানে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বরাহ প্রভৃতি ভীষণাকার জন্তুসকল ছুটাছুটি করিতে লাগিল ; কোন স্থানে মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্তুগণ অতিবেগে দৌড়িতে লাগিল ও তাহাদিগের গাত্রঘর্ষণে বৃক্ষসকল ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল। মাতঙ্গের চীৎকারে, তুরঙ্গের হ্রেষারবে, সিংহের গর্জ্জনে ও পক্ষীদিগের কলরবে বন আকুল হইয়া উঠিল এবং তরুগণও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আমি সেই কোলাহলশ্রবণে ভয়বিহ্বল ও কম্পিতকলেবর হইয়া পিতার জীর্ণ পক্ষপুটের অন্তরালে লুকাইলাম। তথা হইতে ব্যাধদিগের, ঐ বরাহ যাইতেছে, ঐ হরিণ দৌড়িতেছে, ঐ করভ পলাইতেছে ইত্যাদি নানাপ্রকার কোলাহল শুনিতে লাগিলাম।

মৃগয়াকোলাহল নিবৃত্ত হইলে অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইল। তখন আমি পিতার পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বিনির্গত হইয়া কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া যে দিকে কোলাহল হইতেছিল সেই দিকে—দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায় বিকটমূর্ত্তি এক সেনাপতি সমভিব্যাহারে যমদূতের ন্যায় কতকগুলি কুরূপ ও কদাকার শবরসৈন্য আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ভূতবেষ্টিত ভৈরব ও দূতমধ্যবর্ত্তী কালান্তকের স্মরণ হয়। সেনাপতির নাম মাতঙ্গক পশ্চাৎ অবগত হইলাম। সুরাপানে দুই চক্ষু জবাবর্ণ ; সর্ব্বশরীরে বিন্দু বিন্দু রক্ত-কণিকা লাগিয়াছে ; সঙ্গে কতকগুলি বড় বড় শিকারী কুকুর আছে।

তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন বিকটাকার অসুর বন্য পশু ধরিয়া খাইতে আসিয়াছে। শবরসৈন্য অবলোকন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম যে, ইহারা কি দুরাচার ও দুষ্কর্ম্মান্বিত! জনশূন্য অরণ্য ইহাদিগের বাসস্থান, মদ্য-মাংস আহার, ধনু ধন, কুক্কুর সুহৃৎ, ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর সহিত একত্র বাস এবং পশুদিগের প্রাণবধ করাই জীবিকা ও ব্যবসায়। অন্তঃকরণে দয়ার লেশ নাই, অধর্ম্মের ভয় নাই ও সদাচারে প্রবৃত্তি নাই। ইহারা সাধুবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সকলের নিকটেই নিন্দাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ হইতেছে, সন্দেহ নাই। এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম এমন সময়ে মৃগয়াজন্য শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত তাহারা আমাদিগের আবাসতরুতলের ছায়ায় আসিয়া উপবিষ্ট হইল। অনতিদূরস্থিত সরোবর হইতে জল ও মৃণাল আনিয়া পিপাসা ও ক্ষুধা শান্ত করিল। শ্রান্তি দূর করিয়া চলিয়া গেল।

শবরসৈন্যের মধ্যে এক বৃদ্ধ সে দিন কিছুই শিকার করিতে পারে নাই ও মাংস প্রভৃতি কিছুই পায় নাই ; সে উহাদিগের সঙ্গে না গিয়া তরুতলে দণ্ডায়মান থাকিল, সকলে দৃষ্টিপথের অগোচর হইলে, রক্তবর্ণ দুই চক্ষুদ্বারা সেই তরুর মূল অবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এক বার নিরীক্ষণ করিল। তাহার নেত্রপাতমাত্রেই কোটরস্থিত পক্ষিশাবকদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। হায়, নৃশংসের অসাধ্য কি আছে! সোপানশ্রেণীতে পাদক্ষেপপূর্ব্বক অট্টালিকায় যেরূপ অনায়াসে উঠা যায়, নৃশংস কণ্টকাকীর্ণ দুরারোহ সেই প্রকাণ্ড মহীরূহে সেইরূপ অবলীলাক্রমে আরোহণ করিল এবং কোটরে কর প্রসারিত করিয়া পক্ষিশাবকদিগকে ধরিয়া একে একে বহির্গত করিয়া প্রাণসংহারপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পিতার একে বৃদ্ধ বয়স তাহাতে অকস্মাৎ এ বিষম সংকট উপস্থিত হওয়াতে নিতান্ত ভীত হইলেন। ভয়ে কলেবর দ্বিগুণ কাঁপিতে লাগিল এবং তালুদেশ শুষ্ক হইয়া গেল। ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন কিন্তু প্রতীকারের কোন উপায় না দেখিয়া আমাকে পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিলেন ও আপন বক্ষঃস্থলের নিম্নে লুকাইয়া রাখিলেন। আমাকে যখন পক্ষপুটে আচ্ছাদন করেন তখন দেখিলাম তাঁহার নয়নযুগল হইতে জলধারা পড়িতেছে। নৃশংস ক্রমে ক্রমে আমাদিগের কুলায়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া কালসর্পাকার বাম কর কোটরে প্রবেশিত করিয়া পিতাকে ধরিল। তিনি চঞ্চুপুট দ্বারা যথাশক্তি আঘাত ও দংশন করিলেন, কিছুতেই ছাড়িল না। কোটর হইতে বহির্গত করিল, যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিল,

পরিশেষে প্রাণ বিনষ্ট করিয়া নিম্নে নিক্ষেপ করিল। পিতার পক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত ও ভয়ে সংকুচিত হইয়াছিলাম বলিয়া আমাকে দেখিতে পাইল না। ঐ তরুতলে শুষ্ক পর্ণরাশি একত্রিত ছিল তাহারই উপর পতিত হইলাম, অধিক আঘাত লাগিল না।

(অধিক বয়স না হইলে অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হয় না। কিন্তু ভয়ের সঞ্চার জন্মাবধিই হইয়া থাকে।) শৈশব-প্রযুক্ত আমার অন্তঃকরণে স্নেহসঞ্চার না হওয়াতে কেবল ভয়েরই পরতন্ত্র হইলাম। প্রাণপরিত্যাগের উপযুক্ত কালেও নিতান্ত নৃশংস ও নির্দ্দয়ের ন্যায় উপরত পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অস্থির চরণ ও অসমগ্রোদিত পক্ষপুটের সাহায্যে আস্তে আস্তে গমন করিবার উদ্যোগ করাতে বারংবার ভূতলে পড়িতে ও তথা হইতে উঠিতে লাগিলাম। ভাবিলাম বুঝি এ যাত্রায় কৃতান্তের করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ হইল। পরিশেষে মন্দ মন্দ গমন করিয়া নিকটস্থিত এক তমালতরুর মূলদেশে লুকাইলাম। এমন সময়ে সেই নৃশংস চণ্ডাল শাল্মলীবৃক্ষ হইতে নামিয়া পক্ষিশাবকদিগকে একত্রিত ও লতাপাশে বদ্ধ করিল এবং যে পথে শবরসৈন্যেরা গিয়াছিল সেই পথ দিয়া চলিয়া গেল।

দূর হইতে পতিত ও ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হওয়াতে আমার কলেবর কম্পিত হইতেছিল ; আবার বলবতী পিপাসা কণ্ঠশোষ করিল। এতক্ষণে পিশাচ অনেক দূর গিয়া থাকিবে এই সম্ভাবনা করিয়া মুখ বাড়াইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলাম। কোন দিকে কোন শব্দ শুনিবামাত্র অমনি শঙ্কিত হইয়া পদে পদে বিপদ্ আশংকা করিয়া তমালমূল হইতে নির্গত হইলাম ও আস্তে আস্তে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কখন বা পার্শ্বে কখন বা সম্মুখে পতিত হওয়াতে শরীর ধূলিধূসরিত হইল ও ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম,—কি আশ্চর্য্য! যত দুর্দ্দশা ও যত কষ্ট সহ্য করিতে হউক না কেন, তথাপি কেহ জীবনতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারে না। আমার সমক্ষে পিতা প্রাণ ত্যাগ করিলেন, স্বচক্ষে দেখিলাম। আমিও বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া বিকলেন্দ্রিয় ও মৃতপ্রায় হইয়াছি ; তথাপি বাঁচিবার বিলক্ষণ বাসনা আছে। হায়, আমার তুল্য নির্দ্দয় কে আছে? মাতা প্রসবসময়ে প্রাণ ত্যাগ করিলে পিতা জায়াশোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াও কেবল আমাকেই অবলম্বন করিয়া আমার লালনপালন করিতেছিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহপ্রযুক্ত বৃদ্ধ বয়সেও

তাদৃশ বিষম ক্লেশ সহ্য করিয়া আমারই রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আমি সে-সকল একেবারে বিস্মৃত হইলাম। আমার মত কৃতঘ্ন আর নাই; আমার মত নৃশংস ও দুরাচার এই ভূমণ্ডলে কাহাকেও দেখিতে পাই না। কি আশ্চর্য্য! সেরূপ অবস্থাতেও আমার জল পান করিবার অভিলাষ হইল। সারস ও কলহংসের অনতিপরিস্ফুট কলরব শুনিয়া অনুমান করিলাম সরোবর দূরে আছে। কিরূপে সরোবরে যাইব, কিরূপে জল পান করিয়া প্রাণ বাঁচাইব, অনবরত এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত। গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে দিনমণি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রচণ্ড অংশসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রৌদ্রের উত্তাপে পথ উত্তপ্ত হইল। পথে পাদক্ষেপ করা কাহার সাধ্য? সেই উত্তপ্ত বালুকায় আমার পদ দগ্ধ হইতে লাগিল। কোন প্রকারে মরিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সে সময়ে এরূপ কষ্ট ও যাতনা উপস্থিত হইল যে, বিধাতার নিকট বারংবার মরণের প্রার্থনা করিতে হইল। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক ও অঙ্গ অবশ হইল।

সেই স্থানের অনতিদূরে জাবালি নামে পরমপবিত্র মহাতপা মহর্ষি বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র হারীত কতিপয় বয়স্য সমভিব্যাহারে সেই দিক্ দিয়া স্নান করিতে যাইতেছিলেন। তিনি এরূপ তেজস্বী যে, হঠাৎ দেখিলে সাক্ষাৎ সূর্য্যদেবের ন্যায় বোধ হয়। তাঁহার মস্তকে জটাভার, ললাটে ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্রক, কর্ণে স্ফটিকমালা, বাম করে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে আষাঢ়দণ্ড, স্কন্ধে কৃষ্ণাজিন ও গলদেশে যজ্ঞোপবীত। তাঁহার প্রশান্ত আকৃতি দেখিবামাত্র বোধ হইল যেন, পরমকারুণিক ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি আমার রক্ষার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। সাধুদিগের চিত্ত স্বভাবতই দয়ার্দ্র। আমার সেইরূপ দুর্দ্দশা ও যন্ত্রণা দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে করুণোদয় হইল, এবং আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া বয়স্যদিগকে কহিলেন,—দেখ, দেখ! একটি শুকশিশু পথে পতিত রহিয়াছে। বোধ হয় এই শাল্মলীতরুর শিখরদেশ হইতে পতিত হইয়া থাকিবে। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে ও বারংবার চঞ্চুপুট ব্যাদান করিতেছে; বোধ হয় অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া থাকিবে। জল না পাইলে আর অধিক ক্ষণ বাঁচিবে না। চল, আমরা ইহাকে সরোবরে লইয়া যাই। জল পান করাইয়া দিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। এই বলিয়া আমাকে ভূতল হইতে তুলিলেন। তাঁহার করস্পর্শে আমার উত্তপ্ত গাত্র কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল।

অনন্তর সরোবরে লইয়া গিয়া আমার মুখ উন্নত ও চঞ্চুপুট বিস্তৃত করিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বিন্দু বিন্দু বারি প্রদান করিলেন। জল পান করিয়া পিপাসার শান্তি হইল। পরে আমাকে স্নান করাইয়া নলিনীপত্রের শীতল ছায়ায় বসাইয়া রাখিলেন। অনন্তর ঋষিকুমারেরা স্নানান্তে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক ভগবান্ ভাস্করকে প্রণাম করিলেন এবং আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ ও পবিত্র নূতন বসন পরিধানপূর্ব্বক আমাকে গ্রহণ করিয়া তপোবনাভিমুখে মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন।

তপোবন সন্নিহিত হইলে দেখিলাম তত্রস্থ তরু ও লতাসকল কুসুমিত, পল্লবিত ও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এলা ও লবঙ্গলতার কুসুমগন্ধে দিক্ আমোদিত হইতেছে। মধুকর ঝঙ্কার করিয়া এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে বসিয়া মধু পান করিতেছে। অশোক, চম্পক, কিংশুক, সহকার, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ ও লতার সমাবেশে এবং তাহাদিগের শাখা ও পল্লবের পরস্পর সংযোগে মধ্যে মধ্যে রমণীয় গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার অভ্যন্তরে দিনকরের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। মহর্ষিগণ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রজ্বলিত অনলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছেন এবং প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার উত্তাপে বৃক্ষের পল্লবসকল মলিন হইয়া যাইতেছে। গন্ধবহ হোমগন্ধ বিস্তারপূর্ব্বক মন্দ মন্দ বহিতেছে। মুনিকুমারেরা কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে বেদ উচ্চারণ কেহ বা প্রশান্তভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। মৃগকদম্ব নির্ভরচিত্তে বনের চতুর্দ্দিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে। শুকমুখভ্রষ্ট নীবারকণিকা তরুতলে পতিত রহিয়াছে।

তপোবন দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ আহ্লাদে পুলকিত হইল। অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া দেখিলাম রক্তপল্লবশোভিত রক্তাশোকতরুর ছায়ায় পরিষ্কৃত পবিত্র স্থানে বেত্রাসনে ভগবান্ মহাতপা মহর্ষি জাবালি বসিয়া আছেন। অন্যান্য মুনিগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন। মহর্ষি অতিপ্রাচীন, জরার প্রভাবে মস্তকের জটাভার ও গাত্রের লোমসকল ধবলবর্ণ, কপালে ত্রিবলি, গণ্ডস্থল নিম্ন, শিরা ও পঞ্জরের অস্থিসকল বহির্গত, এবং শ্বেতবর্ণ রোমে কর্ণবিবর আচ্ছাদিত। তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর আকৃতি দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন, তিনি করুণারসের প্রবাহ, ক্ষমা ও সন্তোষের আধার, শান্তিলতার মূল, ক্রোধভুজঙ্গের মহামন্ত্র, সৎপথের প্রদর্শক, এবং সৎস্বভাবের আশ্রয়। তাঁহাকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে একদা ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল।

ভাবিলাম, মহর্ষির কি প্রভাব! ইঁহার প্রভাবে তপোবনে হিংসা, দ্বেষ, বৈর, মাৎসর্য্য, কিছুই নাই। ভুজঙ্গেরা আতপতাপিত হইয়া শিখীর শিখাকলাপের ছায়ায় সুখে শয়ন করিয়া আছে। হরিণশাবকেরা সিংহশাবকের সহিত সিংহীর স্তন্যপান করিতেছে। করভসকল ক্রীড়া করিতে করিতে শুণ্ড দ্বারা সিংহকে আকর্ষণ করিতেছে। মৃগকুল অব্যাকুলচিত্তে বৃকের সহিত একত্র চরিতেছে। এবং শুষ্ক বৃক্ষও মুকুলিত হইয়াছে। বোধ হয় যেন, সত্যযুগ কলিকালের ভয়ে পলাইয়া তপোবনে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে। অনন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, আশ্রমস্থিত তরুগণের শাখায় মুনিদিগের বল্কল শুকাইতেছে, কমণ্ডলু ও জপমালা ঝুলিতেছে এবং মূলদেশে বসিবার নিমিত্ত বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। বোধ হয় যেন, বৃক্ষসকলও তপস্বিবেশ-ধারণপূর্ব্বক তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

—তারাশঙ্কর তর্করত্ন

স্তিমিত প্রদীপে

নগেন্দ্রের আদেশমত পরিচারিকারা সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিল। শুনিয়া কমলমণি ঘাড় নাড়িলেন।

নিশীথকালে, পৌরজন সকলে সুষুপ্ত হইলে, নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর শয়নগৃহে শয়ন করিতে গেলেন। শয়ন করিতে না—রোদন করিতে? সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহ অতি প্রশস্ত এবং মনোহর; উহা নগেন্দ্রের সকল সুখের মন্দির, এই জন্য তাহা যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঘরটি প্রশস্ত এবং উচ্চ, হর্ম্মতিল শ্বেতকৃষ্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরে রচিত। কক্ষপ্রাচীরে নীল, পিঙ্গল, লোহিত

লতাপল্লবফলপুষ্পাদি চিত্রিত ; তদুপরি বসিয়া নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহঙ্গমসকল ফল ভক্ষণ করিতেছে। এক পাশে বহুমূল্য দারুনির্ম্মিত হস্তিদন্তখচিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট পর্য্যঙ্ক, আর এক পাশে বিচিত্র বস্ত্রমণ্ডিত নানাবিধ কাষ্ঠাসন এবং বৃহদ্দর্পণ প্রভৃতি গৃহসজ্জার বস্তু বিস্তর ছিল। কয়খানি চিত্র কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল। চিত্রগুলি বিলাতী নহে। সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনীত করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। দেশী চিত্রকর একজন ইংরেজের শিষ্য ; লিখিয়াছিল ভাল। নগেন্দ্র তাহা মহামূল্য ফ্রেম দিয়া শয্যাগৃহে রাখিয়াছিলেন। একখানি চিত্র কুমারসম্ভব হইতে নীত। মহাদেব পর্ব্বতশিখরে বেদীর উপর বসিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। লতাগৃহদ্বারে নন্দী, বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্র—মুখে এক অঙ্গুলি দিয়া কাননশব্দ নিবারণ করিতেছেন। কানন স্থির—ভ্রমরেরা পাতার ভিতর লুকাইয়াছে—মৃগেরা শয়ন করিয়া আছে। সেইকালে হরধ্যানভঙ্গের জন্য মদনের অধিষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের উদয়। অগ্রে বসন্তপুষ্পাভরণময়ী পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। উমা যখন শম্ভুসম্মুখে প্রণাম জন্য নত হইতেছেন, এক জানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়াছেন, আর এক জানু দ্বারা ভূমিস্পর্শ করিতেছেন, স্কন্ধসহিত মস্তক নমিত হইয়াছে, সেই অবস্থা চিত্রে চিত্রিত। মস্তক নমিত হওয়াতে অলকবন্ধ হইতে দুই একটি কর্ণবিলম্বী কুরবককুসুম খসিয়া পড়িতেছে, বক্ষ হইতে বসন ঈষৎ স্রস্ত হইতেছে, দূর হইতে মন্মথ সেই সময়ে বসন্তপ্রফুল্ল বনমধ্যে অর্দ্ধ লুক্কায়িত হইয়া, এক জানু ভূমিতে রাখিয়া, পুষ্পধনুতে পুষ্পশর সংযোজিত করিতেছেন।

আর এক চিত্রে শ্রীরাম জানকীকে লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, উভয়ে এক রত্নমণ্ডিত বিমানে বসিয়া শূন্যমার্গে চলিতেছেন। শ্রীরাম জানকীর স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া, আর এক হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা নিম্নে পৃথিবীর শোভা দেখাইতেছেন। বিমান-চতুষ্পার্শ্বে নানাবর্ণের মেঘ নীল, লোহিত, শ্বেত, ধূমতরঙ্গোৎক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে আবার বিশাল নীলসমুদ্রে তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছে—সূর্য্যকরে তরঙ্গসকল হীরকরাশির মত জ্বলিতেছে। এক পারে অতি দূরে সৌধকিরীটিনী লঙ্কা—তাহার প্রাসাদাবলীর স্বর্ণমণ্ডিত চূড়াসকল সূর্য্যকরে জ্বলিতেছে। অপর পারে শ্যামশোভাময়ী তমালতালীবনরাজিনীলা সমুদ্রবেলা। মধ্যে শূন্যে হংসশ্রেণী উড়িয়া যাইতেছে।

আর এক চিত্রে অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে তুলিয়াছেন। রথ শূন্যপথে মেঘমধ্যে পথ করিয়া চলিয়াছে, পশ্চাৎ অগণিত যাদবী সেনা ধাবিত হইতেছে, দূরে তাহাদের পতাকাশ্রেণী এবং রজোজনিত মেঘ দেখা যাইতেছে। সুভদ্রা স্বয়ং সারথি হইয়া রথ চালাইতেছেন। অশ্বেরা মুখামুখি করিয়া পদক্ষেপে মেঘসকল চূর্ণ করিতেছে। সুভদ্রা আপন সারথ্যনৈপুণ্যে প্রীতা হইয়া মুখ ফিরাইয়া অর্জুনের প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কুন্দদন্তে আপন অধর দংশন করিয়া টিপি টিপি হাসিতেছেন; রথবেগজনিত পবনে তাঁহার অলকসকল উড়িতেছে—দুই-এক গুচ্ছ কেশ স্বেদবিজড়িত হইয়া কপালে চক্রাকারে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

আর একখানি চিত্রে সাগরিকাবেশে রত্নাবলী, পরিষ্কার নক্ষত্রালোকে বালতমালতলে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছেন। তমালশাখা হইতে একটি উজ্জ্বল পুষ্পময়ী লতা বিলম্বিত হইয়াছে, রত্নাবলী এক হস্তে সেই লতার অগ্রভাগ লইয়া গলদেশে পরাইতেছেন, আর এক হস্তে চোখের জল মুছিতেছেন। লতাপুষ্পসকল তাঁহার কেশদামের উপর অপূর্ব্ব শোভা করিয়া রহিয়াছে।

আর একখানি চিত্রে, শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখিবার জন্য চরণ হইতে কাল্পনিক কুশাঙ্কুর মুক্ত করিতেছেন—অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা হাসিতেছেন—শকুন্তলা ক্রোধে ও লজ্জায় মুখ তুলিতেছেন না—দুষ্মন্তের দিকেও চাহিতে পারিতেছেন না—যাইতেও পারিতেছেন না।

আর এক চিত্রে রণসজ্জিত হইয়া সিংহশাবকতুল্য প্রতাপশালী কুমার অভিমন্যু উত্তরার নিকট যুদ্ধযাত্রার জন্য বিদায় লইতেছেন—উত্তরা যুদ্ধে যাইতে দিবেন না বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইতেছেন। অভিমন্যু তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসিতেছেন, আর কেমন করিয়া অবলীলাক্রমে ব্যূহভেদ করিবেন, তাহা মাটীতে তরবারির অগ্রভাগের দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছেন। উত্তরা তাহা কিছুই দেখিতেছেন না; চক্ষে দুই হস্ত দিয়া কাঁদিতেছেন।

আর একখানি চিত্রে, সত্যভামার তুলাব্রত চিত্রিত হইয়াছে। বিস্তৃত প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাঙ্গণ, তাহার পাশে উচ্চসৌধপরিশোভিত রাজপুরী স্বর্ণচূড়ার সহিত দীপ্তি পাইতেছে। প্রাঙ্গণমধ্যে এক অত্যুচ্চ রজতনির্ম্মিত তুলাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। তাহার এক দিকে ভর করিয়া বিদ্যুদ্দীপ্ত

নীরদখণ্ডবৎ নানালঙ্কারভূষিত, প্রৌঢ়বয়স্ক দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন ; তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ ভূমিস্পর্শ করিতেছে ; আর এক দিকে নানারত্নাদির সহিত সুবর্ণরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ ঊর্দ্ধোত্থিত হইতেছে না। তুলাপাশে সত্যভামা ; সত্যভামা প্রৌঢ়বয়স্কা, সুন্দরী, উন্নতদেহবিশিষ্টা, পুষ্পকান্তিমতী, নানাভরণভূষিতা, পঙ্কজলোচনা ; কিন্তু তুলাযন্ত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে। তিনি অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া তুলায় ফেলিতেছেন, হস্তের চম্পকোপম অঙ্গুলির দ্বারা কর্ণবিলম্বী রত্নভূষা খুলিতেছেন, লজ্জায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতেছে, দুঃখে চক্ষে জল আসিতেছে। ক্রোধে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতেছে, অধর দংশন করিতেছেন। এই অবস্থায় চিত্রকর তাঁহাকে লিখিয়াছেন ; পশ্চাতে দাঁড়াইয়া স্বর্ণপ্রতিমারূপিণী রুক্মিণী দেখিতেছেন। তাঁহারও মুখ বিমর্ষ। তিনিও আপনার অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া সত্যভামাকে দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ; তিনি স্বামীর প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া, ঈষন্মাত্র অধরপ্রান্তে হাসি হাসিতেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই হাসিতে সপত্নীর আনন্দ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ গম্ভীর, স্থির, যেন কিছুই জানেন না ; কিন্তু তিনি অপাঙ্গে রুক্মিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সে কটাক্ষেও একটু হাসি আছে। মধ্যে শুভ্রবসন, শুভ্রকান্তি দেবর্ষি নারদ ; তিনি বড় আনন্দিতের ন্যায় সকল দেখিতেছেন, বাতাসে তাঁহার উত্তরীয় এবং শ্মশ্রু উড়িতেছে। চারিদিকে বহুসংখ্যক পৌরবর্গ নানাপ্রকার বেশভূষা ধারণ করিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে। বহুসংখ্যক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আসিয়াছে। কত কত পুররক্ষিগণ গোল থামাইতেছে। এই চিত্রের নীচে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন,—"যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। স্বামীর সঙ্গে সোণা-রূপার তুলা ?"

নগেন্দ্র যখন কক্ষমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। রাত্রি অতি ভয়ানক। সন্ধ্যার পর হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল এবং বাতাস উঠিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হইতেছিল, বায়ু প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিয়াছিল। গৃহের কবাট যেখানে যেখানে মুক্ত ছিল, সেইখানে সেইখানে বজ্রতুল্য শব্দে তাহার প্রতিঘাত হইতেছিল। সার্সীসকল ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে শব্দিত হইতেছিল। নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন বাত্যানিনাদ মন্দীভূত হইল। খাটের পার্শ্বে আর

একটি দ্বার খোলা ছিল—সে দ্বার দিয়া বাতাস আসিতেছিল না, সে দ্বার মুক্ত রহিল।

নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, একখানি সোফার উপর শয়ন করিলেন। নগেন্দ্র তাহাতে বসিয়া কত যে কাঁদিলেন, তাহা কেহ জানিল না। কতবার সূর্য্যমুখীর সঙ্গে মুখামুখি করিয়া সেই সোফার উপর বসিয়া কত সুখের কথা বলিয়াছেন।

নগেন্দ্র ভূয়োভূয়ঃ সেই অচেতন আসনকে চুম্বনালিঙ্গন করিলেন। আবার মুখ তুলিয়া সূর্য্যমুখীর প্রিয় চিত্রগুলির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। গৃহে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল—তাহার চঞ্চল রশ্মিতে সেই সকল চিত্রপুত্তলি সজীব দেখাইতেছিল। প্রতিচিত্রে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে পড়িল যে, উমার কুসুমসজ্জা দেখিয়া সূর্য্যমুখী এক দিন আপনি ফুল পরিতে সাধ করিয়াছিলেন। তাহাতে নগেন্দ্র আপনি উদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া স্বহস্তে সূর্য্যমুখীকে কুসুমময়ী সাজাইয়াছিলেন, তাহাতে সূর্য্যমুখী যে কত সুখী হইয়াছিলেন—কোন্ রমণী রত্নময়ী সাজিয়া তত সুখী হয়?

আর এক দিন সুভদ্রার সারথ্য দেখিয়া সূর্য্যমুখী গাড়ী হাঁকাইবার সাধ করিয়াছিলেন। পত্নীবৎসল নগেন্দ্র তখনই একখানি ক্ষুদ্র যানে দুইটি ছোট ছোট বর্ম্মা জুড়িয়া অন্তঃপুরের উদ্যানমধ্যে সূর্য্যমুখীর সারথ্যজন্য আনিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। সূর্য্যমুখী বল্গা ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল। দেখিয়া সূর্য্যমুখী সুভদ্রার মত নগেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া দংশিতাধরে টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন। এই অবকাশে অশ্বেরা ফটক নিকটে দেখিয়া একেবারে গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। তখন সূর্য্যমুখী লোকলজ্জায় ম্রিয়মাণা হইয়া ঘোমটা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া নগেন্দ্র নিজহস্তে বল্গা ধারণ করিয়া গাড়ী অন্তঃপুরে ফিরাইয়া আনিলেন এবং উভয়ে অবতরণ করিয়া কত হাসি হাসিলেন। শয্যাগৃহে আসিয়া সূর্য্যমুখী সুভদ্রার চিত্রকে একটি কিল দেখাইয়া বলিলেন, "তুই সর্ব্বনাশীই ত যত আপদের গোড়া।" নগেন্দ্র ইহা মনে করিয়া কত কাঁদিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান করিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দিকে চাহেন—সেই দিকেই সূর্য্যমুখীর চিহ্ন। দেওয়ালে চিত্রকর যে লতা লিখিয়াছিল—সূর্য্যমুখী তাহার অনুকরণমানসে

একটি লতা লিখিয়াছিলেন। তাহা তেমনি বিদ্যমান রহিয়াছে। এক দিন দোলে সূর্য্যমুখী স্বামীকে কুঙ্কুম ফেলিয়া মারিয়াছিলেন—কুঙ্কুম নগেন্দ্রের গায়ে না লাগিয়া দেওয়ালে লাগিয়াছিল। আজিও আবীরের চিহ্ন রহিয়াছে। গৃহ প্রস্তুত হইলে সূর্য্যমুখী একস্থানে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

"১৯১০ সংবৎসরে
ইষ্টদেবতা স্বামীর স্থাপনা জন্য
তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক
এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল।"

নগেন্দ্র ইহা পড়িলেন। নগেন্দ্র কতবার পড়িলেন—পড়িয়া আকাঙ্ক্ষা পূরে না—চক্ষের জলে দৃষ্টি পুনঃপুনঃ লোপ পাইতে লাগিল—চক্ষু মুছিয়া মুছিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে দেখিলেন, ক্রমে আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন, দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। তখন নগেন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন। শয্যায় উপবেশন করিবামাত্র অকস্মাৎ প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইয়া ঝটিকা ধাবিত হইল; চারিদিকে কবাটতাড়নের শব্দ হইতে লাগিল। সেই সময়ে, শূন্যতৈল দীপ নির্ব্বাণপ্রায় হইল—অল্পমাত্র খদ্যোতের ন্যায় আলো রহিল। সেই অন্ধকারতুল্য আলোতে এক অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিল। ঝঞ্ঝাবাতের শব্দে চমকিত হইয়া, খাটের পাশে যে দ্বার মুক্ত ছিল, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সেই মুক্তদ্বারপথে, ক্ষীণালোকে এক ছায়াতুল্য মূর্ত্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রীরূপিণী, কিন্তু আরও যাহা দেখিলেন, তাহাতে নগেন্দ্রের শরীর কণ্টকিত এবং হস্তপদাদি কম্পিত হইল। স্ত্রীরূপিণী মূর্ত্তি সূর্য্যমুখীর অবয়ববিশিষ্টা। নগেন্দ্র যেমন চিনিলেন যে, এ সূর্য্যমুখীর ছায়া—অমনি পর্য্যঙ্ক হইতে ভূতলে পড়িয়া ছায়াপ্রতি ধাবমান হইতে গেলেন। ছায়া অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে আলো নিবিল। তখন নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ললিতগিরি

এক পারে উদয়গিরি, অপর পারে ললিতগিরি, মধ্যে স্বচ্ছসলিলা কল্লোলিনী বিরূপা নদী নীল বারিরাশি লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। গিরিশিখরদ্বয়ে আরোহণ করিলে নিম্নে সহস্র সহস্র তালবৃক্ষশোভিত, ধান্য বা হরিৎক্ষেত্রে চিত্রিত পৃথিবী অতিশয় মনোমোহিনী দেখা যায়—শিশু যেমন মা'র কোলে উঠিলে মা'কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখে, মনুষ্য পর্ব্বতারোহণ করিয়া পৃথিবী-দর্শন করিলে সেইরূপ দেখে। উদয়গিরি বর্ত্তমান আলুতিগিরি, বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি বর্ত্তমান নালুতিগিরি, বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকা, স্তূপ এবং বৌদ্ধমন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ, আর মৃত্তিকাপ্রোথিত ভগ্নগৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তর-গঠিত মূর্ত্তিরাশি। তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত! হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুলে পুতুল-গড়া শিখিতে হয়। কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না।

আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সে ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। চারিদিকে—যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া—হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র, মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহু-যোজন-বিস্তৃত পীতাম্বরী শাটী। তাহার উপর মাতার অলঙ্কার-স্বরূপ তালবৃক্ষ-শ্রেণী—সহস্র সহস্র, তারপর সহস্র সহস্র তালবৃক্ষ, সরল, সুপত্র, শোভাময়! মধ্যে নীলসলিলা বিরূপা, নীল-পীত-পুষ্পময় হরিৎক্ষেত্রমধ্য দিয়া বহিতেছে—সুকোমল গালিচার উপর কে নদী আঁকিয়া দিয়াছে। চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনাবন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তিসকল যে ক্ষোদিয়াছিল,—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরগঠন,

পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা চীনাম্বরা, তরলিতরত্নহারা পীবরযৌবনভারাবনতদেহা—

'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ'—

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকল হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন্ ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দু-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।

সেই ললিতগিরির পদতলে বিরূপা-তীরে গিরির শরীরমধ্যে হস্তিগুম্ফা নামে এক গুহা ছিল। গুহা বলিয়া, আবার ছিল বলিতেছি কেন? পর্ব্বতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি আবার লোপ পায়? কাল বিগুণ হইলে সবই লোপ পায়। গুহাও আর নাই। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, স্তম্ভসকল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—তলদেশে ঘাস গজাইতেছে। সর্ব্বস্বই লোপ পাইয়াছে, গুহাটার জন্য দুঃখে কাজ কি?

কিন্তু গুহা বড় সুন্দর ছিল। পর্ব্বতাঙ্গ হইতে ক্ষোদিত স্তম্ভ, প্রাকার প্রভৃতি বড় রমণীয় ছিল। চারিদিকে অপূর্ব্ব প্রস্তরে ক্ষোদিত নরমূর্ত্তিসকল শোভা করিত। তাহারই দুই চারিটি আজিও আছে। কিন্তু ছাতা পড়িয়াছে। রঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছে, কাহারও নাক ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও হাত ভাঙ্গিয়াছে, কাহারও পা ভাঙ্গিয়াছে। পুতুলগুলাও আধুনিক হিন্দুর মত অঙ্গহীন হইয়াছে।

কিন্তু গুহার এ দশা আজকাল হইয়াছে। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন এমন ছিল না—গুহা সম্পূর্ণ ছিল। তাহার ভিতর পরম যোগী মহাত্মা গঙ্গাধর স্বামী বাস করিতেন।

যথাকালে সন্ন্যাসিনী শ্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, গঙ্গাধর স্বামী তখন ধ্যানে নিমগ্ন। অতএব কিছু না বলিয়া তাঁহারা সে রাত্রি গুহাপ্রান্তে শয়ন করিয়া যাপন করিলেন।

প্রত্যুষে ধ্যানভঙ্গ হইলে স্বামী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বিরূপায় স্নান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন। পরে তিনি প্রত্যাগত হইলে সন্ন্যাসিনী প্রণতা হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল, শ্রীও তাহাই করিল।

গঙ্গাধর স্বামী শ্রীর সঙ্গে তখনও কোন কথা কহিলেন না। তিনি কেবল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্য,—সকল কথাই সংস্কৃত ভাষায় হইল। শ্রী তাহার এক বর্ণ বুঝিল না। যে কয়টা কথা পাঠকের জানিবার প্রয়োজন, বাঙ্গালায় বলিতেছি।

স্বামী। এ স্ত্রী কে?

সন্ন্যা। পথিক।

স্বামী। এখানে কেন?

সন্ন্যা। ভবিষ্যৎ লইয়া গোলে পড়িয়াছে। আপনাকে কর দেখাইবার জন্য আসিয়াছে। উহার প্রতি ধর্ম্মানুমত আদেশ করুন।

শ্রী তখন নিকটে আসিয়া আবার প্রণাম করিল। স্বামী তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া হিন্দিতে বলিলেন, "তোমার কর্কট রাশি।"

শ্রী নীরব।

"তোমার পুষ্যা-নক্ষত্রস্থিত চন্দ্রে জন্ম।"

শ্রী নীরব।

"গুহার বাহিরে আইস—হাত দেখিব।"

তখন শ্রীকে বাহিরে আনিয়া তাহার বামহস্তের রেখাসকল স্বামী নিরীক্ষণ করিলেন। খড়ি পাতিয়া জন্মশক, দিন, বার, তিথি, দণ্ড, পল সকল নিরূপণ করিলেন। পরে জন্মকুণ্ডলী অঙ্কিত করিয়া, গুহাস্থিত তালপত্র-লিখিত প্রাচীন পঞ্জিকা দেখিয়া, দ্বাদশভাগে গ্রহগণের যথাযথ সমাবেশ করিলেন, পরে শ্রীকে বলিলেন, "তোমার লগ্নে স্বক্ষেত্রস্থ পূর্ণচন্দ্র এবং সপ্তমে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র তিনটি শুভগ্রহ আছেন। তুমি সন্ন্যাসিনী কেন মা? তুমি যে রাজমহিষী।"

শ্রী। শুনিয়াছি, আমার স্বামী রাজা হইয়াছেন। আমি তাহা দেখি নাই।

স্বামী। তুমি তাহা দেখিবে না বটে। এই সপ্তমস্থ বৃহস্পতি নীচস্থ এবং শুভগ্রহত্রয় পাপগ্রহের ক্ষেত্রে পাপদৃষ্ট হইয়াছেন। তোমার অদৃষ্টে রাজ্যভোগ নাই।

শ্রী তাহা কিছুই বুঝে না, চুপ করিয়া রহিল। আরও একটু দেখিয়া স্বামীকে বলিল, "আর কিছু দুর্ভাগ্য দেখিতেছেন?"

স্বামী। চন্দ্র শনির ত্রিংশাংশগত।

শ্রী। তাহাতে কি হয়?

স্বামী। তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রাণহন্ত্রী হইবে।

শ্রী আর বসিল না—উঠিয়া চলিল। স্বামী তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ফিরাইলেন। বলিলেন, "তিষ্ঠ। তোমার অদৃষ্টে এক পরম পুণ্য আছে। তাহার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে স্বামি-সন্দর্শনে গমন করিও।"

শ্রী। কবে সে সময় উপস্থিত হইবে?

স্বামী। এখন তাহা বলিতে পারিতেছি না। অনেক গণনার প্রয়োজন। সে সময়ও নিকট নহে। তুমি কোথা যাইতেছ?

শ্রী। পুরুষোত্তমদর্শনে যাইব, মনে করিয়াছি।

স্বামী। যাও। সময়ান্তরে আগামী বৎসরে তুমি আমার নিকটে আসিও। সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিব।

তখন স্বামী সন্ন্যাসিনীকেও বলিলেন, "তুমিও আসিও।"

তখন গঙ্গাধর স্বামী বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। সন্ন্যাসিনী-দ্বয় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইল।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাবু

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে, আপনি কহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে একপ্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য্য করিবেন, তাহা শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরবর! আমি সেই বিচিত্রবুদ্ধি, আহারনিদ্রা-কুশল বাবুগণকে আখ্যাত করিব, আপনি শ্রবণ করুন। আমি সেই চশমা-অলঙ্কৃত, উদারচরিত্র, বহুভাষী, সন্দেশপ্রিয় বাবুদিগের চরিত্র কীর্ত্তিত করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। হে রাজন্, যাঁহারা চিত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিতকুন্তল এবং মহাপাদুক, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পর-ভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষাবিরোধী, তাঁহারাই বাবু। মহারাজ! এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন। যাঁহাদিগের দর্শেন্দ্রিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপরিশুদ্ধ, যাঁহাদিগের কেবল রসনেন্দ্রিয় পরজাতিনিষ্ঠীবনে পবিত্র, তাঁহারাই বাবু। যাঁহাদিগের চরণ মাংসাস্থিবিহীন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম ; হস্ত দুর্ব্বল হইলেও লেখনীধারণে এবং বেতনগ্রহণে সুপটু ; চর্ম্ম কোমল হইলেও সাগরপারনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষের প্রহারসহিষ্ণু ; যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়মাত্রেরই ঐরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাঁহারাই বাবু। যাঁহারা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জন করিবেন, উপার্জনের জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু।

মহারাজ! বাবু শব্দ নানার্থক হইবে। যাঁহারা কলিযুগে ভারতবর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট "বাবু" অর্থে কেরাণী বা বাজার-সরকার বুঝাইবে। নির্ধনদিগের নিকট "বাবু" শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক, কেবল বাবুজন্মনির্ব্বাহা-ভিলাষী কতকগুলি মনুষ্য জন্মিবেন। আমি কেবল তাঁহাদিগেরই গুণকীর্ত্তন করিতেছি। যিনি বিপরীতার্থ করিবেন তাঁহার এই মহাভারত শ্রবণ নিষ্ফল হইবে। তিনি গোজন্ম গ্রহণ করিয়া বাবুদিগের ভক্ষ্য হইবেন।

হে নরাধিপ! বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ করিবেন, স্ফাটিক পাত্র ইঁহাদিগের গণ্ডূষ। অগ্নি ইঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন—"তামাকু" এবং "চুরট" নামক দুইটি অভিনব খাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া রাত্রিদিন ইঁহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকিবেন। ইঁহাদিগের যেমন মুখে অগ্নি, তেমনি জঠরেও অগ্নি জ্বলিবে এবং রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ইঁহাদিগের রথস্থ যুগল প্রদীপে জ্বলিবেন। বায়ুকেই ইঁহারা ভক্ষণ করিবেন—ভদ্রতা করিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ কার্য্যের নাম রাখিবেন "বায়ুসেবন"। সূর্য্য ইঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন না। যম ইঁহাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন। কেবল অশ্বিনী-কুমারদিগকে ইঁহারা পূজা করিবেন। অশ্বিনীকুমারদিগের মন্দিরের নাম হইবে "আস্তাবল"।

হে নরশ্রেষ্ঠ! যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধকোকিলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু। যিনি কাব্যের কিছুই বুঝিবেন না, অথচ কাব্যপাঠে এবং সমালোচনায় প্রবৃত্ত, যিনি আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া জানিবেন তিনিই বাবু। যিনি রূপে কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গুণ পদার্থ, কর্ম্মে জড়ভরত, এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বাবু। যিনি উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন এবং পাঁটার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন, তিনিই বাবু। যাঁহার পান দ্রাক্ষারস, এবং আহার কদলীদগ্ধ, তিনিই বাবু। হে কুরুকুলভূষণ! বিষ্ণুর সহিত এই বাবুদিগের বিশেষ সাদৃশ্য হইবে। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদের লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ই থাকিবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহারাও অনন্তশয্যাশায়ী হইবেন। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদেরও দশ অবতার—যথা কেরাণী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকীল, হাকিম, জমীদার, সংবাদপত্রসেবক এবং নিষ্কর্ম্মা। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহারা সকল অবতারেই অমিত-বলপরাক্রম অসুরগণকে বধ করিবেন। কেরাণী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী; মাষ্টার অবতারে বধ্য ছাত্র; ষ্টেশনমাষ্টার অবতারে বধ্য টিকেটহীন পথিক; ব্রাহ্মাবতারে বধ্য চালকলাপ্রত্যাশী পুরোহিত; মুৎসুদ্দী অবতারে বধ্য বণিক্ ইংরাজ; ডাক্তার অবতারে বধ্য রোগী; উকীল অবতারে বধ্য মক্কেল; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী; জমীদার অবতারে বধ্য প্রজা; সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্ম্মাবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।

মহারাজ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ, এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র, এবং তীর্থ "ন্যাশনেল থিয়েটার", তিনিই বাবু। যিনি মিশনরির নিকট খ্রীষ্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং কথোপকথনকালে মাতৃ-ভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে এবং রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহ তিনিই বাবু।

হে নরনাথ! আমি যাঁহাদিগের কথা বলিলাম, তাঁহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস জন্মিবে যে, আমরা তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া, উপাধান অবলম্বন করিয়া, দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া, এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।

জনমেজয় কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! বাবুদিগের জয় হউক. আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিড়াল

(শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর উক্তি)

আমি শয়ন-গৃহে চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা-হাতে ঝিমাইতে ছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে—দেওয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই—এ জন্য হুঁকা-হাতে,

নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না? এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, 'মেও'।

চাহিয়া দেখিলাম—হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার নিকট আফিঙ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে পাষাণবৎ কঠিন হইয়া বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, 'মেও'।

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে, একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার। প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে,—আমি ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ-রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই : এক্ষণে মার্জ্জার-সুন্দরী নির্জ্জল দুগ্ধ-পানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, 'মেও'। বলিতে পারি না, বুঝি তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল ; বুঝি মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল সেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে 'মেও' শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় করিয়াছিল! বুঝি বিড়ালের মনের ভাব—'তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি, এখন বল কি?' বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না, দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই ; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়াল দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার-স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতি-মণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতর চিত্তে হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারীর প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত। সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না ; কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া

একটু সরিয়া বসিল। বলিল, 'মেও'। প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া মার্জারীর বক্তব্য-সকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া, হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি। এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে, আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়-সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটা বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহৃত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল—অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী—আমি চুরিই করি আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্ম-সঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ-ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী।

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত নর্দ্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে? হায়!

দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখনও অন্ধকে মুষ্টিভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না—সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোট-লোকের দুঃখে কাতর? ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড় হাত করিয়া বলিতে, 'আর একটু কি আনিয়া দিব?' তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি বড় পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তাহাতো নয়—তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ—দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর—আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর—ছি! ছি!

"দেখ, আমাদের দশা দেখ। দেখ, প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি—কেহ আমাদের মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল—গৃহ-মার্জার হইয়া মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলোয়াড়ের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল—তবেই তাহার পুষ্টি।

"আর আমাদিগের দশা দেখ—আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে—জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে—অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, মেও! মেও! খাইতে পাই না। আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না। এ পৃথিবীর মৎস্য-মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও—নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার-সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া এক জনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাওয়ার পর যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে

দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে ; কেন-না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম! মার্জার-পণ্ডিতে! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক, সমাজ-বিশৃঙ্খলার মূল। যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধন সঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধন-সঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজে ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জারী বলিল, "না হইল ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের ক্ষতি কি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।

বিড়াল রাগ করিয়া বলিল, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝানো দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্‌কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন ; অতএব চোরের দণ্ড-বিধান কর্ত্তব্য।"

মার্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে কাহারও ভাণ্ডার-ঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করিব না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জারীকে বলিলাম, "এ সকল

অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। মন হইতে এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর। প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে। জলযোগের সময় আসিও, উভয়ে ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না ; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভর আফিঙ দিব।"

মার্জার বলিল, "আফিঙের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জার বিদায় হইল।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অনুকরণ

নব্য বাঙ্গালীর অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে অনুকরণানুরাগ সর্ব্ববাদিসম্মত। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, সকলেই ইহার জন্য বাঙ্গালী জাতিকে অহরহঃ তিরস্কার করিতেছেন।

অনুকরণমাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম-শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানুসরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্য্যসকল দেখিয়া কার্য্য করিতে শিখে, অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিত জাতির অনুকরণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। সত্য বটে, আদিম সভ্য জাতি বিনা অনুকরণে স্বতঃশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিল, প্রাচীন ভারতীয় ও মিসরীয় সভ্যতা কাহারও অনুকরণলব্ধ নহে। কিন্তু যে আধুনিক

ইউরোপীয় সভ্যতা সর্ব্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? তাহাও রোমক ও য়ুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও য়ুনানী সভ্যতার অনুকরণফল। যে পরিমাণে বাঙ্গালী ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃত্তজ্ঞ জানেন যে, ইউরোপীয়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্পপরিমাণে য়ুনানীয়ের—বিশেষতঃ রোমকের অনুকরণ করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চ সোপানে দাঁড়াইয়াছেন। শৈশবে পরের হাত ধরিয়া যে জলে নামিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই সাঁতার দিতে শিখে নাই। কেন-না, ইহজন্মে তাহার জলে নামাই হইত না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালীর ভরসা।

তবে লোকের বিশ্বাস এই যে, অনুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ-প্রাপ্তি হয় না। কিসে জানিলে?

প্রথম সাহিত্যসম্বন্ধে দেখ, পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য কেবল অনুকরণমাত্র। ড্রাইডেন ও বোয়ালোর অনুকারী পোপ, পোপের অনুকারী জন্‌সন্। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথা সপ্রমাণ করিতে চাহি না। বর্জিলের মহাকাব্য হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ। সমুদায় রোমক-সাহিত্য য়ুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমক-সাহিত্য বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণমাত্র। কিন্তু বিদেশীয় উদাহরণ দূরে থাকুক, আমাদিগের স্বদেশে দুইখানি মহাকাব্য আছে—তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থে ইতিহাস বলে—তাহা পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য। একখানি আর একখানির অনুকরণ।

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা হুইলর সাহেব ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবেন না। অন্যান্য অনুকৃত এবং অনুকরণের নায়কসকলে যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধিষ্ঠিরে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে। রামায়ণে অমিতবলধারী, বীর, জিতেন্দ্রিয়, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ মহাভারতে অর্জুনে পরিণত হইয়াছেন এবং ভরত-শত্রুঘ্ন নকুল-সহদেব হইয়াছেন। ভীম নূতন সৃষ্টি, তবে কুম্ভকর্ণের একটু ছায়ায় দাঁড়াইয়াছেন। রামায়ণের রাবণ, মহাভারতের দুর্য্যোধন;

রামায়ণের বিভীষণ, মহাভারতের বিদুর ; অভিমন্যু ইন্দ্রজিতের অস্থিমজ্জা লইয়া গঠিত হইয়াছে ; এ দিকে রাম ভ্রাতা ও পত্নীসহিত বনবাসী, যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতা ও পত্নীসহিত বনবাসী। উভয়েই রাজ্যচ্যুত ; একজনের পত্নী অপহৃতা, আর একজনের পত্নী সভামধ্যে অপমানিতা ; উভয় মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে সেই অগ্নি জ্বলন্ত, একে স্পষ্টতঃ, অপরে অস্পষ্টতঃ। উভয় কাব্যের উপন্যাসভাগ এই যে, যুবরাজ রাজ্যচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্নীসহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমর-বিজয়ী হইয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে স্থাপিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতেও সেই সাদৃশ্য আছে ; কুশীলবের পালা মণিপুরে বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে ; মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গ, পাঞ্চালে মৎস্য-বিন্ধনে পরিণত হইয়াছে ; দশরথকৃত পাপে পাণ্ডুকৃত পাপে বিলক্ষণ ঐক্য আছে। মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ বলিতে ইচ্ছা না হয়, না বলুন, কিন্তু অনুকরণীয় এবং অনুকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি বিরল। কিন্তু মহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অন্যত্র অতুল—একা রামায়ণই তাহার তুলনীয়। অতএব অনুকরণমাত্র হেয় নহে।

পরে সমাজসম্বন্ধে দেখ। যখন রোমকেরা য়ুনানীয় সভ্যতার পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহারা কায়মনোবাক্যে য়ুনানীদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফল কিকিরোর বাগ্মিতা, তাসিতসের ইতিবৃত্তগ্রন্থ, বর্জিলের মহাকাব্য, প্লুতস ও টেরেন্সের নাটক, হোরেস্ ও ওবিদের গীতিকাব্য, পেপিনিয়নাসের ব্যবস্থা, সেনেকার ধর্ম্মনীতি, আন্তনৈনদিগের রাজধর্ম্ম, লুকালসের ভোগাসক্তি, জনসাধারণের ঐশ্বর্য্য এবং সম্রাট্গণের স্থপত্য-কীর্ত্তি। আধুনিক ইউরোপীয়দিগের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে : ইতালীয় ও ফরাসী-সাহিত্য,—গ্রীক ও রোমীয় সাহিত্যের অনুকরণ ; ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্র- রোমক ব্যবস্থাশাস্ত্রের অনুকরণ। ইউরোপীয় শাসনপ্রণালী—রোমীয়দের অনুকরণ ; কোথাও সেই এম্পিথিয়েটর, কোথাও সেই সেনেট, কোথাও সেই প্লেবের শ্রেণী, কোথাও ফোরম, কোথাও সেই মিউনিসিপিয়ম। আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যাও য়ুনানী ও রোমকমূলবিশিষ্ট। এই সকলই প্রথমে অনুকরণমাত্রই ছিল, এক্ষণে অনুকরণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে। প্রতিভা থাকিলে এরূপ ঘটে, প্রথম অনুকরণমাত্র হয়, পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিশু প্রথমে লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়—

পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয় এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে।

তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে, যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চিরকালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কখনও দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। ইউরোপীয় জাতিমাত্রেরই নাটক আদৌ য়ুনানী নাটকের অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—ইংলণ্ড এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এ দিকে এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক-শক্তিশূন্য রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসী এবং জার্ম্মাণীয়গণ অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন যে, শেষোক্ত জাতিসকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অনুৎকর্ষ তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষার ফল। এটি ভ্রম। ইহা নৈসর্গিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল। অনুচিকীর্ষাও সেই অপ্রতুলের ফল। অনুচিকীর্ষাও কার্য্য, কারণ নহে।

অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজিকালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি। অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই ; একে মন্দ, তাহাতে অনুকরণ। নচেৎ অনুকরণ-মাত্র ঘৃণ্য নহে। বরং এরূপ অনুকরণই স্বভাবসিদ্ধ। ইহাতে যে বাঙ্গালীর স্বভাবের কিছু বিশেষ দোষ আছে, এমন বোধ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দোষ বা গুণ। যখন উৎকৃষ্টে এবং অপকৃষ্টে একত্র হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাবতঃ উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি? উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে। বাঙ্গালী দেখে, ইংরেজ সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, ঐশ্বর্য্যে, সুখে, সর্ব্বাংশে বাঙ্গালী হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালী কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে? কিন্তু কি প্রকারে সেরূপ হইবে? বাঙ্গালী মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে, সেইরূপ সেইরূপ করিলে ইংরেজের মত সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সুখী হইবে। অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, ঐ অবস্থাপন্ন হইলে ঐরূপ করিত। বাঙ্গালীর স্বভাবের দোষে এ অনুকরণ-প্রবৃত্তি নহে। আর্য্যশোণিত তাহাদের শরীরে অদ্যাপি বহিতেছে ; বাঙ্গালী কখনই বানরের ন্যায় কেবল অনুকরণের জন্যই অনুকরণপ্রিয় হইতে পারে না। এ অনুকরণ স্বাভাবিক এবং পরিণামে মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে। যাঁহারা আমাদিগের কৃত ইংরেজের আহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া রাগ করেন,

তাঁহারা ইংরেজকৃত ফরাসীদের আহার-পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া কি বলিবেন? এ বিষয়ে বাঙ্গালীর অপেক্ষা ইংরেজেরা অল্পাংশে অনুকারী? আমরা অনুকরণ করি জাতীয় প্রভুর; ইংরেজেরা অনুকরণ করেন—কাহার?

ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, বাঙ্গালী যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য এবং তাহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহাদুঃখ। বাঙ্গালী গুণের অনুকরণে তত পটু নহে; দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। এই জন্যই আমরা বাঙ্গালীর অনুকরণপ্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি।

যেখানে অনুকারী প্রতিভাশালী, সেখানেও অনুকরণের দুইটি দোষ আছে। একটি বৈচিত্র্যের বিঘ্ন। এ সংসারে একটি প্রধান সুখ বৈচিত্র্যঘটিত। জগতীতলস্থ সর্ব্বপদার্থ যদি একবর্ণের হইত, তবে জগৎ কি এত সুখদৃশ্য হইত? সকল শব্দ যদি একপ্রকার হইত—মনে কর, কোকিলের স্বরের ন্যায় রব ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন প্রকার শব্দ না থাকিত, তবে কি সে শব্দ সকলের কর্ণ-জ্বালাকর হইত না? আমরা সেরূপ স্বভাব পাইলে না হইতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে আমরা যে প্রকৃতি লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্র্যই সুখ। অনুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। ম্যাক্‌বেথ উৎকৃষ্ট নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক ম্যাক্‌বেথের অনুকরণে লিখিত হইলে নাটকে আর কি সুখ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত?

দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই যত্নপৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভাবনা। কিন্তু পরবর্ত্তী কার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের অনুকরণমাত্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নূতন পথে যায় না; সুতরাং কার্য্যের উন্নতি ঘটে না। তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কি সামাজিক কার্য্য, কি মানসিক অভ্যাস সকল সম্বন্ধেই সত্য।

মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসকলেরই সামকালিক যথোচিত স্ফূর্ত্তি এবং উন্নতি মনুষ্যদেহধারণের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে যাহাতে কতকগুলির অধিকতর পরিপুষ্টি এবং কতকগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে, তাহা

মনুষ্যের অনিষ্টকর। মনুষ্য অনেক এবং একজন মনুষ্যের সুখও বহুবিধ। তত্তাবৎ সাধনের জন্য বহুবিধ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্য্যের আবশ্যকতা। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের দ্বারা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না। এক শ্রেণীর চরিত্রের লোকের দ্বারা বহু প্রকারের কার্য্য সাধিত হইতে পারে না, অতএব সংসারে চরিত্র-বৈচিত্র্য, কার্য্য-বৈচিত্র্য এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই। অনুকরণপ্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে যে, অনুকারীর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্তি এবং তাহার কার্য্য অনুকরণীয়ের ন্যায় হয়, পথান্তরে গমন করিতে পারে না। যখন সমাজস্থ সকলেই বা অধিকাংশ লোকে বা কার্য্যক্ষম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ একই আদর্শের অনুকারী হয়েন, তখন এই বৈচিত্র্য-হানি অতি গুরুতর হইয়া উঠে। মনুষ্য-চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি ঘটে না, সর্ব্বপ্রকারের মনোবৃত্তিসকলের মধ্যে যথোচিত সামঞ্জস্য থাকে না, মনুষ্যের কপালে সকলপ্রকার সুখ ঘটে না—মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে ; সমাজ অসম্পূর্ণ থাকে, মনুষ্য-জীবন অসম্পূর্ণ থাকে।

আমরা যে কয়েকটি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত তত্ত্বসকলের উপলব্ধি হইতে পারে--

১। সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার, কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন কোন সমাজ অন্য সমাজ হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকালসাপেক্ষ, দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়।

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্যজাতি সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুত গতিতে আসিতে থাকে। সে স্থলে সামাজিক গতি এইরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণপ্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালীর চরিত্রদোষজনিত নহে।

৪। অনুকরণমাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে ; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নয়, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না, ইহাতে ভরসার স্থলও আছে।

৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুকরণপ্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণপ্রবৃত্তি অব্যবহিতরূপে স্ফূর্ত্তি পাইলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাম্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সরাজ্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনীয় নহে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে তাহার বর্ণনার স্থান নাই, প্রয়োজনও নাই। জগদ্বিখ্যাত, বাক্যবিশারদ, পুরাবৃত্তজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী বহুসংখ্যক লেখক তাহার পুঞ্জপুঞ্জ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সকল বর্ণনা সকলেরই অনায়াসপাঠ্য। দুই একটা বলিলেই আমাদিগের উদ্দেশ্যসাধন হইবে।

কারলাইল ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যে আইন অনুসারে একজন ভূম্যধিকারী মৃগয়া হইতে আসিয়া দুইজন দাস বধ করিয়া তাহাদিগের রক্তে পদপ্রক্ষালন করিতে পারিতেন, সে আইন ইদানীং আর প্রচলিত ছিল না।" ইদানীং প্রচলিত ছিল না! তবে পূর্ব্বে ছিল! "পঞ্চাশ বৎসরমধ্যে শারলোয়ার ন্যায় কোন ব্যক্তি স্থপতিদিগকে গুলী করিয়া, তাহারা কি প্রকারে ছাদের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে, দেখিয়া আনন্দলাভ করে নাই।"

সেরাজউদ্দৌলা দেশের অধিপতি ছিলেন, শারলোয়া উচ্চশ্রেণীর প্রজামাত্র।

এই ব্যঙ্গোক্তিতেই তাৎকালিক ফরাসীদিগের মধ্যে কি অচিন্তনীয় বৈষম্য জন্মিয়াছিল, তাহা বুঝা যাইবে। পঞ্চদশ লুই প্রমোদানুরক্ত, বৃথাভোগাসক্ত, ব্যয়শৌণ্ড, স্বার্থপর রাজা ছিলেন।

তাঁহার উপপত্নীগণের পরিতুষ্টির জন্য অনন্ত ধনরাশির আবশ্যক। মাদাম পোম্পাদুর ও মাদাম দুবারি যে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা পরিণীতা রাজমহিষীর নিষ্কলঙ্ক কপালেও ঘটে না। মাদাম দুবারির একটি বানরবৎ কাফ্রি খানসামা ছিল। সে এক স্থানের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হইয়াছিল,—মাদামের আজ্ঞা! লুইর বিলাসভবনের বর্ণনা শুনিলে ইন্দ্রপ্রস্থের দৈবশক্তি-নির্ম্মিতা পাণ্ডবীয়া পুরীর সঙ্গে তুলনা করা যায়,—সেই সকল প্রমোদমন্দিরে যে উৎসব হইত, কিসের সঙ্গে তার তুলনা করিব? জলবৎ অর্থব্যয়,—এ দিকে রাজকোষ শূন্য! রাজকোষ শূন্য এবং প্রজাবর্গমধ্যে অন্নাভাবে হাহাকার রব আকাশমধ্যে উঠিতেছিল। তবে এ সভাপর্ব্বের রাজসূয়, এ নন্দনকাননে ঐন্দ্রবিলাস,—এ সকল অর্থসাধ্য ব্যাপার সম্পন্ন হয় কোথা হইতে? সেই অন্নাভাব-পীড়িত প্রজার জীবনোপায় অপহরণ করিয়া। পিষ্টকে পেষণ করিয়া—শুষ্ককে শোষণ করিয়া, দগ্ধকে দাহন করিয়া, দুবারি কুলকলঙ্কিনীর অলকদাম রত্নরাজিতে শোভিত হয়। আর বড়-মানুষেরা? তাহারা এক কপর্দ্দক রাজকোষে অর্পণ করে না, কেবল রাজপ্রসাদ ভোগ করে। রাজপ্রসাদ অজস্র, অনন্ত, অপরিমিত,—যে যত পায়, গ্রহণ করে, কেন না, তাহা পিষ্টপেষণলব্ধ। কিন্তু রাজপ্রসাদভোগীরা কপর্দ্দকমাত্র রাজকোষে দেয় না। বড়মানুষে কর দেয় না, ধর্ম্মযাজকেরা কর দেয় না, রাজপুরুষেরা কর দেয় না—কেবল দীন দুঃখী কৃষকেরা কর দেয়। তাহার উপর করসংগ্রাহকদিগের অত্যাচার। মিশালা বলেন, "কর আদায় এক প্রণালীবদ্ধ যুদ্ধের ন্যায় ছিল। তাহার দ্বারা দুই লক্ষ নিষ্কর্মা ভূমিকে প্রপীড়িত করিত। এই পঙ্গপালের রাশি সর্ব্বগ্রাস, সর্ব্বনাশ করিত। এই প্রকারে পরিশোষিত প্রজাদিগের নিকট আরও আদায় করিতে হইলে সুতরাং নিষ্ঠুর রাজব্যবস্থা, ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধি, নাবিক-দাসত্ব, 'ফাঁসিকাষ্ঠ, পীড়নযন্ত্র প্রভৃতি আবশ্যক হইল।" রাজকর ইজারা বন্দোবস্ত ছিল: ইজারাদারের এমন অধিকার ছিল যে, শস্ত্রাঘাতাদির দ্বারা রাজস্ব আদায় করে, তাহারা তজ্জন্য প্রজাবধ পর্য্যন্ত করিত। এক দিকে রম্যোদ্যান, বনবিহার, নৃত্যগীত, হাস্য-পরিহাস, অনন্ত প্রমোদ, চিন্তাশূন্যতা,—আর এক দিকে দারিদ্র্য, অনাহার, পীড়া, নিরপরাধে নাবিক-দাসত্ব, ফাঁসিকাঠে প্রাণবধ। পঞ্চদশ লুইর রাজত্বকালে ফ্রান্সদেশে এইরূপ গুরুতর বৈষম্য। এই বৈষম্য কদর্য্য, অপরিশুদ্ধ রাজশাসনপ্রণালীজনিত। রুসোর গুরুতর প্রহারে সেই

রাজ্য ও রাজশাসনপ্রণালী ভগ্নমূল হইল। তাঁহার মানসশিষ্যেরা তাহা চূর্ণীকৃত করিল।

শাক্যসিংহ এবং যীশুখৃষ্ট পবিত্র সত্যকথা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। এ জন্য মনুষ্যলোকে তাঁহারা যে দেবতা বলিয়া পূজিত, ইহা যথাযোগ্য। রুসো তাঁহাদের সমকক্ষ ব্যক্তি নহেন। অবিমিশ্র বিমল সত্যই যে তাঁহা কর্ত্তৃক ভূমণ্ডলে প্রচারিত হইয়াছিল, এমত নহে। তিনি মহিমময় লোক-হিতকর নৈতিক সত্যের সহিত অনিষ্টকর মিথ্যা মিশাইয়া, সেই মিশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজালের গুণে লোকবিমোহিনী শক্তি দিয়া ফরাসীদিগের হৃদয়াধিকারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। একে কথাগুলি কালোপযোগিনী, তাহাতে রুসো বাক্‌শক্তিতে যথার্থ ঐন্দ্রজালিক, তাঁহার প্রেরিত সৎকথানুসারিণী ভ্রান্তিও ফরাসীদিগের জীবনযাত্রার একমাত্র বীজমন্ত্র বলিয়া গৃহীত হইল। সকল ফরাসী তাঁহার মানসশিষ্য হইল। তাহারা সেই শিক্ষার গুণে ফরাসী-বিপ্লব উপস্থিত করিল।

রুসোরও মূল কথা, সাম্য প্রাকৃতিক নিয়ম। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল মনুষ্য সমান। সভ্যতার ফলে বৈষম্য জন্মে, কিন্তু বৈষম্য জন্মে বলিয়া রুসো সভ্যতাকে মনুষ্যজাতির গুরুতর অমঙ্গল বিবেচনা করেন। তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে নৈসর্গিক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেও সভ্যতার দোষে ;—সভ্যতাজনিত ভোগাসক্তি, পাপানুরক্তি এবং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারের ফল। অসভ্যাবস্থায় সকল মনুষ্যের সমভাবে শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যক হয়। এ জন্য সকলেরই সমভাবে শরীরপুষ্টি হয় ;—নীরোগ শরীরের ফল নীরোগ মন। যখন মনুষ্যগণ বন্যাবস্থায় কাননে কাননে মৃগয়া করিয়া বেড়াইত, বৃক্ষতলে বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইত, অল্পমাত্র ভাষাশক্তি-সম্পন্ন ছিল, এ জন্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্য জানিত না। যে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই, যে লোভের তৃপ্তি নাই, যে বাসনার পূরণ নাই, তাহার কিছুই জানিত না। ইহাকে ভালবাসিব, উহাকে বাসিব না ; এ আপন, ও পর ; এ স্ত্রী, ও পরস্ত্রী ; এ সকল বুঝিত না,—সেই অবস্থাকে স্বর্গীয় সুখ মনে করিয়া, মনুষ্যজাতিকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন,—"এই অপূর্ব্ব চিত্র দেখ! ইহার সহিত এখনকার দুঃখপূর্ণ পাপপূর্ণ সভ্যাবস্থার তুলনা কর!"

যেই মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে, সেই মনুষ্যমাত্রের সমান,—নৈসর্গিক প্রকৃতিতে সমান এবং সম্পত্তির অধিকারিত্বেও সমান। এই পৃথিবীর ভূমিতে

রাজার যে প্রাকৃতিক অধিকার, ভিক্ষুকেরও সেই অধিকার। ভূমি সকলেরই,—কাহারও নিজস্ব নহে। যখন বলবানে দুর্ব্বলকে অধিকারচ্যুত করিতে লাগিল, তখনই সমাজ-সংস্থাপনের আরম্ভ হইল। সেই অপহরণের স্থায়িত্ব-বিধানের নাম আইন।

যে ব্যক্তি সর্ব্বাদৌ কোন ভূমিখণ্ড চিহ্নিত করিয়া বলিয়াছিল, "ইহা আমার," সেই সমাজকর্ত্তা। যদি কেহ তাহাকে উঠাইয়া দিয়া বলিত, "এ ব্যক্তি বঞ্চক, তোমরা উহার কথা শুনিও না, বসুন্ধরা কাহারও নহেন ; তৎপ্রসূত শস্য সকলেরই," তবে সে মানবজাতির অশেষ উপকার করিত।

রুসোর এই সকল কথা অতি ভয়ানক। বল্টের শুনিয়া বলিয়াছিলেন, এ সকল বদ্মায়েসের দর্শনশাস্ত্র। এই সকল কথার অনুবর্ত্তী হইয়া রুসোর মানসশিষ্য প্রুধোঁ বলিয়াছিলেন যে, অপহরণের নাম সম্পত্তি।

জগদ্বিখ্যাত Le Contrat Social নামক গ্রন্থে রুসো এই সকল মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভ্যাবস্থার তাদৃশ দোষকীর্ত্তনে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন যে, অসভ্যাবস্থায় যেখানে সহজ জ্ঞানে ধর্ম্ম নির্ণীত হয়, সভ্যাবস্থায় তৎপরিবর্ত্তে ন্যায়ানুভাবকতা সন্নিবেশিত হয়। সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি প্রথমাধিকারীকে অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু অবস্থাবিশেষে মাত্র—প্রথম, যদি ভূমি পূর্ব্বে অধিকৃত না হইয়া থাকে ; দ্বিতীয়, অধিকারী যদি আত্মভরণপোষণের উপযোগী মাত্র ভূমি অধিকার করে, তাহার অধিক না লয় ; তৃতীয়, যদি নামমাত্র দখল না লইয়া, কর্ষণাদির দ্বারা দখল লওয়া হয়, তবে অধিকৃত ভূমি অধিকারীর সম্পত্তি।

Le Contrat Social গ্রন্থের স্থূলোদ্দেশ্য এই যে, সমাজ সমাজ-ভুক্তদিগের সম্মতিসৃষ্ট। যেমন পাঁচ জন ব্যবসাদার মিলিয়া, পরস্পরে কতকগুলি নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া একটি জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী সৃষ্ট করেন, রুসোর মতে সমাজ, রাজ্য, শাসন, এ সকল সেইরূপ লোকের মঙ্গলার্থ লোকের দ্বারা সৃষ্ট। এ কথার ফল অতি গুরুতর। তোমায় আমায় চুক্তি হইয়াছে যে, তুমি আমার জমি চষিয়া দিবে, আমি তোমাকে খাইতে পরিতে দিব এবং গৃহে স্থান দিব। তুমি যে দিন আমার ভূমিকর্ষণ বন্ধ করিলে, সেই দিন আমি তোমার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলাম এবং গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করিলাম। এই কার্য্য ন্যায়সঙ্গত হইল। তেমনি যদি রাজাপ্রজার সম্বন্ধ কেবল চুক্তিমাত্র হয়, তবে প্রজা অত্যাচারী রাজাকে

বলিতে পারে, "তুমি চুক্তিভঙ্গ করিয়াছ। প্রজার মঙ্গল করিবে, এই অঙ্গীকারে তুমি রাজা ; তোমার কার্য্য আমাদের মঙ্গল করা, আমাদের কার্য্য তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞাপালন। তুমি এখন আর আমাদের মঙ্গল কর না, অতএব আমরাও তোমাকে কর দিব না, বা আজ্ঞাপালন করিব না। তুমি রত্নসিংহাসন হইতে অবতরণ কর।"

অতএব যে দিন Le Contrat Social প্রচারিত হইল, সেই দিন ফরাসী রাজার হস্তে রাজদণ্ড ভগ্ন হইল। এই গ্রন্থের চরমফল ষোড়শ লুইর সিংহাসনচ্যুতি এবং প্রাণদণ্ড। ফরাসী-বিপ্লবে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহার মূল এই গ্রন্থে। সেই যজ্ঞে বেদমন্ত্র এই গ্রন্থোক্ত বাণী।

সেই ফরাসী-বিপ্লবে রাজা গেল, রাজকুল গেল, রাজপদ গেল, রাজনাম লুপ্ত হইল। সম্ভ্রান্ত লোকের সম্প্রদায় লুপ্ত হইল, পুরাতন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্মযাজক-সম্প্রদায় গেল, মাস, বার, প্রভৃতির নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইল,—অনন্ত-প্রবাহিত শোণিতস্রোতে সকল ধুইয়া গেল। কালে আবার সকলই হইল, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা আর হইল না। ফ্রান্স নূতন কলেবর প্রাপ্ত হইল। ইউরোপে নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইল,—মনুষ্যজাতির স্থায়ী মঙ্গল সিদ্ধ হইল, রুসোর ভ্রান্ত বাক্যে অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপিতা হইল। কেন না, সেই ভ্রান্ত বাক্য সাম্যাত্মক। সেই ভ্রান্তির কায়া অর্দ্ধেক সত্যে নির্ম্মিত।

ফরাসী-বিপ্লব শমিত হইল, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু 'ভূমি সাধারণের', এই কথা বলিয়া রুসো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। "কম্যুনিজ্‌ম" সেই বৃক্ষের ফল। "ইন্টারন্যাশান্যালিজ্‌ম" সেই বৃক্ষের ফল। এ সকলের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

এ দেশে এবং অন্য দেশে সচরাচর সম্পত্তি ব্যক্তিবিশেষের। আমার বাড়ী, তোমার ভূমি, তাহার বৃক্ষ। কিন্তু ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকার সম্পত্তি হইতে পারে না, এমত নহে। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি না হইয়া, সর্ব্বলোক-সাধারণের সম্পত্তি হইতে পারে। এই সর্ব্বলোকপালিকা বসুন্ধরা কাহারও একার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, বা দশ-পনের জন ভূম্যধিকারীর জন্য সৃষ্ট হয় নাই। অতএব ভূমির উপর সকলেরই সমান অধিকার থাকা কর্ত্তব্য। সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী বাক্‌শক্তির বলে, এই কথা রুসো পৃথিবীর মধ্যে আদৃতা

করাইয়াছিলেন। ক্রমে বিজ্ঞ বিবেচক পণ্ডিতেরা সেই ভিত্তির উপর সম্পত্তি-মাত্রেরই সাধারণত্ব স্থাপন করিবার মতসকল প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রথম মত এই যে, ভূমি এবং মূলধন, যাহা দ্বারা অন্য ধনের উৎপত্তি হইবে, তাহা সামাজিক সর্ব্বলোকের সাধারণ সম্পত্তি হউক। যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা সর্ব্বলোকে সমভাগে বন্টন করিয়া লউক। ইহাতে বড়লোক ছোটলোক কোন প্রভেদ রহিল না। সকলেই সমানভাবে পরিশ্রম করিবে। সকলেই সমান ভাগে ধনের অধিকারী। ইহাই প্রকৃত কম্যুনিজ্‌ম। ইহার প্রচারকর্ত্তা ওয়েন, লুই ব্ল্যাং এবং কাবে। কিন্তু সাধারণ কম্যুনিষ্ট বহুশ্রমী এবং অল্পশ্রমী, কর্ম্মিষ্ঠ এবং অকর্ম্মিষ্ঠ, সকলকেই যেরূপ ধনের সমানভাগী করিতে চাহেন, লুই ব্ল্যাং সে-মতাবলম্বী নহেন। তিনি বলেন, শ্রমানুসারে ধনের ভাগ হওয়া কর্ত্তব্য। যে মত সেন্ট-সাইমনিজ্‌ম বলিয়া বিখ্যাত, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, সকলেই যে সমভাবে ধনভাগী হইবে বা সকলেই একপ্রকার পরিশ্রম করিবে, বা সকলেই যে সমান পরিশ্রম করিবে, এমত নহে। যে যেমন পরিশ্রমের উপযুক্ত ও যে যে-কার্য্যের উপযুক্ত, সে তেমনি পরিশ্রম করিবে ও সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। কার্য্যের গুরুত্ব এবং কর্ম্মকারকের গুণানুসারে বেতন প্রদত্ত হইবে। যে যাহার যোগ্য, তাহাতে তাহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য,—যে প্রকারে পুরস্কৃত হইবে তাহা নিরূপণ এবং সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধারণ জন্য কতকগুলি কর্ত্তৃপক্ষ থাকিবেন। ভূমি, ধনোৎপাদক সামগ্রী-সকল সাধারণের। ইত্যাদি।

ফুরীরিজ্‌ম আর একপ্রকার সাধারণ সম্পত্তির স্বপক্ষতা। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের এমত মত নহে যে, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকিতে পারিবে না। সম্পত্তির বৈশেষিকতা এবং উত্তরাধিকারিতাও ইঁহাদের অনুমত। ইঁহারা বলেন যে, দুই সহস্র বা তদ্রূপ লোক একতন্ত্র হইয়া ধনোৎপাদন করিবে। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের দ্বারা ধনোৎপত্তি হইতে থাকিবে। তাহারা আপনাদিগের কর্ত্তৃপক্ষ আপনারা মনোনীত করিবে। মূলধনের পার্থক্য থাকিবে। উৎপন্ন ধনের মধ্য হইতে প্রথমে কিয়দংশ সমভাবে সকলকে বিতরিত হইবে। যে শ্রমে অপারগ, সেও তাহা পাইবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, শ্রমকারী, মূলধনকারী এবং কর্ম্মনিপুণদিগের জন্য কোন নিয়মিত পরিমাণে তাহা বিভক্ত হইবে, যে যেমন গুণবান্, সে তদুপযুক্ত পাইবে। ইত্যাদি।

ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে মৃত মহাত্মা জন ষ্টুয়ার্ট মিল যাহা বলিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক, কেন না তাহাও সাম্যতত্ত্বের অন্তর্গত। যিনি উপার্জ্জনকর্ত্তা, উপার্জ্জিত সম্পত্তিতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার, ইহা মিল স্বীকার করেন। যে যাহা আপন পরিশ্রমে বা গুণে উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা অপর্য্যাপ্ত হইলেও তাহার যাবজ্জীবন ভোগ্য এবং তাহার জীবনান্তেও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিয়া যাইবার তাহার অধিকার আছে। কিন্তু যদি আপন জীবনান্তে সে কাহাকেও না দিয়া যায়, তবে তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি একা ভোগ করিবার অধিকার কাহারও নাই। রাম যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহাতে দশ সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতে পারে ; কিন্তু রাম উপার্জ্জন করিয়াছে বলিয়া সে নয় সহস্র নয় শত নিরানব্বুই জনকে বঞ্চিত করিয়া, একা ভোগের অধিকারী বটে। জীবনান্তে স্বেচ্ছাক্রমে আপনার পুত্রকে বা অপরকে তাহাতে স্বত্ববান্ করিবারও তাহার অধিকার আছে। কিন্তু সে যদি কাহাকেও না দিয়া গেল, তবে কেবল ব্যবস্থার বলে, তাহার পুত্রও কেন একা অধিকারী হয়? অধিকার উপার্জ্জনকর্ত্তার, তাহার পুত্রের নহে। যেখানে অধিকারী বলিয়া যান নাই যে, আমার পুত্র সকল ভোগ করিবে, সেখানে পুত্র অধিকারী নহে, সামাজিক লোক সকলেই সমানভাবে অধিকারী।

তবে পিতা পুত্রকে এই দুঃখময় সংসারে আনিয়াছেন, এ জন্য যাহাতে সে কষ্ট না পায়, সুশিক্ষিত হইয়া, অভাবাপন্ন না হইয়া, যাহাতে সে সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, পিতার এরূপ উপায় করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। পিতৃসম্পত্তির যে অংশ রাখিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, পুত্রের তাহা বিনা দানেও প্রাপ্য। কিন্তু তদধিক এক কড়াও তাহার প্রাপ্য নহে। মিল বলেন, জারজ পুত্রের অপেক্ষা অন্য পুত্রের কিছুমাত্র অধিক অধিকার নাই,—উভয়েই কেবল আত্মরক্ষার উপায়ের অধিকারী। কিন্তু এরূপ যাহা কিছু অধিকার তাহা সন্তানের। পুত্রের অবর্ত্তমানে জ্ঞাতি প্রভৃতির মৃতের সর্ব্বসম্পত্তিতে একাধিকারী হওয়ার কিছুমাত্র ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। যাহার সন্তান আছে, তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে সন্তানের আবশ্যকীয় ধন রাখিয়া অবশিষ্ট জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্ত্তব্য ; যাহার সন্তান নাই, তাহার সমুদায় সম্পত্তিতেই জনসাধারণের অধিকার হওয়া কর্ত্তব্য। বাস্তবিক উত্তরাধিকারিত্ব-সম্বন্ধে ন্যায়ানুযায়ী ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন রাজ্যে এ পর্য্যন্ত

হয় নাই। এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু এক দিন এরূপ বিধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলিবে।

সাম্যতত্ত্বের শেষাংশও এই চিরস্মরণীয় মহাত্মার প্রচারিত। স্ত্রী-পুরুষে সমান। এক্ষণে সুশিক্ষায়, বিজ্ঞানে, রাজকার্য্যে, বিবিধ ব্যবসায়ে একা পুরুষেই অধিকারী,—স্ত্রীলোক অনধিকারিণী থাকিবে কেন? মিল বলেন, নারীজাতিও এ সকলের অধিকারী ; তাহারা যে পারিবে না, উপযুক্ত নহে, এ সকল চির-প্রচলিত লৌকিক ভ্রান্তি মাত্র। মিলের এ মত ইউরোপে গ্রাহ্য হইয়া, ফলে পরিণত হইতেছে। আমাদিগের দেশে এ সকল কথা প্রচারিত হইবার এখনও বিলম্ব আছে।

সাম্যতত্ত্বসম্বন্ধে সার কথা পুনর্ব্বার উক্ত করিতে হইল। মনুষ্যে মনুষ্যে সমান। কিন্তু এ কথার এমত উদ্দেশ্য নহে যে, সকল অবস্থায় সকল মনুষ্যই সকল অবস্থায় সকল মনুষ্যের সঙ্গে সমান। নৈসর্গিক তারতম্য আছে। কেহ দুর্ব্বল, কেহ বলিষ্ঠ, কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ বুদ্ধিহীন। নৈসর্গিক তারতম্যে সামাজিক তারতম্য অবশ্য ঘটিয়াছে। যে বুদ্ধিমান্ এবং বলিষ্ঠ, সে আজ্ঞাদাতা। যে বুদ্ধিহীন এবং দুর্ব্বল, সে আজ্ঞাবাহী অবশ্য হইবে। রুসোও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য্য এই যে, সামাজিক বৈষম্য নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তদতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ এবং মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর। যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহাদের অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ। সেই ব্যবস্থা-গুলির সংশোধন না হইলে মনুষ্যজাতির প্রকৃত উন্নতি নাই ; মিল এক স্থানে বলিয়াছেন, এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা, তাহা পূর্ব্বতন কুব্যবস্থার সংশোধনমাত্র। ইহা সত্য কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ। তাই বলিয়া কেহ মনে না করেন যে, আমি জন্মগুণে বড়লোক হইয়াছি, অন্যে জন্মগুণে ছোট-লোক হইয়াছে। তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণ নহে। যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষ নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না ; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই, তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দ্দণ্ড-প্রচণ্ড-প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ

এবং তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম দোষগুণের অধীন নহে। তাহার অন্য কোন দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়-সঙ্গত অধিকারী।

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সন্ধি ও আত্মরক্ষা

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! আপনি প্রত্যুৎপন্ন ও অনাগত বিপদের প্রতিবিধানকারিণী বুদ্ধিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং দীর্ঘসূত্রতাকে বিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এক্ষণে ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মার্থকুশল প্রজারঞ্জন নরপতি কিরূপ বুদ্ধি আশ্রয় করিলে শত্রুকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়াও মুগ্ধ না হয়েন, অনেক শত্রু এক রাজাকে আক্রমণ করিলে তাঁহার কিরূপে অবস্থান করা কর্ত্তব্য, রাজা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে তাঁহার বহুসংখ্যক শত্রু পূর্ব্বাপকার-নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া যদি তাঁহাকে সমূলে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তখন তিনি কিরূপে একাকী সহায়বিহীন হইয়া সেই গ্রাসোদ্যত শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করিবেন, মিত্র ও শত্রুপক্ষ আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, যে রাজার মিত্রগণও শত্রু হইয়া উঠে, তিনি কি উপায় অবলম্বন করিলে সুখলাভে সমর্থ হয়েন, প্রকৃত ও কৃত্রিম মিত্রের মধ্যে কাহার সহিত সন্ধিসংস্থাপন ও কাহার সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য এবং বলবান্ হইলেও শত্রুগণের মধ্যে কিরূপে অবস্থান করা উচিত, এই সমস্ত বিষয় বিধিপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। হে শান্তনুনন্দন! আপনি জিতেন্দ্রিয় ও সত্যপ্রতিজ্ঞ, আপনি ব্যতীত এই

সমুদয় বিষয়ের বক্তা আর কেহই নাই এবং শ্রোতাও অতি সুদুর্লভ। অতএব এক্ষণে আপনি এই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি যেরূপ গুণসম্পন্ন, তোমার প্রশ্নগুলিও তদনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে আপৎকালের অনুষ্ঠানোপযোগী গূঢ় বিষয়-সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। কোন কোন সময়ে শত্রুও মিত্র হয় এবং কখন কখন মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে; কার্য্যের গতিও সর্ব্বদা সমান হয় না: অতএব কার্য্যাকার্য্য নিশ্চয় করিতে হইলে দেশকাল বিবেচনা করিয়া বিশ্বাস ও বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। হিতার্থী পণ্ডিতগণের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত শত্রুদিগের সহিতও সন্ধি করিতে হয়। যে মূর্খ বিপক্ষদিগের সহিত কদাপি সন্ধি করিতে সম্মত না হয়, সে কখনই অর্থোপার্জন বা সুখভোগ করিতে পারে না। আর যে ব্যক্তি উপযুক্ত সময়ে মিত্রগণের সহিত বিরোধ ও শত্রুদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করে, তাহার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফললাভ হয়, সন্দেহ নাই। আমি এই উপলক্ষে মার্জারমূষিকসংবাদ নামে একটি পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

কোন নিবিড় অরণ্যমধ্যে এক লতাজালজড়িত পক্ষিকুলসমাকীর্ণ অতি বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। পলিত নামে এক মহাপ্রাজ্ঞ মূষিক ঐ বৃক্ষের মূলে শতমুখ বিবর প্রস্তুত করিয়া বাস করিত। লোমশ নামে এক পক্ষিসংঘাত-ঘাতক মার্জারও বৃক্ষের শাখা আশ্রয় করিয়া ছিল। কিয়দ্দিন পরে এক চণ্ডাল সেই অরণ্যে আগমনপূর্ব্বক গৃহ নির্ম্মাণ করিল। সে প্রতিদিন সায়ংকালে মৃগাদির বন্ধনার্থ ঐ বৃক্ষের অনতিদূরে স্নায়ুময় পাশ বিস্তৃত করিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক সুখে রজনীযাপন করিত এবং প্রাতঃকালে তথায় আগমনপূর্ব্বক রাত্রিযোগে যে সকল মৃগ পাশে বদ্ধ হইয়া থাকিত, তাহাদিগকে লইয়া যাইত।

একদা সেই বৃক্ষশাখাসমাশ্রিত মার্জার দৈবাৎ ঐ পাশে বদ্ধ হইল। তখন পলিতনামা মূষিক সেই প্রবল শত্রুকে বদ্ধ দেখিয়া অকুতোভয়ে ভক্ষ্যবস্তুর অন্বেষণার্থ তথায় পর্য্যটন করিতে লাগিল এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই পাশোপরি ভক্ষ্যদ্রব্য দেখিতে পাইয়া মার্জারের উপরে আরোহণ-পূর্ব্বক মনে মনে হাস্যকরতঃ আমিষ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময়ে উহার অনতিদূরে হরিত নামে তাম্রলোচন চঞ্চলস্বভাব নকুল মূষিকের আঘ্রাণ

পাইয়া ভক্ষণার্থ সত্বর সৃক্কণী লেহন করিতে করিতে ভূগর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিল এবং চন্দ্রক নামে এক তীক্ষ্ণতুন্ড তরুকোটরবাসী উলূক বৃক্ষশাখায় বিচরণ করিতে লাগিল। মূষিক আমিষভক্ষণে নিতান্ত ব্যগ্র ছিল, অকস্মাৎ সেই শত্রুদ্বয়কে অবলোকনপূর্ব্বক নিতান্ত ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে,—

এইরূপ চতুর্দ্দিকে প্রাণসংকট বিষম আপদ্ উপস্থিত হইলে আত্ম-হিতৈষী ব্যক্তিদিগের কি করা কর্ত্তব্য? আপদ্ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণ করিয়া প্রাণরক্ষা করাই বুদ্ধিমান্‌দিগের উচিত। অতএব যাঁহারা চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহাদিগের জীবন ধন্য। আমি এক্ষণে বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছি। সহসা ভূতলে উপস্থিত হইলে নকুল এবং এই স্থানে অবস্থান করিলে উলূক আমাকে ভক্ষণ করিবে। আর যদি বিড়াল ইতিমধ্যে পাশ হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে কোনক্রমেই উহার নিকট আমার নিস্তার নাই। যাহা হউক, মাদৃশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিপৎকালে কখনই বিমুগ্ধ হয় না। এক্ষণে আমি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া জীবনরক্ষার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে ত্রুটি করিব না। নীতিশাস্ত্রবিশারদ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেরা ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইলেও অবসন্ন হয়েন না। অতঃপর এই মার্জার ভিন্ন আমার পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে এই শত্রু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে। আমার দ্বারা ইহার বিশেষ উপকার হইতে পারে। অতএব জীবনরক্ষার্থ এই মার্জারের আশ্রয় গ্রহণ করাই আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমি নীতিবল অবলম্বনপূর্ব্বক ইহার হিতসাধন করিয়া শত্রুগণকে বঞ্চিত করিব। এই মার্জার পরম শত্রু। কিন্তু এক্ষণে এ ঘোরতর বিপদে নিপতিত হইয়া স্বার্থসাধনার্থ আমার সহিত সন্ধি করিতে পারে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, বলবান্ ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া জীবনরক্ষার নিমিত্ত নিকৃষ্ট শত্রুর সহিতও সন্ধি করিতে পারে। মূর্খ মিত্র অপেক্ষা পণ্ডিত শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর। যদি এই বিড়াল পণ্ডিত হয়, তবে উহা হইতে নিশ্চয়ই আমার জীবনরক্ষা হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে এই মার্জার দ্বারাই আমার জীবনরক্ষার সম্ভাবনা। অতএব ইহাকে আমার প্রাণ রক্ষা করিতে অনুরোধ করিব। সম্প্রতি ন্যায়ানুসারে ইহাকেই পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

16—1962 B.T.

সন্ধিবিগ্রহকালাভিজ্ঞ অর্থতত্ত্বজ্ঞ মূষিক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বিনীতভাবে মার্জারকে কহিল,—সখে! তুমি ত জীবিত আছ? আমি আমাদিগের উভয়ের হিতসাধনার্থ তোমার জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষ করিতেছি। অতঃপর তুমি কিছুমাত্র ভীত হইও না। যদি তুমি আমার হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিব। এক্ষণে আমি একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, সেই উপায় অবলম্বন করিলে তুমি বন্ধনমুক্ত হইবে এবং আমিও বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। ঐ দেখ, দুর্ব্বুদ্ধি নকুল ও উলূক অনতিদূরে অবস্থান করিতেছে। যাহাতে উহারা আমাকে আক্রমণ করিতে না পারে, তুমি তদ্বিষয়ে যত্ন কর। চঞ্চলনেত্র পাপাত্মা উলূককে ন্যগ্রোধবৃক্ষের শাখাগ্রে অবস্থানপূর্ব্বক চীৎকার ও আমার প্রতি নেত্রপাত করিতে দেখিয়া আমি যার-পর-নাই উদ্বিগ্ন হইয়াছি। পরস্পর অকপটচিত্তে বাক্যালাপ হওয়াই সাধুদিগের মিত্রতার মূল। তুমি আমার পরম মিত্র ও পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কিছুমাত্র মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। আমি নিশ্চয়ই মিত্রের কার্য্য সম্পাদন করিব। তুমি আমার সাহায্য ব্যতীত কখনই পাশ ছেদন করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব এক্ষণে যদি আমায় হিংসা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার পাশ ছেদন করিয়া দিব। তুমি এই পাদপের উপরিভাগে ও আমি ইহার মূলদেশে বহুদিন অবস্থান করিয়া আসিতেছি ; অতএব আমাদের পরস্পর সাহায্যে যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যাহারা কাহাকেও বিশ্বাস না করে এবং যাহাদিগকে কেহই বিশ্বাস করে না, পণ্ডিতেরা কদাচ তাহাদের প্রশংসা করেন না। অতএব আমাদিগের পরস্পরের প্রীতি প্রণয় পরিবর্দ্ধিত ও সন্ধি সংস্থাপিত হউক। কাল অতীত হইলে অর্থসাধনের চেষ্টা করা নিতান্ত নিরর্থক। উহা পণ্ডিত-সমাজে কদাচ আদরণীয় হয় না। এক্ষণে আমরা পরস্পর পরস্পরের জীবনরক্ষা করিবার নিমিত্তই উপযুক্ত সময়ে সন্ধিসংস্থাপন করিতেছি। লোকে যেমন কাষ্ঠ দ্বারা সুগভীর মহানদী উত্তীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে মনুষ্য কাষ্ঠকে, কাষ্ঠ মনুষ্যকে নদীর পরপারে লইয়া যায়, আমরাও তদ্রূপ সন্ধিসংস্থাপনপূর্ব্বক পরস্পরের হিতসাধন করিব। আমি নিশ্চয়ই তোমার উদ্ধারসাধন করিব ; কিন্তু অগ্রে তোমাকে আমার উদ্ধার করিতে হইবে।

মূষিকপ্রধান পলিত অনুরূপ হিতকর হেতুযুক্ত বাক্য কীর্ত্তন করিয়া প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ

মার্জার মূষিকের হিতকর বাক্য শ্রবণ ও আপনার দুরবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক মনে মনে সন্ধি করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল। তখন সে মূষিকের প্রতি মন্দ মন্দ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—মহাত্মন্! তুমি যে আমার জীবন রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলাম। যদি তুমি আমাদিগের পরস্পরের প্রণয় শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমরা উভয়েই ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়াছি, অতএব এ সময়ে শীঘ্রই সন্ধি করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে তোমার উপকার কখনই ব্যর্থ হইবে না। অধিক কি, আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম ; তুমি আমাকে আপনার শিষ্য, ভৃত্য ও শরণাগত বলিয়া বিবেচনা কর।

তখন বুদ্ধিমান্ মার্জার এই কথা কহিলে মূষিকশ্রেষ্ঠ পলিত তাহাকে বশীভূত বিবেচনা করিয়া কহিল,—সখে! তুমি উদারচিত্তে যে সকল কথা কহিলে, তৎসমুদয় তোমার সাধুতার অনুরূপই হইয়াছে। এক্ষণে আমার হিতসাধনের উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। নকুলকে দেখিয়া আমি যার-পর-নাই ভীত হইয়াছি। আর ক্ষুদ্রাশয় উলূকও আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে আমি তোমার ক্রোড়ে প্রবেশ করিব ; তুমি আমাকে বিনষ্ট করিও না। আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার পাশবন্ধন ছেদন করিয়া তোমাকে মুক্ত করিব।

তখন সেই সুহৃদ্ভাবাপন্ন মার্জার মূষিকের যুক্তিসঙ্গত বাক্য-শ্রবণে প্রীতমনে তাহার সমুচিত সৎকার করিয়া কহিল,—ভদ্র! তুমি অচিরাৎ আমার ক্রোড়ে প্রবেশ কর। তুমি আমার প্রাণতুল্য প্রিয়সখা। তোমার প্রসাদে আমি বন্ধনমুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইব। অতঃপর তুমি আমার সাধ্যমত যাহা যাহা আজ্ঞা করিবে, আমি তৎসমুদয় প্রতিপালন করিব। এক্ষণে আইস, আমরা উভয়ে সন্ধিস্থাপন করি। আমি এই সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত তোমার সমুদয় হিতকার্য্য-সম্পাদন, প্রীতিসাধন ও যথোচিত সৎকার করিব। লোকে পূর্ব্বোপকারীর প্রভূত প্রত্যুপকার করিয়াও তাহার তুল্য প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যুপকারী উপকৃত হইয়াছে বলিয়াই প্রত্যুপকার করে, কিন্তু পূর্ব্বোপকারী নিষ্কারণেই উপকার করিয়া থাকে।

এইরূপে মার্জার স্বার্থসাধনার্থ সন্ধিস্থাপন করিলে মূষিক বিশ্বস্তচিত্তে সেই শত্রুর ক্রোড়মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার বচনে আশ্বাসিত হইয়া তথায় শয়ন করিয়া রহিল। তখন নকুল ও উলূক মার্জার ও মূষিকের প্রীতি-দর্শনে অতিশয় চমৎকৃত হইয়া ভীতচিত্ত ও মূষিকভক্ষণে নিতান্ত নিরাশ হইল। উহারা বুদ্ধিমান্ ও বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও তৎকালে বিড়াল ও মূষিকের নীতিভঙ্গে সমর্থ হইল না, প্রত্যুত তাহাদিগকে স্বস্বকার্য্যসাধনার্থ সন্ধি-সংস্থাপনে কৃতকার্য্য অবগত হইয়া অবিলম্বে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই দেশকালজ্ঞ মূষিক মার্জারের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া সময় প্রতীক্ষা করতঃ ক্রমে ক্রমে তাহার পাশচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। মার্জার বন্ধনদশায় একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া ছিল, সুতরাং মূষিককে শনৈঃ শনৈঃ পাশ ছেদন করিতে দেখিয়া নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া কহিল,—ভাই! তুমি ত কৃতকার্য্য হইয়াছ, তবে কি নিমিত্ত পাশচ্ছেদনে সত্বর হইতেছ না? ব্যাধ অবিলম্বেই এ স্থানে আগমন করিবে, অতএব শীঘ্র পাশচ্ছেদন কর।

মার্জার এই কথা কহিবামাত্র বুদ্ধিমান্ মূষিক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মিত্র! তুমি স্থির হও, তোমার ব্যস্ত বা ভীত হইবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। আমি উপযুক্ত সময় বিলক্ষণ অবগত আছি। উহা কখন উত্তীর্ণ হইবে না। অকালে কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হয় না। উপযুক্ত সময়ে উহা আরব্ধ হইলেই মহৎ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। আমি অকালে তোমাকে মুক্ত করিয়া দিলে তোমা হইতেও আমার ভয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা: অতএব কাল প্রতীক্ষা কর, বৃথা ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। চণ্ডালতনয় অস্ত্রধারণপূর্ব্বক এখানে সমাগত হইলে আমাদিগের উভয়েরই ভয় উপস্থিত হইবে। আমি সেই সময়ই তোমার পাশচ্ছেদন করিয়া দিব। তাহা হইলে তুমি পাশবিমুক্ত হইয়া ভীতচিত্তে সত্বর বৃক্ষে আরোহণ করিবে, আমিও গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিব। অতঃপর আমা হইতে তোমার জীবনরক্ষা ব্যতীত আর কিছু লাভের সম্ভাবনা নাই।

মূষিক এই কথা কহিলে মহামতি মার্জার মূষিককে সম্বোধন করিয়া কহিল, সখে! আমি যেরূপে সত্বর হইয়া তোমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছি, সাধু ব্যক্তিরাও সেরূপে মিত্রকার্য্য সাধন করেন না। অতএব আমার ন্যায় সত্বর হইয়াই আমার হিতসাধন করা তোমার কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বিলম্ব

হইলে আমাদের উভয়েরই অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ; অতএব সত্বরে আমাকে পাশ হইতে মুক্ত করিতে যত্ন কর। আর যদি তুমি পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া কালক্ষেপ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার আয়ুঃশেষ হইবে। যদি আমি অজ্ঞানতানিবন্ধন পূর্ব্বে তোমার কোন অপকার করিয়া থাকি, তাহা চিন্তা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও।

মার্জার এইরূপ কহিলে, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন মূষিক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—মার্জার! আমরা কেবল স্বার্থসাধনের নিমিত্তই পরস্পর পরস্পরের বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছি। কিন্তু যে মিত্রতাতে ভয়ের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, সর্পমুখে নিপতিত করতলের ন্যায় তাহা অতি সাবধানে রক্ষা করা আবশ্যক। বলবান্ ব্যক্তির সহিত সন্ধিসংস্থাপন করিয়া যত্নসহকারে আত্মরক্ষা না করিলে উহা অপথ্য-সেবার ন্যায় অনর্থপাতের মূলীভূত হইয়া উঠে। এই ভূমণ্ডলে কেহই কাহারও নৈসর্গিক শত্রু বা মিত্র নাই, কেবল কার্য্যবশতঃ পরস্পরের সহিত পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতা জন্মিয়া থাকে। হস্তী দ্বারা যেমন বন্য মাতঙ্গ বদ্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ অর্থ দ্বারা অর্থ সঞ্চিত হয়। কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে আর কেহ কর্ত্তার সম্মান করে না। অতএব সকল কার্য্যেরই শেষ রাখিয়া সম্পন্ন করা আবশ্যক। চণ্ডাল এখানে সমুপস্থিত হইলে তুমি ভীত হইয়া আমাকে আক্রমণ না করিয়াই পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে ; অতএব সেই সময়েই আমি তোমাকে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিব ; এক্ষণে আমি প্রায় সমুদয় তন্তুই ছেদন করিয়াছি, একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে, অচিরাৎ তাহাও ছেদন করিতেছি, অতএব তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান কর।

তাহারা উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে রজনী প্রভাত হইল। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া লোমশের অন্তঃকরণে ভয়ের পরিসীমা রহিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে পরিঘ নামে এক কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার ব্যাধ অসংখ্য কুক্কুর লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইল। উহার নিতম্ব স্থূল, কর্ণ গর্দ্দভ-কর্ণের ন্যায় বিকৃত, বদন অতি ভীষণ ও বেশ যার-পর-নাই মলিন। মার্জার সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় সেই ব্যাধকে সন্দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে মূষিককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, সখে! এখন কি করিবে? তখন মূষিক মার্জারের পাশচ্ছেদন করিয়া দিল। মার্জার পাশ হইতে বিমুক্ত হইবামাত্র অবিলম্বে বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইল ; মূষিকও সেই ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরে দণ্ডধারী ব্যাধ পাশের

নিকট আগমনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল এবং পরিশেষে হতাশ হইয়া পাশ গ্রহণপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

অনন্তর বৃক্ষস্থিত মার্জার আপনাকে ঘোরতর বিপদ্ হইতে মুক্ত বিবেচনা করিয়া গর্ত্তস্থিত মূষিককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল,—সখে! তখন আমার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া সহসা প্রস্থান করিয়াছ। আমি অকৃতজ্ঞ ও অকৃতকর্ম্মা বলিয়া কেহই আমার প্রতি আশংকা করে না। তুমি তৎকালে আমার প্রতি বিশ্বাস ও আমাকে জীবন দান করিয়া এক্ষণে সুখানুভবসময়ে কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছ? যাহারা প্রথমতঃ মিত্রতা করিয়া পরিণামে তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান না করে, বিপদের সময়ে কখনই তাহাদিগের মিত্রলাভ হয় না। তুমি সাধ্যানুসারে আমার উপকার করিয়াছ। তুমি আমার পরম বন্ধু; অতএব মিত্রতানিবন্ধন আমার নিকট অবস্থানপূর্ব্বক সুখভোগ করা তোমার কর্ত্তব্য। শিষ্যগণ যেমন গুরুর সম্মান করে, তদ্রূপ আমার যাবতীয় বন্ধুবান্ধব তোমাকে পূজা করিবে। আমিও তোমাকে তোমার বন্ধুবান্ধবগণের সহিত যথোচিত সৎকার করিব। কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাণদাতার সম্মান না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? তুমি আমার শরীর, গৃহ ও সমুদয় অর্থের অধিকারী হও এবং অমাত্যপদে অভিষিক্ত হইয়া আমাকে পুত্রের ন্যায় শাসন কর। আমি স্বীয় জীবন দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আমা হইতে তোমার কিছুমাত্র আশংকা নাই। তুমি মন্ত্রণাবলে আমার জীবন রক্ষা করাতে আমি তোমাকে শুক্রের তুল্য বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ করিতেছি এবং তোমার মন্ত্রবল অসাধারণ বিবেচনা করিয়া তোমারই অধীন হইতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছি।

মার্জার এই কথা কহিলে পর মন্ত্রণাবধারণক্ষম মূষিক আপনার হিতজনক অতি মধুরবাক্যে তাহাকে কহিল,—সখে লোমশ! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তুমি যাহা কহিলে, তৎসমুদয়ই যথার্থ। এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। শত্রু মিত্র উভয়কেই উত্তমরূপে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঐ পরীক্ষা অতি সূক্ষ্মজ্ঞানসাপেক্ষ। অনেক সময়ে শত্রুগণ মিত্র এবং মিত্রগণও শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং যাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করা যায়, তাহাদিগকে কামক্রোধের বশীভূত বলিয়া স্থির করা যায় না। এই জগতে কেহ কাহারও মিত্র নাই; কেবল সামর্থ্যনিবন্ধনই পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতার সংঘটন হইয়া থাকে। যে জীবিত থাকিলে যাহার স্বার্থসিদ্ধি ও যে দেহত্যাগ

করিলে যাহার বিশেষ ক্ষতি হয়, সেই তাহার পরম মিত্র। চিরস্থায়ী মিত্রতা বা চিরস্থায়ী শত্রুতা প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। স্বার্থসাধননিবন্ধন কালসহকারে শত্রুও মিত্র এবং মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। অতএব স্বার্থকেই মিত্রতা ও শত্রুতা জন্মাইবার প্রধান কারণ বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি মিত্রের প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও শত্রুর প্রতি নিতান্ত অবিশ্বাস করে এবং স্বার্থবিষয়ে অনুধাবন না করিয়া মিত্র বা শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে স্থিরপ্রজ্ঞ বলিয়া গণনা করা যায় না। অবিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, বিশ্বাস হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কি পিতা, কি মাতা, কি শত্রু, কি মাতুল, কি ভাগিনেয়, কি অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই স্বার্থসাধনার্থ বশীভূত হইয়া থাকেন। এই জগতে সমুদয় লোকই আত্মরক্ষায় ব্যগ্র। পিতামাতা অতি প্রিয়পুত্রকেও পতিত বলিয়া অবগত হইলে জনসমাজে আপনাদের সম্ভ্রমরক্ষার্থ অচিরাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করেন। অতএব স্বার্থপরতার কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব!

এক্ষণে তুমি পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়াই অনায়াসে স্বার্থসাধন করিবার চেষ্টা পাইতেছ সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তুমি নিতান্ত চঞ্চল। চঞ্চল ব্যক্তি অন্যের রক্ষায় যত্ন করা দূরে থাকুক, আত্মরক্ষায়ও সতর্ক হয় না ; তুমি প্রথমে বটবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া চপলতানিবন্ধন এখানে যে জাল বিস্তীর্ণ ছিল, তাহা কিছুই অনুধাবন কর নাই। ফলতঃ চঞ্চল ব্যক্তিরা বুদ্ধির অস্থৈর্য্যবশতঃ সর্ব্বদা সকল কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে তুমি আমাকে যে প্রিয়তম বলিয়া মধুরবাক্যে সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রলোভিত করিতেছ, উহা তোমার ভ্রমমাত্র। আমি যে কারণে উহা ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি, তাহাও শ্রবণ কর। লোকে নিমিত্তবশতই অন্যের প্রিয় বা বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। এই জগতে সমুদয় লোকই স্বার্থপরতার বশীভূত ; ইহাতে কেহই কাহারও যথার্থ প্রিয়পাত্র নহে। সহোদর ভ্রাতা ও দম্পতিদিগের পরস্পর প্রীতিও নিষ্কারণ নহে। যদিও কখন কখন ভার্য্যা ও সহোদর কারণবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক নিষ্কারণ প্রীতিশৃঙ্খলে সংযত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার সহিত কোন সংস্রব নাই, তাহার সহিত যে প্রীতি হইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভবপর, সন্দেহ নাই। কেহ দান, কেহ প্রিয়বাক্যপ্রয়োগ এবং কেহ বা মন্ত্রপাঠ, হোম ও জপ দ্বারা অন্যের প্রিয় হইয়া থাকে। ফলতঃ লোকে যাহার দ্বারা কোন

কার্য্যসাধন করিতে পারে, তাহার প্রতিই প্রীতিপ্রদর্শন করে। সুতরাং প্রীতি কারণসাপেক্ষ। কারণের অসদ্ভাব হইলে প্রীতিরও অসদ্ভাব হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে কারণই আমাদিগের প্রণয়োৎপাদন করিয়াছিল। এক্ষণে তুমি যে আমাকে প্রীতিপ্রদর্শন করিতেছ, ইহার কারণ কি?

কাল হেতুকে আবিষ্কৃত করিয়া দেয়। হেতু কখনই স্বার্থশূন্য হইতে পারে না। যিনি সেই স্বার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনিই বিজ্ঞ এবং লোকে তাহারই অনুবৃত্তি করিয়া থাকে। আমি স্বার্থবিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ, সুতরাং আমাকে এইরূপ বলা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। তুমি অসময়ে আমার প্রতি স্নেহপ্রদর্শন করিতেছ। অতএব আমি কদাচ স্বস্থান হইতে বিচলিত হইব না। সন্ধি বা বিগ্রহ-বিষয়ে আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। মেঘ যেমন প্রতিক্ষণেই আপনার আকারপরিবর্ত্ত করিয়া থাকে, তোমার ভাব তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তুমি অদ্যই আমার শত্রু ছিলে, আবার অদ্যই মিত্র হইয়াছ; সুতরাং তোমার যুক্তির কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের প্রয়োজন ছিল, ততক্ষণ আমরা উভয়ের সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে সেই প্রয়োজনের সহিত সদ্ভাবও অন্তর্হিত হইয়াছে। তুমি আমার স্বাভাবিক শত্রু; কার্য্যবশতঃ মিত্র হইয়াছিলে। এক্ষণে সেই কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে তুমিও পূর্ব্ববৎ শত্রু হইয়াছ। অতএব বল দেখি, আমি এইরূপ নীতিশাস্ত্র সম্যক্ অবগত হইয়া তোমার আহারের নিমিত্ত কি প্রকারে পাশমধ্যে প্রবেশ করিব?

আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, আমাকে ভক্ষণ করা ব্যতিরেকে তোমার আর কোন অভিসন্ধি নাই। আমি ভক্ষ্য, তুমি ভক্ষক: আমি দুর্ব্বল, তুমি বলবান্; সুতরাং আমাদিগের উভয়ের সন্ধিস্থাপন কি প্রকারে পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত হইতে পারে? তুমি ক্ষুধাতুর হইয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই পাশবদ্ধ হইয়াছিলে, এক্ষণে পাশমুক্ত হইয়া ক্ষুধায় পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক কাতর হইয়াছ। তোমার আহারের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং কৌশলক্রমে আমাকে ভক্ষণ করাই তোমার অভিসন্ধি, সন্দেহ নাই। আর যদিও তোমার আমাকে ভক্ষণ করিতে অভিলাষ না থাকে, তথাপি তোমার সহিত সন্ধিস্থাপন ও তোমার শুশ্রূষাগ্রহণে অনুমোদন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তোমার পুত্রকলত্র সমুদয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা সকলেই তোমার নিতান্ত প্রিয়। উহারা আমাকে সমভিব্যাহারী দেখিয়া কি নিমিত্ত

ভক্ষণ করিতে বিরত হইবে? অতএব আমি আর তোমার সহিত সংস্রব রাখিব না। সংস্রব রাখিবার কারণ অতিক্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি যদি কৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে আমার শুভানুধ্যান কর।

এক্ষণে তোমার মঙ্গল হউক; আমি চলিলাম। তোমাকে দূর হইতে দেখিয়াও আমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইতেছে। অতএব আমি কিছুতেই তোমার সহিত সংস্রব রাখিব না। তুমি এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও। আর যদি তুমি কৃতজ্ঞ হইতে বাসনা কর, তবে আমি অনবহিত থাকিলে কদাচ আমার অনুসরণ করিও না। বলবান্ ব্যক্তির সহিত দুর্ব্বলের সংস্রব কদাচ প্রশংসনীয় নহে। ভয়ের কারণ অতিক্রম হইলেও বলবান্ ব্যক্তি হইতে সততই ভয় করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে যদি আমা হইতে তোমার অন্য কোন হিতসাধনের উদ্দেশ্য থাকে, তবে বল, সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিব। আমি আত্মপ্রদান ব্যতিরেকে আর সমস্ত বস্তুই প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। লোকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত পুত্র, কলত্র, রাজ্য ও ধন প্রভৃতি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অধিক কি, সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও আত্মরক্ষা করা উচিত। আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত শত্রুহস্তে যে সমস্ত ধনরত্ন প্রদান করা যায়, জীবিত থাকিলে পুনর্ব্বার তৎসমুদয় হস্তগত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আত্মসমর্পণ করিলে ধনরত্নের ন্যায় উহা পুনরায় হস্তগত হয় না। যাহারা আত্মরক্ষায় তৎপর ও বিমৃষ্যকারী, তাঁহারা কদাচ আত্মদোষজ আপদে আক্রান্ত হয় না। যে সমস্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি আপনার শত্রুর বলবত্তা অবগত হইতে পারে, তাহাদিগের শাস্ত্রার্থদর্শিনী সুদৃঢ় বুদ্ধি কদাচ বিচলিত হয় না।

মূষিক বিড়ালকে এইরূপে ভর্ৎসনা করিলে, বিড়াল যার-পর-নাই লজ্জিত হইয়া তাহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল,—মূষিক! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। মিত্রের অনিষ্টাচরণ করা অতিশয় গর্হিত কার্য্য সন্দেহ নাই। তুমি যে আমার হিতানুষ্ঠানে নিরত, তাহা আমি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। এক্ষণে আমি যে তোমার অনিষ্ট আচরণ করিতে বাসনা করিতেছি, এরূপ আশঙ্কা করা তোমার উচিত নহে। তুমি আমার প্রাণদান করিয়াছ বলিয়া তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। আমি ধর্ম্মপরায়ণ, গুণজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, মিত্রবৎসল, বিশেষতঃ এক্ষণে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি। অতএব আমা হইতে তোমার যে অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা কি সম্ভবপর হয়? তুমি আজ্ঞা করিলে আমি সবান্ধবে প্রাণ পর্য্যন্ত

পরিত্যাগ করিতে পারি। অতএব আমার সদৃশ মনস্বীর প্রতি বিশ্বাস করা তোমার অতীব কর্ত্তব্য। তুমি আমার প্রতি কিছুতেই আশঙ্কা করিও না।

মার্জার এইরূপে স্তব করিলেও মূষিক গম্ভীরভাবে তাহাকে কহিল, লোমশ, তুমি সাধু ; তুমি যে সমস্ত কথা কহিলে, আমি তাহা সমুদয়ই শ্রবণ করিলাম। কিন্তু পণ্ডিতেরা কহেন, যে ব্যক্তি নিতান্ত প্রিয়, তাহার প্রতিও বিশ্বাস করিবে না। অতএব তুমি আমাকে স্তবই কর, আর ধনই দেও, কিছুতেই আমার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বার্থসাধন ব্যতীত কদাচ শত্রুর বশীভূত হয়েন না। এই বিষয়ে সুধীগণ শত্রুর যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তুমি তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া সতত সাবধানে অবস্থান করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। অবিশ্বস্তের প্রতি ত কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিবে না ; বিশ্বস্তের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস করাও কর্ত্তব্য নহে। যত্নসহকারে অন্যের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, কিন্তু অন্যকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। অতএব সকলের প্রতিই সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া সকল অবস্থায় যত্নসহকারে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষা করিতে পারিলে পরিশেষে ধনপুত্রাদি সমুদয়ই লাভ হইয়া থাকে। অন্যের প্রতি অবিশ্বাসই নীতিশাস্ত্রকারদিগের সার মত। সুতরাং অন্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে আপনার যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইয়া থাকে। যাহারা কাহারও প্রতি বিশ্বাস না করে, তাহারা দুর্ব্বল হইলেও শত্রুগণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে না। আর যাহারা সকলের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, তাহারা বলবান্ হইলেও দুর্ব্বল শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইতে পারে। হে মার্জার! তুমি আমার অবিশ্বস্ত শত্রু, সুতরাং তোমা হইতে আত্মরক্ষা করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। মূষিক এই কথা কহিলে মার্জার চণ্ডালের ভয়ে ভীত হইয়া শাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিল। তখন মূষিকও স্বীয় শাস্ত্রতত্ত্ব অনুসারী বুদ্ধিসামর্থ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক এক বিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

হে ধর্ম্মরাজ! এইরূপে বুদ্ধিমান্ মূষিক একান্ত দুর্ব্বল হইয়াও প্রজ্ঞাবলে মহাবলপরাক্রান্ত বহুসংখ্য শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। অতএব সুচতুর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে। দেখ, মূষিক ও মার্জার পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর অনায়াসে মুক্তিলাভ করিল।

—কালীপ্রসন্ন সিংহ

ঐহিক অমরতা

পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান। পর্ব্বতে উচ্চতা আছে, নদীর তরঙ্গে শোভা আছে, নদীপ্রবাহ-সম্মিলিত সমুদ্রের বক্ষে অনির্ব্বচনীয় বিস্তার আছে ; ফুলে মধু, ফুলভরাবনত লতাদেহে মাধুরী এবং লতায় আকণ্ঠ-বিসর্পি-বেষ্টনবদ্ধ অচল-পাদপে গরিমার এক অপূর্ব্ব বিলাস-ভঙ্গী আছে। কবি অথবা ভাবুকের চক্ষু লইয়া দেখিতে হইলে, দেখিবার এইরূপ কত বস্তুই যে চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে? আবার মানুষীশক্তির জয়স্তম্ভ দেখিতে হইলে নগর, উপনগর, দুর্গ, সেতু, জল-যান, স্থল-যান, ব্যোম-যান, আগ্রার তাজ এবং মিসরের পিরামিড প্রভৃতি কতই না মনুষ্যচক্ষুর সন্নিহিত হইতেছে! কিন্তু দৃশ্য পদার্থের গূঢ় গৌরব ভাবিয়া দেখিলে, তথাপি ইহাই পুনঃ পুনঃ বলিতে ইচ্ছা হয় যে, পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান। এ দুয়ের তুলনা নাই। জলে যেমন জলবুদ্বুদের উদয় ও প্রলয় হইতেছে, বসুন্ধরার বক্ষঃস্থলরূপ বিশাল নিকেতনে, সূতিকা ও শ্মশানের প্রকোষ্ঠদ্বয়েও, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি নিমেষে, সেইরূপ অসংখ্য প্রাণীর উদয় ও বিলয় অথবা আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে। যে ছিল না, সে আসিতেছে। যে ছিল, সে চলিয়া যাইতেছে।

জন্মমৃত্যুর এই আবর্ত্তগতি গাঢ়রূপে চিন্তা করিলে মনে আপনা হইতেই দুইটি গভীর প্রশ্নের উদয় হয়। প্রথম প্রশ্ন এই,—যাহারা এই জগতে নূতন প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহারা কোথা হইতে আসিল?

এই প্রশ্নের সহিত সৃষ্টিবিজ্ঞান, বিবর্ত্তবাদ, জন্মান্তরতত্ত্ব এবং পরমার্থ-বিদ্যার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমরা এই হেতু সম্প্রতি ইহার সন্নিহিত হইব না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে,—যাহারা যায়, তাহারা কোথায় যায়? মৃত্যু তাহাদিগের নির্ব্বাণ, না তিরোধান? মৃত্যুর পর তাহাদিগের আর কিছু থাকে

কি? যাহাদিগের সুকুমার তনু সমাধির ক্রোড়ে কিংবা শ্মশানানলে উৎসর্গ দিয়া আসিলে, এই জগতের সহিত তাহাদিগের আর কোন সম্বন্ধ রহিল কি? এত আশা, এত ভালবাসার এই কি শেষ?

বিজ্ঞানের নিকট এই ভয়াবহ প্রশ্নের উত্তর নাই। বিজ্ঞান সমাধির মৃত্তিকা তুলিয়া অশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে; যে চলিয়া গিয়াছে, সেই মৃত্তিকায় তাহার কোন চিহ্ন পায় নাই। বিজ্ঞান শ্মশানের ভস্মরাশিকে বিবিধ যন্ত্রযোগে রেণু রেণু বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছে: সেই ভস্মরাশির মধ্যে ভস্ম বই আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। বৈজ্ঞানিকের এক চক্ষু দূরবীক্ষণ, আর চক্ষু অণুবীক্ষণ, যাহা দূরবীক্ষণে দেখা যায় না এবং অণুবীক্ষণেও অনুমেয় হয় না, প্রত্যক্ষবাদী বৈজ্ঞানিক তাহা মানিবে কেন? সুতরাং বৈজ্ঞানিকের নিকট শ্মশানের পরপার অন্ধকার! তবে বিজ্ঞানের কাছে সেই অন্ধকারের মধ্যেও এই একটু মাত্র আলোকের আভা পাওয়া যায় যে, এ জগতে কিছুরই বিনাশ নাই। যেখানে একদিন পাহাড় ছিল, সেখানে আজ সমুদ্র। যেখানে একদিন সমুদ্র ছিল, সেখানে আজ পাহাড়। আপাততঃ দেখিতে গেলে পাহাড় ও সমুদ্রের ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞান ইহা জানে যে, যে সকল পরমাণু পাহাড় ও সমুদ্রের উপাদান ছিল, তাহারা জগদ্‌যন্ত্রের চক্রের সঙ্গে বিঘূর্ণিত হইয়া অদ্যাপি অবিনশ্বর রহিয়াছে।

মনুষ্যের হৃদয়, প্রথমে বিজ্ঞানের কিছুমাত্র অপেক্ষা না রাখিয়া, পরে বিজ্ঞানের নীরস কঠোর বাদবিতর্কে সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষা দেখাইয়া, কখনও আশার অর্দ্ধস্ফুট আলোকে, কখনও কল্পনার অস্ফুট অথচ কমনীয় জ্যোৎস্নায়, কখনও মমতার প্রণোদনে, কখনও বিবেকের তাড়নায়, এবং সৌভাগ্যবশতঃ কোন কোন স্থলে সূক্ষ্মালোকদর্শিনী ভক্তির সুমধুর সান্ত্বনায়, নানাভাবে এই প্রশ্নের নানাবিধ মীমাংসা করিয়াছে; এবং সেই সকল মীমাংসাকে ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপন করিয়া সমগ্র মনুষ্যজাতিকে সেখানে আসিয়া আশ্রয় লইবার জন্য 'মা ভৈষীঃ' বলিয়া আহবান করিতেছে। আভাসেই ইহা উপলব্ধ হইবে যে, সে মীমাংসার শেষ স্থল স্বর্গ,—শেষ লক্ষ্য পরকাল। তুমি ভালবাসিয়া বঞ্চিত হইয়াছ, পরকালে তোমার বিচার হইবে; আর তুমি বঞ্চনার অভিলাষে ভালবাসার বাগুরা বিস্তার করিয়াছ, তুমিও পরকালে ন্যায়ের বিচার দেখিবে।

ইতিহাস অথবা মানবজাতির স্মৃতি তৃতীয় একপ্রকারে প্রস্তাবিত প্রশ্নের উত্তর করিতেছে, এবং উহা মনুষ্যের আত্মাকে বিজ্ঞানের ন্যায় অন্ধকারে না ডুবাইয়া এবং হৃদয়োদ্ভুত আশার ন্যায় লোকান্তরের অপার্থিব জগতেও প্রেরণ না করিয়া ইহলোকেই অমরতার আশ্বাস দিতেছে। কিন্তু আমরা যে কারণে মনুষ্যের উৎপত্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধেও কিছু বলিতে যাই নাই, মনুষ্যের আধ্যাত্মিক পরকাল-সম্বন্ধেও আমরা সেই কারণেই কিছু বলিব না। মনুষ্য ইতিহাসের অভ্রান্ত আলোকেও শ্মশানের পরপারে কিছু দেখিতে পায় কিনা, শুধু ইহাই এক্ষণে আমাদিগের আলোচনার বিষয়।

ইতিহাস কি বলিতেছে? যাহা স্মৃতি, প্রীতির উচ্ছ্বাসে সর্ব্বত্র বলিয়া বলিয়া অবসন্ন হয়, ইতিহাসও শৈলশৃঙ্গসমারূঢ় সর্ব্বদর্শী সিদ্ধ-যোগীর ন্যায়, গভীর অথচ মোহন স্বরে, সেই কথাই দিনে নিশীথে সর্ব্বত্র বলিতেছে,--

'আমি ভুলি না।'

যেখানে যোদ্ধা, একদিকে মৃত্যুর করাল গ্রাস, আর একদিকে শান্তির কণ্টকশূন্য কোমল শয্যা, এই দুইয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ ভাবিতেছে, ইতিহাসের মধুর বংশী তখন তাহার কর্ণকুহরে অতি মধুর স্বরে এই বলিয়া তাহাকে উন্মাদিত করিতেছে যে,--'আমি ভুলি না।' যেখানে স্বদেশবৎসল মহাপুরুষ একদিকে আপনার সুখ, আর একদিকে স্বজাতির সমৃদ্ধি কি স্বাধীনতা, এই দুইয়ের মধ্যস্থলে সংস্থাপিত হইয়া বালা ইফিজিনিয়া কিংবা বৃদ্ধ রেগুলসের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেছে, ইতিহাসের মধুর বংশী তাহাকেও তখন এই কথা বলিয়াই উন্মাদিত করিতেছে যে,—'আমি ভুলি না।' যাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের সেবক, তাঁহারা ইতিহাসের এই কথা শুনিয়াই আশ্বস্ত আছেন--'আমি ভুলি না।' আর যাঁহারা কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত অথবা অন্যান্য উপায়যোগে হোমার, মিল্টন, ভল্টেয়ার কিংবা ভবভূতি প্রভৃতির ন্যায় অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্যের সেবা করিতেছেন, তাঁহারাও অবসাদের অসংখ্য কারণ সত্ত্বেও ইতিহাসের এই কথা শুনিয়াই সতত উদ্যম ও উৎসাহে পরিপূর্ণ রহেন,—'আমি ভুলি না।'—'আমি ভুলি না।'

ইতিহাসের অস্তিত্ব কোথা হইতে?—কেন? মনুষ্য মনুষ্যকে ভুলে না, এই জন্যই মনুষ্যের ইতিহাস। মনুষ্য মনুষ্যকে ভালবাসে, এই জন্যই মনুষ্যের ইতিহাস। আর, যাহাকে ভালবাসে, মনুষ্য সকল সময়েই তাহার গুণগান ও নামকীর্ত্তন করিতে চাহে! এই জন্যই মনুষ্যের ইতিহাস। ইতিহাস এই নিমিত্ত সকলকেই সমান আদরে এই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে যে,—পৃথিবীর যেখানে যে থাক, মানস-কুসুমের সৌরভ ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া মনুষ্যের মনোমোহনে যত্নশীল হও, 'আমি ভুলিব না।' পৃথিবীর যেখানে যে থাক, মনুষ্যের উচ্চতর আদর্শ এবং মানুষীশক্তির শ্রেষ্ঠতর বিকাশ দেখাইয়া মনুষ্যকে উন্নতি হইতে উচ্চতর উন্নতিতে লইয়া যাও, 'আমি ভুলিব না'—এবং পৃথিবীর যেখানে যে থাক, মনুষ্যকে ভালবাস, মনুষ্যের পরিচর্য্যা কর,—মনুষ্য-হিতে ব্রতী হও এবং মনুষ্যের সুখ-বর্দ্ধন ও মঙ্গল-সাধনে স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখাও, এই সৃষ্টি যতকাল রহে, ততকাল ইহা আমি মনে রাখিব—'আমি ভুলিব না।'

ইহার নাম ঐহিক অমরতা এবং ইতিহাস যাঁহাদিগকে ভুলে না,—যাঁহাদিগের জীবনস্রোতের গতি ঐতিহাসিক স্মৃতির সহিত এইরূপে মিলিত হয়, যাঁহাদিগের হৃদয়-মনের প্রতিকৃতি ইতিহাসের স্মৃতিপটে এইভাবে লিখিত হইয়া রহে, তাঁহারাই সেই অমরতার আশ্রয়-পুরুষ। তাঁহারা মরিয়াও মরেন না, তাঁহারাই এই মরভূমিতে অমর। বিপ্লবের পর বিপ্লব এবং রাজ্য ও সমাজ লইয়া বিঘট্টনের পর বিঘট্টন হইয়া যায়, পুরাতন সৃষ্টি নূতন হয়; কিন্তু সেই সুকৃতিশালী সার্থকজন্মা মহাত্মারা বিপ্লব ও বিঘট্টনের অনন্ত ঝটিকার মধ্যেও চিরদিনই নূতন জীবন ও নূতন যৌবনে অমর রহেন।

কালিদাস মরিয়া গিয়াছেন, না বৃদ্ধ হইয়াছেন? তুমি যখন্ ভ্রমর-ভয়-ব্যাকুলা বিলাস-চঞ্চলা শকুন্তলার সেই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল মধুর লীলা দেখিয়া আনন্দে উদ্বেল হও, কালিদাস তখন তোমার পার্শ্বচর ও প্রিয়তম বয়স্য। এবং যখন তুমি হিমাদ্রির উচ্চতম প্রস্থে কল্পনার মনোহর রথে আরোহণ করিয়া যোগিকুলধ্যেয় মহাযোগী মহেশ্বরের সেই 'নিবাত-নিষ্কম্প' ধীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কর, তখন কালিদাস আর তোমার বাহিরে নহেন। তখন কালিদাস তোমার অন্তরে-বাহিরে, অন্তরের অন্তরে—আত্মার অভ্যন্তরে। তখন তোমার জীবন কালিদাসময়।

বনের বিহঙ্গ বন-তরুর শাখার উপর নিস্তব্ধ বসিয়া রহিয়াছে, ভয়ে শব্দ করে না, বনচর মৃগাদি জন্তু চিত্রার্পিতবৎ স্ব স্ব স্থলে স্থির রহিয়াছে, ভয়ে পাদচারণা কিংবা মুখের অর্দ্ধাবলীঢ় শষ্প গলাধঃকরণ করিতে সাহস পায় না; অদূরে বসন্তপুষ্পাভরণা বিলোল-নয়না উমা, হরবদ্ধলক্ষ্য মূর্ত্তিমান কন্দর্প; সেই কাব্যজগতের অদ্বিতীয়, অনির্ব্বচনীয় অতুল তপঃশোভা যখন তুমি মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ কর, তখন কালিদাস আর তোমার বাহিরে নহেন। তখন কালিদাস তোমার অন্তরে-বাহিরে, অন্তরের অন্তরে,—আত্মার অভ্যন্তরে। তখন তোমার জীবন কালিদাসময়। কে বলে যে অযোধ্যা রহিয়াছে, অযোধ্যার রাম নাই। চাক্ষুষ-প্রতীতির লৌকিক জীবনে রাম কেবল অযোধ্যাতেই অবস্থান্ করিতেন, এইক্ষণ পর্য্যন্ত যুগে যুগে জীবিত রহিয়া অসংখ্য নরনারীর প্রাণের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। রামময়-জীবিতা পতিপ্রাণা সীতা একদিন 'হা রাম! হা রাম!' বলিয়া আপনার নয়নজলে ভাসিয়াছিলেন; এইক্ষণ প্রীতির প্রফুল্ল কমলের ন্যায় প্রীতিমুগ্ধ মনুষ্যমাত্রেরই নয়নজলে অহোরাত্র ভাসমান রহিয়া, যেখানে প্রীতির কথা, পবিত্রতার কথা, যেখানে অবলা-জন-স্পৃহণীয় অমল-সৌন্দর্য্যের কথা, সেইখানেই বিরাজমানা হইতেছেন। বাল্মীকি একস্থানে বসিয়া একসময়ে আপনার বীণা বাজাইয়াছিলেন। কিন্তু এইক্ষণ যেখানে সারস্বত-স্বর্গ, সেইখানেই তাঁহার বীণার ঝঙ্কার। যেখানে আনন্দকুঞ্জের আনন্দ উৎসব, সেইখানেই তাঁহার বীণার ধ্বনি,—যেখানে হৃদয় হৃদয়ের সহিত আলাপ করে,—মন মনের সহিত মিলিয়া যায়, আত্মা আত্মার সহিত আপনার বিনিময় করিতে চাহে, সেইখানেই তাঁহার বিশ্বমোহিনী বীণার বিনোদনিঃস্বন। এইরূপ কত অগণিত আত্মা লোকস্মৃতির অমরাবতীকে উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছে, তাহা চাহিয়া দেখ।

যদি অবনীর এই সমস্ত সন্তানও মরিয়া গিয়া থাকেন, তবে কি জীবিত আছি আমরা? আর যদি ইঁহারা সত্য সত্যই অমর হইয়া থাকেন, তবে যে ভাবে ইঁহারা অমর হইয়া আছেন, অমরতার সেই সম্পদ্ কি আকাশ-কুসুম?

ইংলণ্ডের একজন প্রধান রাজপুরুষ জাতীয় স্বাধীনতার পরমসুহৃদ্ রিচার্ড কব্‌ডেনের নাম-স্মরণে পার্লিয়ামেন্ট-ভবনে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—"এই সকল লোক অনুপস্থিত থাকিলেও পার্লিয়ামেন্টের সভাস্থলে নিয়ত উপস্থিত।" আমরাও বলি, যাঁহারা শক্তির প্রসাদাৎ কিংবা সাধনার বলে আপনার জীবনকে বহু জীবনের সহিত মিশাইয়া গিয়াছেন—যাঁহারা জীবনের

অমৃত বিলাইয়া কিংবা আলেখ্য দেখাইয়া মনুষ্যের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে উপরে তুলিয়াছেন, তাঁহারা সশরীরে উপস্থিত না থাকিলেও, আমাদের মধ্যে সতত উপস্থিত। পৃথিবী তাঁহাদিগের তপশ্চর্য্যার পদ্মাসন,- শ্মশান তাঁহাদিগের স্বর্গারোহণের সোপানমঞ্চ।

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ

অনন্ত মুহূর্ত্ত

কালের গতি অবিরাম। কাল কেবল চলিতেছে। কবে কোথায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছে কেহ জানে না, কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু সকলেই দেখে, চলিতেছে- কেবলই চলিতেছে। আবার, শুধু চলিতেছে?—ভীষণ বেগে চলিতেছে।

কাল চলিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে- -অথবা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সঙ্গে লইয়া কাল চলিতেছে। যেন কালের বেগে বেগ প্রাপ্ত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভীষণ বেগে চলিতেছে। একবার যে একস্থানে দুই দণ্ড দাঁড়াইয়া দেখিব কাল কেমন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেমন, তাহাব যো নাই। দাঁড়াইব কেমন করিয়া—আমিও যে কালের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বেগে চলিতেছি। কালের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যাই, আর কত কি দেখি! কিন্তু হায়! এইমাত্র যাহা দেখিয়াছি তাহা আর দেখিতে পাই না—কালের ভীষণ স্রোতে তাহা কোথায় চলিয়া গেল দেখিতে পাই না; আমিই বা কোথায় চলিয়া আসিলাম বুঝিতে পারি না। অতএব কালও দেখিতে পাই না, কালস্রোতে প্রবাহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও দেখিতে পাই না! বড়ই দুঃখ! ক্ষোভের সীমা নাই!

কবি বলেন ক্ষোভ করিও না—তোমার মনের দুঃখ ঘুচাইব। দেখ দেখি—

অত্যুচ্চ অভ্রভেদী হিমালয়ের কোলে শান্ত শব্দহীন সৌন্দর্য্যময় বনপ্রদেশ। তথায় স্বচ্ছ-শুভ্রসলিলা মালিনী নদী নিঃশব্দে প্রবাহিতা—মালিনীর পার্শ্বে পুণ্যবান্ ঋষির পবিত্র আশ্রম। আশ্রম নিস্তব্ধ—যেন যোগীর ন্যায় যোগমগ্ন হঠাৎ বিদ্যুদ্‌গর্ভ বজ্রধ্বনি হইল—

অয়মহং ভোঃ।

হিমাচল, মালিনী, বৃক্ষ, বন, বায়ু, পশু, পক্ষী, ঋষি, ঋষিকুমার, ঋষিকন্যা, সেই গভীর নিস্তব্ধতা—সকলই চমকিয়া উঠিল। কেবল চমকিল না—একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে একটি ক্ষুদ্র বালিকা!

দেখিয়া বজ্রের ক্রোধ বাড়িল। বজ্র হিমাচল, মালিনী, বৃক্ষ, বন, বায়ু, সমস্ত বিদীর্ণ করিয়া গর্জ্জিতে লাগিল -

বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমানসা
তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।।

সব বিদীর্ণ হইল—হইল না কেবল সেই ক্ষুদ্র কুটীরে সেই ক্ষুদ্র বালিকা—বালিকা তখন ব্রহ্মান্ডান্তরে বিলীন। বজ্রও সে বিলীনতা বিদীর্ণ করিতে পারিল না। বালিকা যেমন তাহার ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন, বজ্রও তেমনি সেই বালিকার বিলীনতায় বিলীন হইয়া গেল!

বল দেখি—বালিকার এই বিলীনতায় বজ্রের এই বিলীনতা দেখিলে বিশ্বব্রহ্মান্ড সেই সংযুক্ত বিলীনতায় অনন্তকাল বিলীন হইয়া থাকে কিনা—যে কাল কেবলই চলে, সেই কাল সেই বিলীনতায় অনন্তকাল বিলীন হইয়া থাকে কিনা? বল দেখি—যে মুহূর্ত্তে বালিকার এই বিলীনতায় এই ভীষণ বজ্রকে বিলীন হইতে দেখি, সে মুহূর্ত্ত অনন্ত মুহূর্ত্ত হইয়া যায় কিনা?

সেই কবি সীতা দেবীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি বলিতেছেন শুন—সীতা নিতান্তই রাম লইয়া—সীতা নিতান্তই রাম-সর্ব্বস্ব। সেইজন্যই

সীতা ছায়ার ন্যায় রামের অনুগামিনী—যেখানে রাম, সেইখানেই সীতা— দুঃখ, কষ্ট, বিপদ্ কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। রাজপুরী তুচ্ছ করিয়া সীতা অরণ্য-বাসিনী, অশোকবনে বসিয়া সীতা দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসকুলবিনাশিনী। রাম ব্যতীত সীতা জীবন্মৃতা—রামধ্যান, রামজ্ঞান, রামমাত্র সার। তাই রামের জন্য সীতা ত্রিলোকসমীপে অগ্নিপরীক্ষা দিয়াছেন—তাই আবার হৃদয়ে রামকে ধরিয়া সিংহাসন ছাড়িয়া বনবাসযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। আজ আবার সর্ব্বলোক-সমক্ষে রাম বলিতেছেন—পরীক্ষা দেও। এতও কি সয়? সীতার আর সহিল না! তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি, হৃদয় সকলই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—'যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতি হইতে বিচলিত না হইয়া থাকি, তবে, দেবি বিশ্বম্ভরে! আমাকে অন্তর্হিত কর।' সীতা পতি হইতে বিচলিত হন নাই, কিন্তু আজ দেবতাদের নিকট যাহা চাহিতেছেন তাহা পাইলে তিনি যে তাঁহার পতিকে হারাইবেন, সেই পতিকে যে দেখিতে পাইবেন না, সে জ্ঞান তাঁহার গিয়াছে। ফলে, আজ সীতারূপী ব্রহ্মাণ্ড মেরুদণ্ড হারাইয়া দিক্-হারা, পথহারা, আপন-হারা।

সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্ত্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাম্।
মা মেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ।।

তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত, বসুন্ধরা সীতাকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং রাম "না" "না" ইহা বলিতে না বলিতেই রসাতলে প্রবেশ করিলেন।

"তখন সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত!" ব্রহ্মাণ্ডের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তবুও ব্রহ্মাণ্ড আপন ব্রহ্মকে আগেও যেমন এখনও তেমনি হৃদয় ভরিয়া ধরিয়া রহিয়াছে! এই অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্তকাল স্তম্ভিত। কালস্রোত বিস্ময়ে অচল। এই অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ড একটি অনন্ত মুহূর্ত্ত!

আর একজন কবি কি কহিতেছেন শুন দেখি—

একটি কাল ছোট সুন্দর মেয়ে—নাম ভ্রমর। ভ্রমরটি এমনি ছোট যে বোধ হয় যেন একটি অঙ্গুলির টিপনিতেই মরিয়া যায়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ভ্রমরের ক্ষুদ্র প্রাণে প্রেমের সমুদ্র—অনন্ত, অতলস্পর্শ। সে সমুদ্রের যেখানে খোঁজ—

দেখিবে কেবল গোবিন্দলাল। কিন্তু গোবিন্দলাল পাপী। তাই এই ক্ষুদ্র ভ্রমরের তেজ সিংহ-শার্দ্দূলের তেজ অপেক্ষাও বেশী। গোবিন্দলাল মুষ্টিভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছে—বলিলে তখন সে প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে পারে। তবুও ত রাগ পড়িল না—তেজ কমিল না! এত তেজ এত রাগ দেখিলে যেন রাগ হয়।

কিন্তু ইহাই বা কি দেখিলে? দেখিবে ত এইবার দেখ। ক্ষুদ্র ভ্রমরের অন্তিমকাল উপস্থিত। ভ্রমর এখন গোবিন্দলালের জন্য লালায়িত—একটিবার মাত্র গোবিন্দলালকে দেখিবার জন্য ছট্ ফট্ করিতেছে। গোবিন্দলাল দেখা দিতে আসিয়াছে—আপনি আসে নাই, ডাকিয়া আনিয়াছে তাই আসিয়াছে। ভ্রমর সে কথা শুনিয়াছে। গোবিন্দলালকে দেখিয়া ভ্রমরের মৃত্যু-যন্ত্রণা ঘুচিয়া গেল—ভ্রমরের সাত বৎসরের হৃদয়াগ্নি নিভিয়া গেল—ভ্রমরের ইহকাল পরকাল সার্থক হইল। তবুও ভ্রমর বলিল—আশীর্ব্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে সুখী হই—বলিয়া ভ্রমর মরিয়া গেল! ভ্রমরের উপর এত যে রাগ হইয়াছিল তাহা কোথায় চলিয়া গেল! ভ্রমরের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু হৃদয়ে যত দুঃখ উপজিল, হৃদয় তাহার সহস্রগুণ বিস্ময়ে পূরিয়া গেল। যে গোবিন্দলালকে না দেখিতে পাইয়া ভ্রমর আজ মৃত্যুশয্যায়, সেই গোবিন্দলালকে এ-হেন মৃত্যু-মুহূর্ত্তে ইহজন্মের মতন একটিবার দেখিতে পাইয়াও ভ্রমর বলিল কিনা—যেন জন্মান্তরে সুখী হই! এ সেই আগেকার মতন কাটা কাটা কথা নয় বটে, এ কাতরতার কথা। কিন্তু ইহাতেও ত সেই আগেকার কঠোরতা আছে। একথা শুনিলে কান্না পায় বটে, কিন্তু একথাও যে পাপীর কাছে তাহার পাপের কথা, পাপীর প্রতি পাপের জন্য তিরস্কারের কথা। মিছরির ছুরি যাহাকে বলে, এ কথা যে তাহাই। ভ্রমরের সব ভাঙিগয়াছে। • অস্থি, মস্তিষ্ক, দেহ, মন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব ভাঙিগয়াছে। কিন্তু সে গোবিন্দলালও ভাঙেগ নাই, গোবিন্দলালের প্রতি সে কঠোরতাও ভাঙেগ নাই।

বল দেখি—এই বিষম দৃশ্য দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইয়া যায় কিনা, কালস্রোত থমকিয়া দাঁড়ায় কিনা। এখন বুঝিলাম ভ্রমরের রাগ, ভ্রমরের তেজ—দর্পও নয়, অহঙ্কারও নয়, প্রেমের অভিমান ও পুণ্যের কঠোরতা! আর সে অভিমান কি?—না, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না বলিয়া, ভালবাসার পাত্রকে পাপ স্পর্শ করিল বলিয়া মরমের যন্ত্রণা।

সে যন্ত্রণা কিছুতেই ঘুচে না, ঘুচে কেবল অসম্পূর্ণকে পূর্ণ দেখিলে—পাপীকে নিষ্পাপ দেখিলে। গোবিন্দলাল অসম্পূর্ণ বলিয়া, মরিতে মরিতেও ভ্রমর তাই তাহার প্রতি তেমনি কঠোর। পুণ্যের কঠোরতা বিষম কঠোরতা—এতটুকু অসম্পূর্ণতা থাকিতে পুণ্যের কঠোরতা যায় না। পুণ্য দেয়ও ষোল আনা, চায়ও ষোল আনা, কড়াক্রান্তিটিও ছাড়ে না। লেশমাত্র পাপ বা অসম্পূর্ণতা থাকিতে প্রেমময় ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ভ্রমরের এই বিষম কঠোরতা সেই প্রেমময়ের কঠোরতা। কিন্তু সে কঠোরতা কেবলই কঠোর নয়—সে কঠোরতা করুণে-কঠোর। অসম্পূর্ণতা যন্ত্রণার কারণ বলিয়া পুণ্য অসম্পূর্ণতার প্রতি এত কঠোর। পুণ্যের কঠোরতা করুণে-কঠোর। তাই আজ পুণ্যবতী গোবিন্দলালকে আপনার যন্ত্রণার কথা বলিয়া তাহার আশীর্ব্বাদ লইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁদাইয়া চলিয়া গেল। ধর্ম্ম বুক খুলিয়া আপন যন্ত্রণা দেখাইয়া বলিয়া গেল, পৃথিবীর যন্ত্রণা ঘুচাইও—পূর্ণ হইবে ও পূজ্য হইবে। তাই দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অনন্তকাল বিস্মিত ও ভক্তিপূর্ণচিত্তে সাশ্রুনয়নে ভ্রমরের পূজা করিল আর স্বয়ং কাল যেন তাহা দেখিবার জন্য অনন্তকাল দাঁড়াইয়া রহিল। ভ্রমরের ঐ মৃত্যু-মুহূর্ত্ত সত্যই একটি অনন্ত মুহূর্ত্ত!

এইরূপে আমাদের কবিগণ কালের গতি রোধ করেন এবং অনন্তকালকে মুহূর্ত্তকালে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। কালের ভঙ্গীভ্রূকুটী-আদি নষ্ট করিয়াই তাঁহারা কালকে বাঁধিয়া ফেলেন। তাঁহারা দেখেন যে ঈশ্বরের কাছে কালের ভ্রূকুটীভঙ্গী কিছুই নাই। ঈশ্বর অনন্তকালেও যাহা, মুহূর্ত্ত-কালেও তাই। ঈশ্বর অনন্ত মুহূর্ত্ত। সেই চরমাদর্শ শির'পরি রাখিয়া তাঁহারা সাহিত্যে অনন্ত মুহূর্ত্ত সৃষ্টি করেন,—বুঝি বা তাঁহাদের ইচ্ছা যে মানুষ যেন এতই উচ্চ, এতই ঈশ্বরসদৃশ হয় যে কালে তাহার বিপর্য্যয় না ঘটে, আর যখনি তাহাকে দেখা যায় তখনি তাহাকে যেন পূর্ণ দেখা যায়—তখনি যেন তাহার সমস্তটা দেখা যায়। কবির সাহিত্য বড় জিনিষ। কবির কাহিনী বড়ই গূঢ়। ব্রহ্মাণ্ডের মহাকবির উপাসক না হইলে কবির সাহিত্য কবির কাহিনী বুঝা ভার।

চন্দ্রনাথ বসু

গগন-পটুয়া

গগন-পটোকে তোমরা সকলেই দেখিয়াছ : পথে ঘাটে দাঁড়াইয়া কতবারই দেখিয়া থাকিবে। কিন্তু তোমরা সকলে তাহার গুণাগুণ জান না, তাই আমাদিগকে আজ তোমাদের কাছে সেই পরিচিতের পরিচয় দিতে হইতেছে।

কারিগর লোক প্রায়ই একটু খাম্‌খেয়ালি হয় ; কেহ বদ্‌ মেজাজের উপর খাম্‌খেয়ালি, আর কেহ বা রস্‌ক্ষেপার উপর খাম্‌খেয়ালি। কিন্তু গগন-পটোর মত খাম্‌খেয়ালি রস্‌ক্ষেপা লোক আর দুনিয়ায় নাই। সে কখনও কাহারও ফরমাস্‌ মত চিত্র করে না! আপনার মনে আপনার ঝোঁকে নিয়তই আঁকিতেছে, আর পুঁছিতেছে ; কিন্তু যখন যেটা দাঁড় করাইবে, সেটা একেবারে চূড়ান্ত। যেমন রং তার তেমনি 'শেড্‌' ; যেমন ভাব-ভঙ্গি, তেমনি অঙ্গ-সৌষ্ঠব! তাহাতেই বলিতেছিলাম, গগন-পটো খাম্‌খেয়ালি বটে, কিন্তু মস্ত কারিগর।

তবে গগনের অনেক সময় সময়-অসময়-বোধ নাই। প্রথম আলাপে সেই জন্য গগনের উপর বড়ই বিরক্ত হইতে হয় ; কিন্তু তাহার পর ঘনিষ্ঠতা হইলে বুঝা যায়, লোকটা অসাময়িক হইলেও বদ্‌রসিক নহে ; রস্‌ক্ষেপা বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তরে লুকানো ছাপানো সহৃদয়তা বিলক্ষণ আছে। তবে সহিষ্ণুতা না থাকিলে, ঘনিষ্ঠতা না হইলে তাহার সেই ভাবটুকু কিন্তু বুঝিয়া উঠা ভার।

তুমি স্বজনের সদ্যোনাশে শোকে জর্জ্জর, সংসার আঁধার দেখিতেছ, থাকিয়া থাকিয়া তলদেশে মেদিনী ঘুরিতেছে, বাতাসে হুহু করিয়া সেই স্বজনের নাম ধ্বনিত হইতেছে, বুকের ভিতর বামদিকে কে যেন কীলক পুঁতিয়া দিয়াছে,—ঘোরতর বিষাদে তুমি অবসন্ন হইয়াছ। আকুলস্বরা কুলকুলনাদিনী কল্লোলিনীর তীরে তুমি অবসাদে উপবিষ্ট হইয়া আছ। দূরে গগন-পটোর চিত্রপটে তোমার দৃষ্টি পড়িল। সে যেন তোমাকেই ভুলাইবে বলিয়া রং ফলাইয়া বসিয়া ছিল ; তুমি চাহিবামাত্রই অমনই তাড়াতাড়ি পরিষ্কার পটে আঁকিতে বসিয়া গেল। শোকগম্ভীর হৃদয়

সহজেই এক-মনস্ক হয়,—তুমি একমনে সেই অপূর্ব্ব চিত্রণ দেখিতে লাগিলে। তোমার সেই স্বজনের সৌম্যমূর্ত্তিই বা আঁকিবে! কিন্তু তা'ত নয়!—ভীষণ-দংষ্ট্র একটা বিষম ব্যাঘ্র কাহাকে যেন কামড়াইয়া রহিয়াছে। তোমার বোধ হইল, সেই ব্যাঘ্র-দষ্ট ব্যক্তিই যেন তোমার স্বজন। তোমার বুকের শেল কে যেন নাড়িয়া দিল, তোমার মর্ম্ম-জ্বালা হইল,—গগন-চিত্রকরকে মহানিষ্ঠুর স্থির করিয়া মহাবিরক্ত হইলে।

তুমি মুখ ফিরাইবে, এমন সময় চকিতের মধ্যে দেখিলে যে, চিত্রপটে আর সে ভয়ানক ব্যাঘ্র নাই, তোমার সেই ভূপাতিত বন্ধু সৌম্যমূর্ত্তিতে গগনের পট শোভা করিতেছেন, আর একখানি সুন্দর হস্ত যেন তাঁহাকে আস্তে আস্তে কোথায় মন্দ মন্দ লইয়া যাইতেছে। তোমার প্রাণ যেন একটু শীতল হইল, তুমি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে ; ভাবিলে, গগন-পটো ক্ষেপা হউক, আর যাই হউক—মনের কথা বুঝিতে পারে,—পোড়া মন একটু শীতল করিতে পারে। মনে যদি একবার ধারণা হয় যে, লোকটা সহৃদয় এবং তোমার ব্যথার ব্যথী, তাহা হইলেই তাহাকে ভালবাসিতে হয়। আর হৃদয় যখন শোকে তাপে গম্ভীর, তখন সেই ভালবাসাও এক দিনে—এক মুহূর্ত্তে প্রগাঢ় হইয়া পড়ে। তুমি অন্তরের অন্তরে বুঝিলে যে, গগন তোমার ব্যথার ব্যথী, অমনই যেন তাহার উপর তোমার একটু ভালবাসা জন্মিল। তুমি নদীতীরস্থ শষ্পশয্যায় শায়িত হইয়া একমনে, স্থিরনয়নে গগনের খাম্‌খেয়ালির কারিগরি পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলে।

গগন আঁকিল—একটা বৃহৎ কুম্ভীর, সূচল মুখ, কর্কশ গাত্র, কন্টকিত লাঙ্গুল, কপিশ বর্ণ, ভয়ঙ্কর ভঙ্গি—সব ঠিক্‌ঠাক্‌ হুবহু—যেন অগাধ নীল জলে সাঁতার দিতেছে। হঠাৎ কুম্ভীর দ্বিখন্ডীকৃত হইল, গায়ের কাঁটাগুলি তুলার মত ফুলো ফুলো হইল, মুখ-কোণ সংযত হইল, রংটা কেমন একটু ঘোলা ঘোলা হইল। পরক্ষণেই দেখ, দুইটি নিরীহ মেষ পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি সেই নীল প্রান্তরে শনৈঃ শনৈঃ বিচরণ করিতেছে। তুমি ভাবিতেছ, ভয়ঙ্কর কুম্ভীর যমজ মেষশিশু হইল ; ভাবিতে না ভাবিতেই সে চিত্র নাই। সেই মেষদ্বয়ের স্থলে বিচিত্র বর্ণের বৃহৎ এক সদন্ড পতাকা, খর খর বাতাসে যেন ফর্‌ ফর্‌ করিয়া উড়িতেছে। স্বজন-বিয়োগ-চিন্তা তোমার মন হইতে ক্ষণেকের তরে অন্তর্হিত হইল। বিষম রস্‌ক্ষেপা গগন তোমাকে আপনার পাগলামির কীর্ত্তি দেখাইয়া তোমাকে

হাসাইল। তোমার সেই মলিন ম্লান মুখের অধরপ্রান্তে সেই অন্তরের হাসি ঈষৎ দেখা দিল। তুমি অন্তরে বলিলে, পাগলা পটোর ভিতরের কথাটা ঠিক—সংসারের সকলই ত এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল, তা ঐ কেবল স্থাবর চিত্র আঁকিবে কেন?

এই চিন্তায় তুমি অন্যমনস্ক হইয়াছিলে,—দেখিলে সে বিচিত্র নিশান আর নাই,—মৃদু আভায় একটি স্থির চিতা যেন ধীরিধীরি জ্বলিতেছে। সেই চিতার মধ্যে অস্পষ্ট অবয়বে তোমার সেই স্বজনের শবমূর্ত্তি। শবদেহ কিন্তু নিষ্প্রভ নহে, -সূর্য্যাস্ত-কালের পূর্ব্বদিকের পাত্‌লা মেঘের উপর ক্ষীণ রামধনুর ন্যায় একটু হাসি যেন সেই মুখ-প্রান্তে দেখা দিতেছে, চক্ষুর্দ্বয়ের প্রশান্ত শীতল জ্যোতিঃ গগনের চিত্রান্তরে যেন স্থাপিত রহিয়াছে। সে চিত্র গগনের আর এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। স্বর্ণময়ী একটি দিব্যাঙ্গনা সতী-স্বভাব-সুলভ লজ্জায়, অথচ প্রৌঢ়া-প্রোষিত-ভর্ত্তৃকার স্বামি-সমাগমের আগ্রহে এবং বনশোভিনী সদ্যঃকুসুমিতা বসন্ত-লতার প্রফুল্লতা-ভরে সেই চিতার সজীব, সহাস্য শব-দেহটিকে সুকোমল হস্ত-প্রসারণে আহ্বান করিতেছেন। সেই কাঞ্চনময়ী দিব্য মূর্ত্তিতে তুমি তোমার বন্ধুর মৃতা পত্নীর মুখশ্রী লক্ষ্য করিলে;—সেইরূপ পুরু পুরু জোড়া ভ্রূ—যেন তেমনই করিয়াই নীচের দিকে নামানো আছে, সেই স্থির নয়নে যেন তেমনই করিয়াই জ্যোৎস্না মাখানো আছে!

উপর স্তরে দিব্যাঙ্গনা ভাসিয়া ভাসিয়া নিম্নস্তরের চিতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নিম্নস্তরের চিতাও শবদেহ লইয়া দিব্যাঙ্গনার দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল,—কাছাকাছি হইল, তোমার চক্ষুতে জল আসিল; চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলে সে সব আর কিছু নাই,—গগন-পটো নীল পটের এখানে সেখানে কেবল কাঁচা সোণার স্তবক আঁটিতেছে। আর তাহাতে জরদ, ধূমল, পাংশু, কত বিচিত্র রঙের শেড্‌ দিতেছে। তুমি উঠিয়া বসিলে, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে, এবার মুখ ফুটিয়া বলিয়া উঠিলে,—"গগন সকলকেই জানে,—সকলকেই চেনে; আমরা কিন্তু উহাকে কেহই চিনিতে পারিলাম না। দেখ, আমাদের সকল সংবাদই রাখে, আমরা কিন্তু উহার কিছুই জানি না।"

গগনের কার্য্যসাধন হইয়াছে। তাহার সহিত একবার ঘনিষ্ঠতা করিলেই সে তাহার অস্থাবর পট দেখাইয়া তোমার কিছু-না-কিছু ভাল করিবেই।

হয় তোমার মনের কবাট খুলিয়া দিবে, নয় তোমার শোকে সান্ত্বনা করিবে। কখন হয়ত তোমার আনন্দের সংবর্দ্ধনা করিবে, আবার কখন হয়ত তোমাকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করিবে। আজ সে তোমার শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করিয়াছে, তোমার মাথা হাল্‌কা হইয়াছে বটে,—এখন আর ঘুরিতেছে না ; বাতাস এখনও হুহু করিতেছে—এখনও পিলুরাগিণীতে ভরিয়া আছে, কিন্তু এখন ত আর তোমার বন্ধুর নাম করিয়া কাঁদিতেছে না। বুকে এখনও শেল বিঁধিয়া আছে বটে, কিন্তু তেমন করিয়া আর ত কেহ তাহাকে মোচড় দিতেছে না। গগনের কার্য্যসমাধা হইয়াছে। গগন তোমার শোকবহ্নির প্রখরতা নষ্ট করিয়াছে। তুমি এবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া দেখিলে, পশ্চিমের দিক্‌চক্রবাল ব্যাপিয়া ঘন-সন্নিবেশিত শাল-বিটপাচ্ছাদিত পর্ব্বতবেদীর উপরি জ্বলন্ত কাঞ্চনরাগে এক অপূর্ব্ব প্রতিমা দীপ্তি পাইতেছে। গগন-পটোর সেই এক প্রিয় প্রতিমা। মাস মাস ধরিয়া প্রত্যহই আঁকে, আর প্রত্যহই পুঁছিয়া ফেলে,—বিরক্তিও নাই তৃপ্তিও নাই।

ঐ প্রতিমা একখানি আশ্চর্য্য ছবি। গগন-পটো প্রায়ই প্রত্যহ আঁকে, আর আমরাও ত প্রায়ই প্রত্যহ দেখি, তবু নিত্যই নূতন। পুরাণের পুরাণ মহাপুরাণকে নূতন করিয়া দেখাইতে গগন-পটো যেমন পটু, এমন আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু কেবল তাই বলিয়া যে পশ্চিমের প্রতিমা আশ্চর্য্য ছবি, তাহা নহে। ও এক আজগুবি কাণ্ড।—মুখ নাই অথচ দেখ কেমন হাসিতেছে। চোখ নাই, ভ্রূ নাই—তবু দেখ কেমন চোখ রাঙ্গাইয়া ভ্রূকুটি করিয়া রহিয়াছে। আর আশ্চর্য্যের আশ্চর্য্য—ঐ মধুর হাসিতে আর ঐ ভীষণ ভ্রূকুটিতে দেখ দেখি কেমন মাখামাখি, কেমন মেশামিশি। পৌরাণিকী অন্ধকারময়ী কালীমূর্ত্তিতে একবার প্রসন্নাং স্মিতাননাং করালবদনাং দেখিয়াছ, আর একবার গগন-পটোর ঐ জ্বলন্ত চিত্রে ললিতে-ভৈরবে, কোমলে-ভীষণে অপূর্ব্ব মিলন দেখ। ঐ দেখ কেমন অপূর্ব্ব হাসি! ঢল ঢল তপ্ত কাঞ্চনসাগরে যেন অমৃতের লহরী উঠিল। ঐ দেখ কেমন রাগ! ব্রহ্ম-কোপানলে যেন খাণ্ডব-দাহ হইবে। ঐ দেখ নিঃশব্দ, তবু যেন তোমাকে স্বর্গের বার্ত্তা ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিতেছে। চক্ষু নাই, তবু যেন তোমার মনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। আর দেখ, নিশ্চল, সুস্থির—তথাপি যেন হাত তুলিয়া তোমাকে অভয়-দান করিতেছে, আশীর্ব্বাদ করিতেছে। আইস, আমরা প্রণত হই। সঙ্গে

সঙ্গে মহাশিল্পী গগন-চিত্রকরকে নমস্কার করি এবং তাহার ওস্তাদকে একবার দেখাইবার জন্য তাহার কাছে প্রার্থনা করি।

গগন-দাদা! তোমার ক্ষেপামীতে ক্ষান্ত দিয়া একবার আমাদের গুটিকত কথা শুন। গঙ্গার উপর তোমার প্রভাতচ্ছবি, পর্ব্বতপৃষ্ঠে তোমার এই সন্ধ্যার প্রতিমা, প্রাবৃটের সেই ঘনকৃষ্ণ সিংহাসন, নিদাঘের সেই রৌদ্রমূর্ত্তি—ও সকল কারিগরি তোমার অনেকবার দেখিয়াছি। তোমার বিচিত্র পট দেখিয়া অনেকবার জ্বলিয়াছি, পুড়িয়াছি, হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি; কিন্তু ঐ সকল বিচিত্র চিত্রে আত্মহারা হই বটে, অথচ পরমার্থ পাই না, তুষ্টি হইলেও তৃপ্তি হয় না। না দাদা, আর ক্ষেপামী করিয়া আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। তোমার এইসকল ছায়াময়ী প্রতিমার অন্তরস্থ প্রতিমা আমাকে সেই সে দিনের মত আর একবার দেখাও। তোমার সেই বিষম ভেল্কি আর একবার ভাঙ্গিয়া দাও। এই ছায়াবাজীর ছায়াপট একবার ক্ষণ-মুহূর্ত্ত-জন্য সরাইয়া দাও!—আমি আর একবার তোমার সেই নীল, নীল, অতি নীল বাজি-ঘরের অভ্যন্তরস্থ তোমার ওস্তাদকে প্রাণ ভরিয়া দেখি। সে দিন তুমি দেখাইলে বটে, কিন্তু আমি যে কি দেখিলাম, তাহার কিছুই বুঝিলাম না। কোমলের কোমল অতি কোমল বংশীরবে আমার মোহ হইল; নীলমধ্যে অতি নীল দেখিতেছিলাম, সমস্ত জগৎ নীল আভায় প্রতিভাত হইল—আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর তুমি তোমার ছায়াপটে তূলারাশি ছড়াইয়া হাসিতে লাগিলে। না দাদা! তোমার পায়ে পড়ি, এবার আর ও সময়ে ক্ষেপামী করিও না; ভাল করিয়া তোমার ওস্তাদকে একবার দেখাও।

—অক্ষয়চন্দ্র সরকার

ঠাকুর্দা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নয়নজোড়ের জমিদারেরা এককালে বাবু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাবুয়ানার আদর্শ বড়ো সহজ ছিল না। এখন যেমন রাজা রায়বাহাদুর খেতাব অর্জন করিতে অনেক খানা নাচ ঘোড়দৌড় এবং সেলাম সুপারিশের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তখন সাধারণের নিকট হইতে বাবু উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দুঃসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত।

আমাদের নয়নজোড়ের বাবুরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পরিতেন, কারণ পাড়ের কর্কশতায় তাঁহাদের সুকোমল বাবুয়ানা ব্যথিত হইত। তাঁহারা লক্ষ টাকা দিয়া বিড়ালশাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে, একবার কোনো উৎসব উপলক্ষে রাত্রিতে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া সূর্যকিরণের অনুকরণে তাঁহারা সাচ্চা রুপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করাইয়াছিলেন।

ইহা হইতেই সকলে বুঝিবেন সেকালে বাবুদের বাবুয়ানা বংশানুক্রমে স্থায়ী হইতে পারিত না। বহু-বর্তিকা-বিশিষ্ট প্রদীপের মতো নিজের তৈল নিজে অল্পকালের ধুমধামেই নিঃশেষ করিয়া দিত।

আমাদের কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী সেই প্রখ্যাতযশা নয়নজোড়ের একটি নির্বাপিত বাবু। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছিল :—ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে পর নয়নজোড়ের বাবুয়ানা গোটাকতক অসাধারণ শ্রাদ্ধশান্তিতে অন্তিম দীপ্তি প্রকাশ করিয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। সমস্ত বিষয় আশয় ঋণের দায়ে বিক্রীত হইল—যে অল্প অবশিষ্ট রহিল তাহাতে পূর্বপুরুষের খ্যাতি রক্ষা করা অসম্ভব।

সেইজন্য নয়নজোড় ত্যাগ করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসবাবু কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন—পুত্রটিও একটি কন্যামাত্র রাখিয়া এই হতগৌরব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিলেন।

আমরা তাঁহার কলিকাতার প্রতিবেশী। আমাদের ইতিহাসটা তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পিতা নিজের চেষ্টায় ধন উপার্জন করিয়াছিলেন : তিনি কখনো হাঁটুর নিম্নে কাপড় পরিতেন না, কড়াক্রান্তির হিসাব রাখিতেন, এবং বাবু উপাধি লাভের জন্য তাঁহার লালসা ছিল না। সে-জন্য আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমি যে লেখাপড়া শিখিয়াছি এবং নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই আমি পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি -শূন্য ভাণ্ডারে পৈতৃক বাবুয়ানার উজ্জ্বল ইতিহাসের অপেক্ষা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানীর কাগজ আমার নিকট অনেক বেশি মূল্যবান্ বলিয়া মনে হয়।

বোধ করি, সেই কারণেই, কৈলাসবাবু তাঁহাদের পূর্ব-গৌরবের ফেল্‌করা ব্যাঙ্কের উপর যখন দেদার লম্বাচৌড়া চেক্ চালাইতেন তখন তাহা আমার এত অসহ্য ঠেকিত। আমার মনে হইত, আমার পিতা স্বহস্তে অর্থ উপার্জন করিয়াছেন বলিয়া কৈলাসবাবু বুঝি আমাদের প্রতি অবজ্ঞা অনুভব করিতেছেন। আমি রাগ করিতাম এবং ভাবিতাম অবজ্ঞার যোগ্য কে? যে লোক সমস্ত জীবন কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া, নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া, অশ্রান্ত এবং সতর্ক বুদ্ধিকৌশলে সমস্ত প্রতিকূল বাধা প্রতিহত করিয়া একটি একটি রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সমুচ্চ পিরামিড একাকী স্বহস্তে নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি হাঁটুর নীচে কাপড় পরিতেন না বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়!

তখন বয়স অল্প ছিল সেইজন্য এইরূপ তর্ক করিতাম, রাগ করিতাম— এখন বয়স বেশি হইয়াছে এখন মনে করি, ক্ষতি কী! আমার তো বিপুল বিষয় আছে, আমার কিসের অভাব। যাহার কিছু নাই, সে যদি অহংকার করিয়া সুখী হয়, তাহাতে আমার তো সিকি পয়সার লোকসান নাই, বরং সে বেচারার সান্ত্বনা আছে।

ইহাও দেখা গিয়াছে আমি ব্যতীত আর কেহ কৈলাসবাবুর উপর রাগ করিত না। কারণ, এত বড়ো নিরীহ লোক সচরাচর দেখা যায় না। ক্রিয়া-কর্মে সুখে-দুঃখে প্রতিবেশীদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ ছিল। ছেলে হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলকেই দেখা হইবামাত্র তিনি হাসিমুখে প্রিয়

সম্ভাষণ করিতেন—যেখানে যাহার যে কেহ আছে সকলেরই কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তাঁহার শিষ্টতা বিরাম লাভ করিত। এইজন্য কাহারো সহিত তাঁহার দেখা হইলে একটা সুদীর্ঘ প্রশ্নোত্তরমালা সৃষ্টি হইত ;—ভালো তো? শশী ভালো আছে? আমাদের বড়ো বাবু ভালো আছেন? মধুর ছেলেটির জ্বর হইয়াছিল শুনেছিলুম, সে এখন ভালো আছে তো? হরিচরণবাবুকে অনেককাল দেখিনি, তাঁর অসুখ বিসুখ কিছু হয়নি তো? তোমাদের রাখালের খবর কি? বাড়ির এঁয়ারা সকলে ভালো আছেন? ইত্যাদি।

লোকটি ভারি পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। কাপড়-চোপড় অধিক ছিল না, কিন্তু মেরজাইটি চাদরটি জামাটি, এমন কি, বিছানায় পাতিবার একটি পুরাতন র‍্যাপার, বালিশের ওয়াড়, একটি ক্ষুদ্র শতরঞ্চ সমস্ত স্বহস্তে রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া দড়িতে খাটাইয়া ভাঁজ করিয়া আলনায় তুলিয়া পরিপাটী করিয়া রাখিতেন। যখনি তাঁহাকে দেখা যাইত তখনি মনে হইত যেন তিনি সুসজ্জিত প্রস্তুত হইয়া আছেন। অল্প স্বল্প সামান্য আস্‌বাবেও তাঁহার ঘরদ্বার সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত। মনে হইত যেন তাঁহার আরও অনেক আছে।

ভৃত্যাভাবে অনেক সময় ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতি পরিপাটী করিয়া ধুতি কোঁচাইতেন এবং চাদর ও জামার আস্তিন বহুযত্নে ও পরিশ্রমে "গিলে" করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বড়ো বড়ো জমিদারী বহুমূল্যের বিষয়সম্পত্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু, একটি বহুমূল্য গোলাপপাশ, আতরদান, একটি সোনার রেকাবি, একটি রুপার আল্‌বোলা, একটি বহুমূল্য শাল ও সেকেলে জামাজোড়া ও পাগ্‌ড়ি দারিদ্র্যের গ্রাস হইতে বহুচেষ্টায় তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোনো একটা উপলক্ষ উপস্থিত হইলে এইগুলি বাহির হইত এবং নয়নজোড়ের জগদ্বিখ্যাত বাবুদের গৌরব রক্ষা হইত।

এদিকে কৈলাসবাবু মাটির মানুষ হইলেও কথায় যে অহংকার করিতেন সেটা যেন পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্যবোধে করিতেন ; সকল লোকেই তাহাতে প্রশ্রয় দিত এবং বিশেষ আমোদ বোধ করিত।

পাড়ার লোকে তাঁহাকে ঠাকুর্দামশাই বলিত এবং তাঁহার ওখানে সর্বদা বিস্তর লোক সমাগত হইত : কিন্তু দৈন্যাবস্থায় পাছে তাঁহার তামাকের খরচটা

গুরুতর হইয়া উঠে এইজন্য প্রায়ই পাড়ায় কেহ না কেহ দুই একসের তামাক কিনিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিত, "ঠাকুর্দামশাই, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখো দেখি, ভালো গয়ার তামাক পাওয়া গেছে।"

ঠাকুর্দামশাই দুই এক টান টানিয়া বলিতেন "বেশ ভাই, বেশ তামাক।" অমনি সেই উপলক্ষে ষাট পঁয়ষট্টি টাকা ভরির তামাকের গল্প পাড়িতেন; এবং জিজ্ঞাসা করিতেন সে তামাক কাহারো আস্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না।

সকলেই জানিত যে যদি কেহ ইচ্ছা করে তবে নিশ্চয়ই চাবির সন্ধান পাওয়া যাইবে না অথবা অনেক অন্বেষণের পর প্রকাশ পাইবে যে পুরাতন ভৃত্য গণেশ বেটা কোথায় যে কী রাখে তাহার আর ঠিকানা নাই—গণেশও বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইত। এইজন্যই সকলেই একবাক্যে বলিত, "ঠাকুর্দামশাই, কাজ নেই, সে তামাক আমাদের সহ্য হবে না, আমাদের এই ভালো।"

শুনিয়া ঠাকুর্দা দ্বিরুক্তি না করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন। সকলে বিদায় লইবার কালে বৃদ্ধ হঠাৎ বলিয়া উঠিতেন, "সে যেন হোলো, তোমরা কবে আমার এখানে খাবে বলো দেখি ভাই।"

অমনি সকলে বলিত, "সে একটা দিন ঠিক ক'রে দেখা যাবে।"

ঠাকুর্দামশায় বলিতেন, "সেই ভালো, একটু বৃষ্টি পড়ুক, ঠাণ্ডা হোক, নইলে এ গরমে গুরু ভোজনটা কিছু নয়।"

যখন বৃষ্টি পড়িত তখন ঠাকুর্দাকে কেহ তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিত না—বরঞ্চ কথা উঠিলে সকলে বলিত, এই বৃষ্টিবাদলটা না ছাড়িলে সুবিধে হচ্ছে না। ক্ষুদ্র বাসাবাড়িতে বাস করাটা তাঁহার ভালো দেখাইতেছে না এবং কষ্টও হইতেছে এ-কথা তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার সমক্ষে স্বীকার করিত, অথচ কলিকাতায় কিনিবার উপযুক্ত বাড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন, সে বিষয়েও কাহারো সন্দেহ ছিল না—এমন কি আজ ছয় সাত বৎসর সন্ধান করিয়া ভাড়া লইবার মতো একটা বড়ো বাড়ি পাড়ার কেহ দেখিতে পাইল না—অবশেষে ঠাকুর্দামশায় বলিতেন, "তা হোক ভাই, তোমাদের কাছাকাছি আছি এই আমার সুখ, নয়নজোড়ে বড়ো বাড়ি তো প'ড়েই আছে কিন্তু সেখানে কি মন টেঁকে।"

আমার বিশ্বাস, ঠাকুর্দাও জানিতেন যে, সকলে তাঁহার অবস্থা জানে, এবং যখন তিনি ভূতপূর্ব নয়নজোড়কে বর্তমান বলিয়া ভান করিতেন এবং অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিত, তখন তিনি মনে মনে বুঝিতেন যে, পরস্পরের এই ছলনা কেবল পরস্পরের প্রতি সৌহার্দবশতঃ।

কিন্তু আমার বিষম বিরক্তি বোধ হইত। অল্প বয়সে পরের নিরীহ গর্বও দমন করিতে ইচ্ছা করে এবং সহস্র গুরুতর অপরাধের তুলনায় নির্বুদ্ধিতাই সর্বাপেক্ষা অসহ্য বোধ হয়। কৈলাসবাবু ঠিক নির্বোধ ছিলেন না, কাজে কর্মে তাঁহার সহায়তা এবং পরামর্শ সকলেই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিত। কিন্তু নয়নজোড়ের গৌরব প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান ছিল না! সকলে তাঁহাকে ভালোবাসিয়া এবং আমোদ করিয়া তাঁহার কোনো অসম্ভব কথাতেই প্রতিবাদ করিত না বলিয়া তিনি আপনার কথায় পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য লোকেও যখন আমোদ করিয়া অথবা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয়নজোড়ের কীর্তি-কলাপসম্বন্ধে বিপরীত মাত্রায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করিত, তিনি অকাতরে সমস্ত গ্রহণ করিতেন এবং স্বপ্নেও সন্দেহ করিতেন না যে, অন্য কেহ এ-সকল কথা লেশমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারে।

আমার এক এক সময়ে ইচ্ছা করিত, বৃদ্ধ যে মিথ্যা দুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চিরস্থায়ী, সেই দুর্গটি দুই তোপে সর্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই। একটা পাখিকে সুবিধামতো ডালের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিলেই শিকারীর ইচ্ছা করে তাহাকে গুলি বসাইয়া দিতে, পাহাড়ের গায়ে একটা প্রস্তর পতনোন্মুখ থাকিতে দেখিলেই বালকের ইচ্ছা করে এক লাথি মারিয়া তাহাকে গড়াইয়া ফেলিতে—যে জিনিষটা প্রতি মুহূর্তে পড়ি-পড়ি করিতেছে অথচ কোনো একটা কিছুতে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই তবে যেন তাহার সম্পূর্ণতা সাধন এবং দর্শকের মনে তৃপ্তিলাভ হয়। কৈলাসবাবুর মিথ্যা এতই সরল, তাহার ভিত্তি এতই দুর্বল, তাহা ঠিক সত্য বন্দুকের লক্ষ্যের সামনে এমনি বুক ফুলাইয়া নৃত্য করিত যে, তাহাকে মুহূর্তের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্য একটি আবেগ উপস্থিত হইত—কেবল নিতান্ত আলস্যবশতঃ এবং সর্বজনসম্মত প্রথার অনুসরণ করিয়া সে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের অতীত মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া যতটা মনে পড়ে তাহাতে বোধ করি, কৈলাসবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক বিদ্বেষের আর একটি গূঢ় কারণ ছিল। তাহা একটু বিবৃতি করিয়া বলা আবশ্যক।

আমি বড়োমানুষের ছেলে হইয়াও যথাকালে এম.এ. পাশ করিয়াছি, যৌবন সত্ত্বেও কোনো প্রকার কুসংসর্গে কুৎসিত আমোদে যোগ দিই নাই, এবং অভিভাবকদের মৃত্যুর পরে স্বয়ং কর্তা হইয়াও আমার স্বভাবের কোনো প্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। তাহা ছাড়া, চেহারাটা এমন যে, তাহাকে আমি নিজ মুখে সুশ্রী বলিলে অহংকার হইতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদ হয় না।

অতএব বাংলা দেশে ঘট্‌কালির হাটে আমার দাম যে অত্যন্ত বেশি তাহাতে আর সন্দেহ নাই—এই হাটে আমার সেই দাম আমি পুরা আদায় করিয়া লইব, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ধনী পিতার পরম রূপবতী একমাত্র বিদুষী কন্যা আমার কল্পনার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছিল।

দশ হাজার টাকা পণের প্রস্তাব করিয়া দেশ বিদেশ হইতে আমার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমি অবিচলচিত্তে নিক্তি ধরিয়া তাহাদের যোগ্যতা ওজন করিয়া লইতেছিলাম, কোনোটাই আমার সমযোগ্য বোধ হয় নাই। অবশেষে ভবভূতির ন্যায় আমার ধারণা হইয়াছিল যে,—

কী জানি জন্মিতে পারে মম সমতুল,
অসীম সময় আছে, বসুধা বিপুল।

কিন্তু বর্তমান কালে এবং ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে সেই অসম্ভব দুর্লভ পদার্থ জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

কন্যাদায়গ্রস্তগণ প্রতিনিয়ত নানা ছন্দে আমার স্তব স্তুতি এবং বিবিধোপচারে আমার পূজা করিতে লাগিল। কন্যা পছন্দ হউক বা না হউক, এই পূজা আমার মন্দ লাগিল না। ভালো ছেলে বলিয়া কন্যার পিতৃগণের এই পূজা আমার উচিত প্রাপ্য স্থির করিয়াছিলাম। শাস্ত্রে পড়া যায় দেবতা বর দিন আর না দিন, যথাবিধি পূজা না পাইলে বিষম

ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। নিয়মিত পূজা পাইয়া আমার মনে সেইরূপ অত্যুচ্চ দেবভাব জন্মিয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছিলাম, ঠাকুর্দামিশায়ের একটি পৌত্রী ছিল। তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি কিন্তু কখনো রূপবতী বলিয়া ভ্রম হয় নাই। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও আমার মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, কৈলাসবাবু লোক মারফত অথবা স্বয়ং পৌত্রীটিকে অর্ঘ্য দিবার মানসে আমার পূজার বোধন করিতে আসিবেন, কারণ, আমি ভালো ছেলে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না।

শুনিতে পাইলাম, আমার কোনো বন্ধুকে তিনি বলিয়াছিলেন, নয়নজোড়ের বাবুরা কখনো কোনো বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কাহারো নিকটে প্রার্থনা করে নাই—কন্যা যদি চিরকুমারী হইয়া থাকে তথাপি সে কুলপ্রথা তিনি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

শুনিয়া আমার বড়ো রাগ হইল। সে রাগ অনেক দিন পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ছিল—কেবল ভালো ছেলে বলিয়াই চুপচাপ করিয়া ছিলাম।

যেমন বজ্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ থাকে, তেমনি আমার চরিত্রে রাগের সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌতুকপ্রিয়তা জড়িত ছিল। বৃদ্ধকে শুদ্ধমাত্র নিপীড়ন করা আমার দ্বারা সম্ভব হইত না—কিন্তু একদিন হঠাৎ এমন একটা কৌতুকাবহ প্ল্যান মাথায় উদয় হইল যে, সেটা কাজে খাটাইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানা লোকে নানা মিথ্যা কথার সৃজন করিত। পাড়ার একজন পেন্সনভোগী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রায় বলিতেন, ঠাকুর্দা, ছোটলাটের সঙ্গে যখনি দেখা হয় তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের খবর না নিয়ে ছাড়েন না—সাহেব বলেন, বাংলাদেশে, বর্ধমানের রাজা এবং নয়নজোড়ের বাবু, এই দুটি মাত্র যথার্থ বনেদী বংশ আছে।

ঠাকুর্দা ভারি খুশি হইতেন—এবং ভূতপূর্ব ডেপুটি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অন্যান্য কুশলসংবাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন—"ছোটোলাট সাহেব ভালো আছেন? তাঁর মেমসাহেব ভালো আছেন? তাঁর পুত্র-কন্যারা সকলেই ভালো আছেন?" সাহেবের সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাৎ

করিতে যাইবেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভূতপূর্ব ডেপুটি নিশ্চয়ই জানিতেন, নয়নজোড়ের বিখ্যাত চৌঘুড়ি প্রস্তুত হইয়া দ্বারে আসিতে আসিতে বিস্তর ছোটোলাট এবং বড়োলাট বদল হইয়া যাইবে।

আমি একদিন প্রাতঃকালে গিয়া কৈলাসবাবুকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিলাম—ঠাকুর্দা, কাল লেপ্টেনেন্ট্ গবর্ণরের লেভিতে গিয়েছিলুম। তিনি নয়নজোড়ের বাবুদের কথা পাড়াতে আমি বললুম,—"নয়নজোড়ের কৈলাসবাবু কলকাতাতেই আছেন, শুনে, ছোটোলাট এতদিন দেখা করতে আসেননি ব'লে ভারি দুঃখিত হ'লেন—ব'লে দিলেন আজই দুপুর বেলা তিনি গোপনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন।"

আর কেহ হইলে কথাটার অসম্ভবতা বুঝিতে পারিত এবং আর কাহারো সম্বন্ধে হইলে কৈলাসবাবুও এ-কথায় হাস্য করিতেন, কিন্তু নিজের সম্বন্ধীয় বলিয়া এ সংবাদ তাঁহার লেশমাত্র অবিশ্বাস্য বোধ হইল না।—শুনিয়া যেমন খুশি হইলেন তেমনি অস্থির হইয়া উঠিলেন—কোথায় বসাইতে হইবে, কী করিতে হইবে, কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন—কী উপায়ে নয়নজোড়ের গৌরব রক্ষিত হইবে কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাহা ছাড়া, তিনি ইংরেজি জানেন না, কথা চালাইবেন কী করিয়া সেও এক সমস্যা।

আমি বলিলাম, "সেজন্য ভাবনা নাই, তাঁহার সঙ্গে একজন দোভাষী থাকে; কিন্তু ছোটোলাট সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা, আর কেহ উপস্থিত না থাকে।"

মধ্যাহ্নে পাড়ার অধিকাংশ লোক যখন আফিসে গিয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রামগ্ন, তখন কৈলাসবাবুর বাসার সম্মুখে এক জুড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।

তকমা-পরা চাপ্রাসী তাঁহাকে খবর দিল, ছোটোলাট সাহেব আয়া! ঠাকুর্দা প্রাচীনকাল-প্রচলিত শুভ্র জামাজোড়া এবং পাগ্ড়ি পরিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিলেন; তাঁহার পুরাতন ভৃত্য গণেশটিকেও তাঁহার নিজের ধুতি চাদর জামা পরাইয়া ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোটোলাটের আগমন-সংবাদ শুনিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন—এবং সন্নতদেহে বারংবার সেলাম করিতে করিতে ইংরেজবেশধারী আমার এক প্রিয় বয়স্যকে ঘরে লইয়া গেলেন।

সেখানে চৌকির উপরে তাঁহার একমাত্র বহুমূল্য শালটি পাতিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই উপর কৃত্রিম ছোটোলাটকে বসাইয়া উর্দুভাষায় এক অতি বিনীত সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন, এবং নজরের স্বরূপে স্বর্ণ রেকাবিতে তাঁহাদের বহুকষ্টরক্ষিত কুলক্রমাগত এক আস্‌রফির মালা ধরিলেন। প্রাচীন ভৃত্য গণেশ গোলাপপাশ এবং আতরদান লইয়া উপস্থিত ছিল।

কৈলাসবাবু বারংবার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের নয়নজোড়ের বাড়িতে হুজুর বাহাদুরের পদধূলি পড়িলে তাঁহাদের যথাসাধ্য যথোচিত আতিথ্যের আয়োজন করিতে পারিতেন—কলিকাতায় তিনি প্রবাসী—এখানে তিনি জলহীন মীনের ন্যায় সর্ববিষয়েই অক্ষম—ইত্যাদি।

আমার বন্ধু দীর্ঘ হ্যাট্‌ সমেত অত্যন্ত গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। ইংরেজি কায়দা-অনুসারে এরূপ স্থলে মাথায় টুপি না থাকিবার কথা, কিন্তু আমার বন্ধু ধরা পড়িবার ভয়ে যথাসম্ভব আচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টায় টুপি খোলেন নাই। কৈলাসবাবু এবং তাঁহার গর্বান্ধ প্রাচীন ভৃত্যটি ছাড়া আর সকলেই মুহূর্তের মধ্যে বাঙালির এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারিত।

দশমিনিট কাল ঘাড় নাড়িয়া আমার বন্ধু গাত্রোত্থান করিলেন এবং পূর্বশিক্ষামতো চাপ্‌রাসিগণ সোনার রেকাবিসুদ্ধ আস্‌রফির মালা, চৌকি হইতে সেই শাল, এবং ভৃত্যের হাত হইতে গোলাপপাশ এবং আতরদান সংগ্রহ করিয়া ছদ্মবেশীর গাড়িতে তুলিয়া দিল—কৈলাসবাবু বুঝিলেন ইহাই ছোটোলাটের প্রথা। আমি গোপনে এক পাশের ঘরে লুকাইয়া দেখিতেছিলাম এবং রুদ্ধ হাস্যাবেগে আমার পঞ্জর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অবশেষে কিছুতে আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া কিঞ্চিৎ দূরবর্তী এক ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম—এবং সেখানে হাসির উচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ দেখি, একটি বালিকা তক্তাপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

আমাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তক্তা ছাড়িয়া দাঁড়াইল—এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রোষের গর্জন আনিয়া, আমার মুখের উপর সজল বিপুল কৃষ্ণ চক্ষের সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া কহিল—"আমার দাদামশায় তোমাদের কী করেছেন—কেন তোমরা তাঁহাকে ঠকাতে এসেছ—কেন

এসেছ তোমরা?"—অবশেষে আর কোনো কথা জুটিল না—বাক্‌রুদ্ধ হইয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোথায় গেল আমার হাস্যাবেগ! আমি যে কাজটি করিয়াছি তাহার মধ্যে কৌতুক ছাড়া আর যে কিছু ছিল এতক্ষণ তাহা আমার মাথায় আসে নাই—হঠাৎ দেখিলুম অত্যন্ত কোমল স্থানে অত্যন্ত কঠিন আঘাত করিয়াছি ; হঠাৎ আমার কৃত কার্যের বীভৎস নিষ্ঠুরতা আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল—লজ্জায় এবং অনুতাপে পদাহত কুক্কুরের ন্যায় ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। বৃদ্ধ আমার কাছে কী দোষ করিয়াছিল? তাহার নিরীহ অহংকার তো কখনো কোনো প্রাণীকে আঘাত করে নাই! আমার অহংকার কেন এমন হিংস্রমূর্তি ধারণ করিল।

তাহা ছাড়া, আর একটি বিষয়ে আজ হঠাৎ দৃষ্টি খুলিয়া গেল। এতদিন আমি কুসুমকে, কোনো অবিবাহিত পাত্রের প্রসন্ন দৃষ্টিপাতের প্রতীক্ষায় সংরক্ষিত পণ্য-পদার্থের মতো দেখিতাম--ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাৎ যাহার পছন্দ হইবে, ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম এই গৃহকোণে, ঐ বালিকামূর্তির অন্তরালে একটি মানবহৃদয় আছে। তাহার নিজের সুখ-দুঃখ অনুরাগ-বিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ একদিকে অজ্ঞেয় অতীত আর একদিকে অভাবনীয় ভবিষ্যৎ নামক দুই অনন্ত রহস্য-রাজ্যের দিকে পূর্বে পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যে মানুষের মধ্যে হৃদয় আছে সে কি কেবল পণের টাকা এবং নাক চোখের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার যোগ্য?

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রত্যূষে বৃদ্ধের সমস্ত অপহৃত বহুমূল্য দ্রব্যগুলি লইয়া চোরের ন্যায় চুপি চুপি ঠাকুর্দার বাসায় গিয়া প্রবেশ করিলাম—ইচ্ছা ছিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে চাকরের হস্তে সমস্ত দিয়া আসিব।

চাকরকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছি এমন সময় অদূরবর্তী ঘরে বৃদ্ধের সহিত বালিকার কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। বালিকা সুমিষ্ট সস্নেহ স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল "দাদামশায়, কাল লাটসাহেব তোমাকে কী বললেন।" ঠাকুর্দা অত্যন্ত হর্ষিত চিত্তে লাটসাহেবের মুখে প্রাচীন নয়নজোড় বংশের বিস্তর কাল্পনিক গুণানুবাদ বসাইতেছিলেন। বালিকা তাহাই শুনিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল।

বৃদ্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহৃদয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার সকরুণ ছলনায় আমার দুই চক্ষে জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম—অবশেষে ঠাকুর্দা তাঁহার কাহিনী সমাপন করিয়া চলিয়া আসিলে আমার প্রতারণার বমালগুলি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং নিঃশব্দে তাহার সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া আসিলাম।

বর্তমান কালের প্রথানুসারে অন্যদিন বৃদ্ধকে দেখিয়া কোনো প্রকার অভিবাদন করিতাম না—আজ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বৃদ্ধ নিশ্চয় মনে ভাবিলেন, গতকল্য ছোটোলাট তাঁহার বাড়িতে আসাতেই সহসা তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। তিনি পুলকিত হইয়া শতমুখে ছোটোলাটের গল্প বানাইয়া বলিতে লাগিলেন—আমিও কোনো প্রতিবাদ না করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। বাহিরের অন্য লোক যাহারা শুনিল তাহারা এ কথাটাকে আদ্যোপান্ত গল্প বলিয়া স্থির করিল, এবং সকৌতুকে বৃদ্ধের সহিত সকল কথায় সায় দিয়া গেল।

সকলে উঠিয়া গেলে আমি অত্যন্ত সলজ্জ মুখে দীনভাবে বৃদ্ধের নিকট একটি প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম, যদিও নয়নজোড়ের বাবুদের সহিত আমাদের বংশমর্যাদার তুলনাই হইতে পারে না, তথাপি—

প্রস্তাবটা শেষ হইবামাত্র বৃদ্ধ আমাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, এবং আনন্দাবেগে বলিয়া উঠিলেন—"আমি গরিব—আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না ভাই—আমার কুসুম অনেক পুণ্য করেছে তাই তুমি আজ ধরা দিলে।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ, আজ এই প্রথম, তাঁহার মহিমান্বিত পূর্বপুরুষদের প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া স্বীকার করিলেন যে, তিনি গরিব, স্বীকার করিলেন যে, আমাকে লাভ করিয়া নয়নজোড়ের বংশের গৌরবহানি হয় নাই। আমি যখন বৃদ্ধকে অপদস্থ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিলাম তখন বৃদ্ধ আমাকে পরম সৎপাত্র জানিয়া একান্তমনে কামনা করিতেছিলেন।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিমচন্দ্র

যেকালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন, তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই।

সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল। এবং ক্ষুদ্র যে-লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

আবার এখনকার যে নূতন পাঠক- ও লেখক-সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারাও বঙ্কিমের পরিপূর্ণ প্রভাব হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহারা বঙ্কিমের গঠিত সাহিত্যভূমিতেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, বঙ্কিমের নিকট যে তাঁহারা কতরূপে কতভাবে ঋণী তাহার হিসাব বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না।

কিন্তু বর্তমান লেখকের সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সহিত যখন বঙ্কিমের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় তখন সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোরূপ পূর্বসংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই এবং বর্তমান কালের নূতন ভাবপ্রবাহও আমাদের নিকট অপরিচিত ও অনভ্যস্ত ছিল। তখন বঙ্গসাহিত্যেরও যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম, তাহা দুইকালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা একমুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম

বর্ষার মতো "সমাগতো রাজবদ্‌ন্নতধ্বনির্।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাতকলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।

আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল, তাহা অনুভব করিয়াছিলাম—সেই জন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। মনে হয় সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তদনুরূপ ফললাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই। কিন্তু এ নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম-সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনো স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দে নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে-রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয় সে-রাগিণী চিরদিনের নহে। সেদিন কেবল অবিমিশ্র আনন্দ এবং আশা, তাহার পর হইতে বিচিত্র কর্তব্য, মিশ্রিত দুঃখসুখ, ক্ষুদ্র বাধাবিঘ্ন, আবর্তিত বিরহমিলন--তাহার পর হইতে গভীর গম্ভীরভাবে নানাপথ বাহিয়া নানা শোকতাপ অতিক্রম করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রতিদিন আর সে নহবত থাকিবে না। তথাপি সেই একদিনের উৎসবের স্মৃতি কঠোর কর্তব্যপথে চিরদিন আনন্দ সঞ্চার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যেদিন নবযৌবনপ্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন সেইদিনের সর্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ-উৎসব আমাদের মনে আছে। সেদিন আর নাই। আজ নানা লেখা নানা মত নানা আলোচনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোনোদিন বা ভাবের স্রোত মন্দ হইয়া আসে, কোনোদিন বা অপেক্ষাকৃত পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।

এইরূপই হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে-কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা বলিয়া আমরা জানি না। কী রাজনীতি, কী বিদ্যাশিক্ষা, কী সমাজ, কী ভাষা, আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নবীশিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদপুরাণতন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ অদ্য এই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।

রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন-দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে ; এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।

মাতৃভাষার বন্ধ্যদশা ঘুচাইয়া যিনি তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাঙালীর যে কী মহৎ কী চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন সে-কথা যদি কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় তবে তদপেক্ষা আর দুর্ভাগ্য কিছুই নাই। তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরেজি পণ্ডিতেরা বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলাভাষায় যে কীর্তি উপার্জন করা যাইতে পারে সে-কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এইজন্য কেবল স্ত্রীলোক ও বালকের জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন। সেই সকল পুস্তকের সরলতা ও পাঠ্যযোগ্যতা সম্বন্ধে যাঁহাদের জানিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারা রেভরেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত এন্ট্রান্স-পাঠ্য বাংলাগ্রন্থে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি

পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা শূন্যতা দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন ; তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।

তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরেজিতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরেজি সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালির মতো বালির বাঁধ নির্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কী হইতে পারে? সম্পূর্ণ ক্ষমতা সত্ত্বেও আপন সমযোগ্য লোকের উৎসাহ এবং তাঁহাদের নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা উদ্যম ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাস এবং কত সাহসের বলে হয় তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার, প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্বে সেই অনাদর-মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

তখন, পূর্বে যাঁহারা অবহেলা করিয়াছিলেন তাঁহারা বঙ্গভাষার যৌবন-সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। বঙ্গসাহিত্য প্রতিদিন গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমতঃ, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে

শিক্ষিত ব্যক্তির সকল প্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে বর্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতি-লাভের প্রলোভন সংবরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম। চতুর্দিকব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মতো এমন গুরুভার আর কিছু নাই; তাহার নিয়তপ্রবল ভারাকর্ষণশক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম তাহা এখনকার সাহিত্যব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন। তখন যে আরো কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।

বঙ্কিম আপনার অন্তরের সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া প্রতিভাবলে যে-কার্য করিলেন তাহা আত্যাশ্চর্য। বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদবর্গের কত ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে। একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব-অভ্যাসবশতঃ সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

তখন সময় আরো কঠিন ছিল। বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোকে যে একলম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ লেখার উচ্চ আদর্শ তখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই। (সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর-একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।)

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিমচন্দ্র একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠানের যে ফল তাহাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচকপদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

(কন্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে।) এবং কল্পনাপ্রবণ লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোটো ছোটো দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন, কোনোদিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব করিতে হয় নাই।

নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিম্নাসনে বসিয়া শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভ্যজনের মনোরঞ্জন করিত। এই প্রগল্‌ভ বিদূষকটি যতই প্রিয়পাত্র থাক্‌, কখনো সম্মানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গম্ভীর

ভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাস্যের চপলতা সর্বপ্রযত্নে পরিহার করা হইত।

বঙ্কিম সর্বপ্রথমে হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম দেখাইয়া দেন যে, কেবল প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে : উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য এবং রমণীয়তার বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ এবং গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন সেই বঙ্কিম আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

কেবল সুসংগতি নহে, সুরুচি এবং শিষ্টতার সীমা নির্ণয় করিতেও একটি স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তির আবশ্যক। মাঝে মাঝে অনেক বলিষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে সেই বোধশক্তির অভাব দেখা যায়। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় বল এবং সৌকুমার্যের একটি সুন্দর সংমিশ্রণ ছিল। নারীজাতির প্রতি যথার্থ বীর-পুরুষের মনে যেরূপ একটি সসম্ভ্রম সম্মানের ভাব থাকে তেমনই সুরুচি এবং শীলতার প্রতি বঙ্কিমের বলিষ্ঠ বুদ্ধির একটি ভদ্রোচিত বীরোচিত প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। বঙ্কিমের রচনা তাহার সাক্ষ্য। বর্তমান লেখক যেদিন প্রথম বঙ্কিমকে দেখিয়াছিল, সেদিন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্কিমের এই স্বাভাবিক সুরুচিপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেদিন লেখকের আত্মীয় পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের মরকতকুঞ্জে কলেজ-রিয়্যুনিয়ন নামক মিলনসভা বসিয়াছিল। ঠিক কতদিনের কথা ভালো স্মরণ নাই কিন্তু আমি তখন বালক ছিলাম। সেদিন সেখানে আমার অপরিচিত বহুতর যশস্বী লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুকপ্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ চাপকানপরিহিত বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিবামাত্রই যেন তাঁহাকে সকলের হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মসমাহিত বলিয়া বোধ হইল। আর সকলে জনতার অংশ, কেবল তিনি যেন একাকী একজন। সেদিন আর কাহারও

পরিচয় জানিবার জন্য আমার কোনোরূপ প্রয়াস জন্মে নাই, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আমি এবং আমার একটি আত্মীয় সংগী একসঙ্গেই কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। সন্ধান লইয়া জানিলাম তিনিই আমাদের বহুদিনের অভিলষিতদর্শন লোকবিশ্রুত বঙ্কিমবাবু। মনে আছে প্রথম-দর্শনেই তাঁহার মুখশ্রীতে প্রতিভার প্রখরতা এবং বলিষ্ঠতা এবং সর্বলোক হইতে তাঁহার একটি সুদূর স্বাতন্ত্র্যভাব আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর অনেকবার তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি, তাঁহার নিকট অনেক উৎসাহ এবং উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার মুখশ্রী স্নেহের কোমল-হাস্যে অত্যন্ত কমনীয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু প্রথম-দর্শনে সেই যে তাঁহার মুখে উদ্যত খড়্গের ন্যায় একটি উজ্জ্বল সুতীক্ষ্ণ প্রবলতা দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা আজ পর্যন্ত বিস্মৃত হই নাই।

সেই উৎসব উপলক্ষে একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দেশানুরাগ-মূলক স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বঙ্কিম এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সহসা একটি শ্লোকে পতিত ভারতসন্তানকে লক্ষ্য করিয়া একটি অত্যন্ত সেকেলে রসিকতা প্রয়োগ করিলেন, সে রস কিঞ্চিৎ বীভৎস হইয়া উঠিল। বঙ্কিম তৎক্ষণাৎ একান্ত সংকুচিত হইয়া দক্ষিণ করতলে মুখের নিম্নার্ধ ঢাকিয়া পার্শ্ববর্তী দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে অন্য ঘরে পলায়ন করিলেন।

বঙ্কিমের সেই সসংকোচ পলায়নদৃশ্যটি অদ্যাবধি আমার মনে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে-সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনোপ্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক, ঠিক সুরুচিশিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে-সময়কার অসংযত বাক্‌-যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করা যে কী আশ্চর্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতার প্রকাশ হইলেও তাহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই শুচিতা দেখা যায় নাই। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোনোকালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম-সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল ; বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। (পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।) সেই তাঁহার স্বহস্তসম্পূর্ণ স্নেহপালিত ক্রোড়সঙ্গিনী বঙ্গভাষা আজ বঙ্কিমের জন্য অন্তরের সহিত রোদন করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তিনি এই শোকোচ্ছ্বাসের অতীত শান্তিধামে দুষ্কর জীবনযজ্ঞের অবসানে নির্বিকার নিরাময় বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার মুখে একটি কোমল প্রসন্নতা, একটি সর্বদুঃখতাপহীন গভীর প্রশান্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল—যেন জীবনের মধ্যাহ্নরৌদ্রদগ্ধ কঠিন সংসারতল হইতে মৃত্যু তাঁহাকে স্নেহসুশীতল জননীক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছে। আজ আমাদের বিলাপ পরিতাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না, আমাদের ভক্তি-উপহার গ্রহণ করিবার জন্য সেই প্রতিভাজ্যোতির্ময় সৌম্য প্রসন্নমূর্তি এখানে উপস্থিত নাই। আমাদের এই শোক এই ভক্তি কেবল আমাদেরই কল্যাণের জন্য। বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে যে-আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন এই শোকে এই ভক্তিতে সেই আদর্শ-প্রতিমা আমাদের অন্তরে উজ্জ্বল এবং স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। প্রস্তরের মূর্তিস্থাপনের অর্থ এবং সামর্থ্য আমাদের যদি না থাকে, তবে একবার তাঁহার মহত্ত্ব সর্বতোভাবে মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে আমাদের বঙ্গহৃদয়ের স্মরণস্তম্ভে স্থায়ী করিয়া রাখি। রাজনৈতিক সমাজনৈতিক মতামত সহস্রবার পরিবর্তিত হইতে পারে ; যে-সকল ঘটনা যে-সকল অনুষ্ঠান আজ সর্বপ্রধান বলিয়া বোধ হইতেছে এবং যাহার উন্মাদনার কোলাহলে সমাজের খ্যাতিহীন শব্দহীন কর্তব্যগুলিকে নগণ্য বলিয়া ধারণ হইতেছে, কাল তাহার স্মৃতিমাত্র চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে না পারে : কিন্তু যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্বপ্রকার ভাবপ্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরসম্পদ্ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। (তিনিই আমাদিগের নিকট যথার্থ শোকের মধ্যে সান্ত্বনা,

অবনতির মধ্যে আশা, শ্রান্তির মধ্যে উৎসাহ এবং দারিদ্র্যের মধ্যে চিরসৌন্দর্যের অক্ষয় আকর উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে যাহা-কিছু অমর এবং আমাদিগকে যাহা-কিছু অমর করিবে, সেই সকল মহাশক্তিকে ধারণ করিবার পোষণ করিবার প্রকাশ করিবার এবং সর্বত্র প্রচার করিবার একমাত্র উপায় যে মাতৃভাষা তাহাকেই তিনি বলবতী এবং মহীয়সী করিয়াছেন।

রচনাবিশেষের সমালোচনা ভ্রান্ত হইতে পারে—আজ আমাদিগের নিকট যাহা প্রশংসিত কালক্রমে শিক্ষা রুচি এবং অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের উত্তর-পুরুষের নিকট তাহা নিন্দিত এবং উপেক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম বঙ্গভাষার ক্ষমতা এবং বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতঃস্পর্শে জড়ত্ব-শাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন;—ইহা কেবল সাময়িক মত নহে, এ-কথা কোনো বিশেষ তর্ক বা রুচির উপর নির্ভর করিতেছে না, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য।

এই কথা স্মরণে মুদ্রিত করিয়া সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ্, এবং সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিমদিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।

--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের ইতিহাস

ইতিহাস সকল দেশেই সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে-ব্যক্তি রথচাইল্‌ডের জীবনী পড়িয়াছে সে খৃষ্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আফিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে এবং সে বলিবে, যাহার এক পয়সার সংগতি ছিল না, তাহার আবার জীবনী কিসের? তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশ-মালা ও জয়-পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিকস নাই, সেখানে আবার হিস্ট্রী কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না। সকল ক্ষেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে-ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে, সে-ই প্রাজ্ঞ।

যিশু খৃষ্টের হিসাবের খাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্য বিষয় সন্ধান করিলে খাতাপত্র সমস্ত নগণ্য হইয়া যায়, তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন বলিয়া জানিয়াও অন্য বিশেষ দিক্ হইতে সে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, সে উত্তর আছে; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যে অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা,—বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, সেগুলিকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে আবিষ্কার করা।

এই এককে প্রত্যক্ষ করা এবং ঐকান্তিক বিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক, তাহার এই স্বভাবই তাহাকে চিরদিন রাষ্ট্র-গৌরবের প্রতি উদাসীন করিয়াছে। কারণ, রাষ্ট্র-গৌরবের মূলে বিরোধের ভাব।

যাহারা পরকে একান্ত পর বলিয়া সর্বান্তঃকরণে অনুভব না করে, তাহারা রাষ্ট্র-গৌরব-লাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে পারে না। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই পোলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি এবং পরের সহিত আপনার সম্বন্ধ-বন্ধন ও নিজের ভিতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ধর্মনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি। য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা বিরোধমূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে-ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা মিলন-মূলক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে, তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখা যায়, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারা যায় না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদাই জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে।

ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে, সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্য দান করা সম্ভব।

বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্ত গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা, নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়—ইহাদিগকে একটি মূল ভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূল ভাবটি ভারতবর্ষের। য়ুরোপ পরকে দূর করিয়া, উৎসাদন করিয়া, সমাজকে নিরাপদ রাখিতে চায়; আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিয়ুজীল্যান্ড, কেপকলনিতে তাহার পরিচয় আমরা আজ পর্যন্ত পাইতেছি। হয় পরকে কাটিয়া-মারিয়া-খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুবিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া, এই দুই রকম হইতে পারে। য়ুরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে

ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। যদি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে যদি ধর্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলিয়া স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে।

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সে প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসঙ্কোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতিদের নিকট হইতেও বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্য-বিস্তার ও শৃঙ্খলা-স্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নয়, ধর্মনীতিতেও দেখি. গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।

পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে. তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা,—নানা বাধা-বিপত্তি দুর্গতি-সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব, তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

19—1962 B.T.

কৌতুকহাস্য

শীতের সকালে রাস্তা দিয়া খেজুররস হাঁকিয়া যাইতেছে। ভোরের দিক্‌কার ঝাপ্‌সা কুয়াশাটা কাটিয়া গিয়া তরুণ রৌদ্রে দিনের আরম্ভ-বেলাটা একটু উপভোগযোগ্য আতপ্ত হইয়া আসিয়াছে। সমীর চা খাইতেছে, ক্ষিতি খবরের কাগজ পড়িতেছে এবং ব্যোম মাথার চারিদিকে একটা অত্যন্ত উজ্জ্বল নীলে সবুজে মিশ্রিত গলাবন্ধের পাক জড়াইয়া একটা অসংগত মোটা লাঠি হস্তে সম্প্রতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অদূরে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তি পরস্পরের কটিবেষ্টন করিয়া কী-একটা রহস্যপ্রসঙ্গে বারংবার হাসিয়া অস্থির হইতেছিলেন। ক্ষিতি এবং সমীর মনে করিতেছিল এই উৎকট নীল-হরিত পশম-রাশিপরিবৃত সুখাসীন নিশ্চিন্তচিত্ত ব্যোমই ঐ হাস্যরসোচ্ছ্বাসের মূল কারণ।

এমন সময় অন্যমনস্ক ব্যোমের চিত্তও সেই হাস্যরসে আকৃষ্ট হইল। চৌকিটা সে আমাদের দিকে ঈষৎ ফিরাইয়া কহিল—"দূর হইতে একজন পুরুষমানুষের হঠাৎ ভ্রম হইতে পারে যে, ঐ দুটি সখী বিশেষ কোনো একটা কৌতুক-কথা অবলম্বন করিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু সেটা মায়া। পুরুষ জাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা বিনা কৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই, কিন্তু মেয়েরা হাসে কি জন্য তাহা 'দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।' (চক্‌মকি পাথর স্বভাবতঃ আলোকহীন:—উপযুক্ত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইলে সে অট্টশব্দে জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে, আর মাণিকের টুকরা আপনা-আপনি আলোয় ঠিকরিয়া পড়িতে থাকে, কোনো একটা সংগত উপলক্ষের অপেক্ষা রাখে না। মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদিতে জানে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে ; কারণ ব্যতীত কার্য হয় না, জগতের এই কড়া নিয়মটা কেবল পুরুষের পক্ষেই খাটে।"

সমীর নিঃশেষিতপাত্রে দ্বিতীয়বার চা ঢালিয়া কহিল—"কেবল মেয়েদের হাসি নয়, হাস্যরসটাই আমার কাছে কিছু অসংগত ঠেকে। দুঃখে কাঁদি, সুখে হাসি এটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না কিন্তু কৌতুকে হাসি কেন? কৌতুক তো ঠিক সুখ নয়। মোটা মানুষ চৌকি ভাঙিয়া পড়িয়া গেলে

আমাদের কোনো সুখের কারণ ঘটে এ কথা বলিতে পারি না, কিন্তু হাসির কারণ ঘটে ইহা পরীক্ষিত সত্য। ভাবিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে আশ্চর্যের বিষয় আছে।"

ক্ষিতি কহিল—"কথাটা এই যে কৌতুকে আমরা হাসি কেন। একটা কিছু ভালো লাগিবার বিষয় যেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল অমনি আমাদের গলার ভিতর দিয়া একটা অদ্ভুত প্রকারের শব্দ বাহির হইতে লাগিল এবং আমাদের মুখের সমস্ত মাংসপেশী বিকৃত হইয়া সম্মুখের দন্তপংক্তি বাহির হইয়া পড়িল—মানুষের মতো ভদ্র জীবের পক্ষে এমন একটা অসংযত অসঙ্গত ব্যাপার কি সামান্য অদ্ভুত এবং অপমানজনক? য়ুরোপের ভদ্রলোক ভয়ের চিহ্ন দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেন—আমরা প্রাচ্য-জাতীয়েরা সভ্যসমাজে কৌতুকের চিহ্ন প্রকাশ করাটাকে নিতান্ত অসংযমের পরিচয় জ্ঞান করি—"

সমীর ক্ষিতিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিল—"তাহার কারণ, আমাদের মত কৌতুকে আমোদ অনুভব করা নিতান্ত অযৌক্তিক। উহা ছেলে মানুষেরই উপযুক্ত। এইজন্য কৌতুক রসকে আমাদের প্রবীণ লোকমাত্রেই ছেব্‌লামী বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। একটা গানে শুনিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকালে হুঁকা-হস্তে রাধিকার কুটীরে কিঞ্চিৎ অঙ্গারের প্রার্থনায় আগমন করিয়াছিলেন শুনিয়া শ্রোতামাত্রের হাস্য উদ্রেক হইয়াছিল। কিন্তু হুঁকা-হস্তে শ্রীকৃষ্ণের কল্পনা সুন্দরও নহে, কাহারও পক্ষে আনন্দজনকও নহে—তবুও যে আমাদের হাসি ও আমোদের উদয় হয় তাহা অদ্ভুত ও অমূলক নহে তো কী? এইজন্যই এরূপ চাপল্য আমাদের বিজ্ঞ সমাজের অনুমোদিত নহে। ইহা যেন অনেকটা পরিমাণে শারীরিক: কেবল স্নায়ুর উত্তেজনা মাত্র। ইহার সহিত আমাদের সৌন্দর্যবোধ, বুদ্ধিবৃত্তি, এমন কি স্বার্থবোধেরও যোগ নাই। অতএব অনর্থক সামান্য কারণে ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধির এরূপ অনিবার্য পরাভব, স্থৈর্যের এরূপ সম্যক্ বিচ্যুতি, মন-বিশিষ্ট জীবের পক্ষে লজ্জাজনক সন্দেহ নাই।"

ক্ষিতি একটু ভাবিয়া কহিল—"সে কথা সত্য। কোনো অখ্যাতনামা কবি-বিরচিত এই কবিতাটি বোধ হয় জানা আছে—

তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া চাহিলাম একঘটি জল।
তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল।।

তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যখন একঘটি জল চাহিতেছে তখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া আধখানা বেল আনিয়া দিলে অপরাপর ব্যক্তির তাহাতে আমোদ অনুভব করিবার কোনো ধর্মসংগত অথবা যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। তৃষিত ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাহাকে একঘটি জল আনিয়া দিলে সমবেদনা-বৃত্তিপ্রভাবে আমরা সুখ পাই; কিন্তু তাহাকে হঠাৎ আধখানা বেল আনিয়া দিলে, জানি না, কী বৃত্তিপ্রভাবে আমাদের প্রচুর কৌতুক বোধ হয়। এই সুখ এবং কৌতুকের মধ্যে যখন শ্রেণীগত প্রভেদ আছে তখন দুইয়ের ভিন্নবিধ প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতির গৃহিণী-পনাই এইরূপ—কোথাও-বা অনাবশ্যক অপব্যয়, কোথাও অত্যাবশ্যকের বেলায় টানাটানি! এক হাসির দ্বারা, সুখ এবং কৌতুক দুটোকে সারিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই।"

ব্যোম কহিল—"প্রকৃতির প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ হইতেছে। সুখে আমরা স্মিতহাস্যে হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি। একটা আন্দোলনজনিত স্থায়ী, অপরটি সংঘর্ষজনিত আকস্মিক।"

সমীর ব্যোমের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল—"আমোদ এবং কৌতুক ঠিক সুখ নহে, বরঞ্চ তাহা নিম্নমাত্রার দুঃখ। স্বল্প পরিমাণে দুঃখ ও পীড়ন আমাদের চেতনার উপর যে আঘাত করে তাহাতে আমাদের সুখ হইতেও পারে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে বিনা কষ্টে আমরা পাচকের প্রস্তুত অন্ন খাইয়া থাকি, তাহাকে আমরা আমোদ বলি না। কিন্তু যেদিন 'চড়িভাতি' করা যায়, সেদিন নিয়ম ভংগ করিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া অসময়ে সম্ভবতঃ অখাদ্য আহার করি, তবু তাহাকে বলি আমোদ। আমোদের জন্য আমরা ইচ্ছাপূর্বক যে পরিমাণে কষ্ট ও অশান্তি জাগ্রত করিয়া তুলি, তাহাতে আমাদের চেতনাশক্তিকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। কৌতুকও সেই জাতীয় সুখাবহ দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের চিরকাল যেরূপ ধারণা আছে, তাঁহাকে হুঁকা-হস্তে রাধিকার কুটীরে আনিয়া উপস্থিত করিলে হঠাৎ আমাদের সেই ধারণায় আঘাত করে। সেই আঘাত ঈষৎ পীড়াজনক; কিন্তু সেই পীড়ার পরিমাণ এমন নিয়মিত যে, তাহাতে আমাদিগকে যে-পরিমাণে দুঃখ দেয় আমাদের চেতনাকে অকস্মাৎ চঞ্চল করিয়া তুলিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখী করে। এই সীমা ঈষৎ অতিক্রম করিলেই কৌতুক প্রকৃত পীড়ায় পরিণত হইয়া উঠে। যদি যথার্থ ভক্তির

কীর্তনের মাঝখানে কোনো রসিকতাবায়ুগ্রস্ত ছোক্‌রা হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঐ তাম্র-কূটধূম-পিপাসুতার গান গাহিত তবে তাহাতে কৌতুক বোধ হইত না ; কারণ, আঘাতটা এত গুরুতর হইত যে, তৎক্ষণাৎ তাহা উদ্যত মুষ্টি আকার ধারণ করিয়া উক্ত রসিক ব্যক্তির পৃষ্ঠাভিমুখে প্রবল প্রতিঘাত-স্বরূপে ধাবিত হইত। অতএব, আমার মতে কৌতুক—চেতনাকে পীড়ন ; আমোদও তাই। এইজন্য প্রকৃত আনন্দের প্রকাশ স্মিতহাস্য এবং আমোদ ও কৌতুকের প্রকাশ উচ্চহাস্য ;—সে হাস্য যেন হঠাৎ একটা দ্রুত আঘাতের পীড়নবেগে সশব্দে ঊর্ধ্বে উদ্‌গীর্ণ হইয়া উঠে।"

ক্ষিতি কহিল—"তোমরা যখন একটা মনের মতো থিওরির সঙ্গে একটা মনের মতো উপমা জুটিয়ে দিতে পার, তখন আনন্দে আর সত্যাসত্য জ্ঞান থাকে না। ইহা সকলেরই জানা আছে কৌতুকে যে কেবল আমরা উচ্চহাস্য হাসি তাহা নহে, মৃদুহাস্যও হাসি, এমন কি, মনে মনেও হাসিয়া থাকি। কিন্তু ওটা একটা অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, কৌতুক আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ ; এবং চিত্তের অনতিপ্রবল উত্তেজনা আমাদের পক্ষে সুখজনক। আমাদের অন্তরে বাহিরে একটি সুযুক্তিসংগত নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য ; সমস্তই চিরাভ্যস্ত, চির-প্রত্যাশিত ; এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমিমধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন তাহাকে বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি না। ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই চারিদিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসংগত ব্যাপারের অবতারণা হয়, তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সেই বাধা সুখের নহে, সৌন্দর্যের নহে, সুবিধার নহে, তেমনি আবার অতিদুঃখেরও নহে ; সেইজন্য কৌতুকের সেই বিশুদ্ধ অমিশ্র উত্তেজনায় আমাদের আমোদ বোধ হয়।"

আমি কহিলাম—"অনুভবক্রিয়ামাত্রই সুখের, যদি না তাহার সহিত কোনো গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি মিশ্রিত থাকে। এমন কি, ভয় পাইতেও সুখ আছে, যদি তাহার সহিত বাস্তবিক ভয়ের কোনো কারণ জড়িত না থাকে। ছেলেরা ভূতের গল্প শুনিতে একটা বিষম আকর্ষণ অনুভব করে, কারণ, হৃৎকম্পের উত্তেজনায় আমাদের যে চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে তাহাতেও আনন্দ আছে। রামায়ণে সীতাবিয়োগ রামের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই,

ওথেলোর অমূলক অসূয়া আমাদিগকে পীড়িত করে, দুহিতার কৃতঘ্নতাশরবিদ্ধ উন্মাদগ্রস্ত লিয়রের মর্মযাতনায় আমরা ব্যথা বোধ করি—কিন্তু সেই দুঃখপীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে সকল কাব্য আমাদের নিকট তুচ্ছ হইত। বরঞ্চ দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি ; কারণ, দুঃখানুভবে আমাদের চিত্তে অধিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে। কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভবক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। এইজন্য অনেক রসিক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন ; অনেকে গালিকে ঠাট্টার স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন; বাসরঘরে কর্ণমর্দন এবং অন্যান্য পীড়ন-নৈপুণ্যকে বঙ্গসীমন্তিনীগণ এক শ্রেণীর হাস্যরস বলিয়া স্থির করিয়াছেন ;—হঠাৎ উৎকট বোমার আওয়াজ করা আমাদের দেশে উৎসবের অঙ্গ।"

ক্ষিতি কহিল—"বন্ধুগণ, ক্ষান্ত হও। কথাটা একপ্রকার শেষ হইয়াছে। যতটুকু পীড়নে সুখ বোধ হয় তাহা তোমরা অতিক্রম করিয়াছ, এক্ষণে দুঃখ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আমরা বেশ বুঝিয়াছি যে, কমেডির হাস্য এবং ট্র্যাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে।—"

ব্যোম কহিল—"যেমন বরফের উপর প্রথম রৌদ্র পড়িলে তাহা ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতে থাকে, এবং রৌদ্রের তাপ বাড়িয়া উঠিলে তাহা গলিয়া পড়ে। তুমি কতকগুলি প্রহসন ও ট্র্যাজেডির নাম করো, আমি তাহা হইতে প্রমাণ করিয়া দিতেছি—"

এমন সময় দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দীপ্তি কহিলেন—"তোমরা কী প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ ?"

ক্ষিতি কহিল—"আমরা প্রমাণ করিতেছিলাম যে, তোমরা এতক্ষণ বিনা কারণে হাসিতেছিলে।"

শুনিয়া দীপ্তি স্রোতস্বিনীর মুখের দিকে চাহিলেন, স্রোতস্বিনী দীপ্তির মুখের দিকে চাহিলেন, এবং উভয়ে পুনরায় কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

ব্যোম কহিল—"আমি প্রমাণ করিতে যাইতেছিলাম যে, কমেডিতে পরের অল্প পীড়া দেখিয়া আমরা হাসি, এবং ট্র্যাজেডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি।"

দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর সুমিষ্ট সম্মিলিত হাস্যরবে পুনশ্চ গৃহ কূজিত হইয়া উঠিল, এবং অনর্থক হাস্য উদ্রেকের জন্য উভয়ে উভয়কে দোষী করিয়া

পরস্পরকে তর্জনপূর্বক হাসিতে হাসিতে সলজ্জভাবে দুই সখী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

পুরুষ সভ্যগণ এই অকারণ হাস্যোচ্ছ্বাসদৃশ্যে স্মিতমুখে অবাক হইয়া রহিল। কেবল সমীর কহিল—"ব্যোম, বেলা অনেক হইয়াছে, এখন তোমার ঐ বিচিত্রবর্ণের নাগপাশ বন্ধনটা খুলিয়া ফেলিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা দেখি না।"

ক্ষিতি ব্যোমের লাঠিগাছটি তুলিয়া অনেকক্ষণ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—"ব্যোম, তোমার এই গদাখানি কি কমেডির বিষয়, না, ট্র্যাজেডির উপকরণ?"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্ববিদ্যালয়

মধ্য এসিয়ার মরুভূমিতে যে সব পর্য্যাটক প্রাচীন যুগের চিহ্ন সন্ধান করেচেন তাঁরা দেখেচেন সেখানে কত সমৃদ্ধ জনপদ আজ বালি চাপা পড়ে হারিয়ে গেচে। এককালে সে সব জায়গায় জলের সঞ্চয় ছিল, নদীর রেখাও পাওয়া যায়। কখন রস এল শুকিয়ে, এক পা এক পা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে। বিপুল-সংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে-দেশ, সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের যোগান আজ অবসিত। যে-রস অনেক কাল থেকে নিম্নস্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিঃশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণায় অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। (এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে

পড়চে না, কেন-না বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েচি, গবাক্ষলণ্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত সমাজের দিকে।)

আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলাদেশের গ্রামের নিকট-সংস্রবে। গরমের সময়ে একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েচে নেমে, তীরের মাটি গিয়েচে ফেটে, বেরিয়ে পড়েচে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর, ধু ধু করচে তপ্ত বালু। মেয়েরা বহু দূর থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনচে, সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজলমিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না, ওলাউঠো দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই গেল এক, আর এক দুঃখের বেদনা আমার মনে বেজেছিল। সন্ধ্যে হয়ে এসেচে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষীরা ফিরেচে ঘরে। একদিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর একদিকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে এক একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মতো। সেই দিক্ থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ, আর তারি সঙ্গে একটানা সুরে কীর্ত্তনের কোনো একটা পদের হাজারবার তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হোত এখানেও চিত্ত-জলাশয়ের জল তলায় এসে পড়েচে। তাপ বাড়চে, কিন্তু ঠাণ্ডা করবার উপায় কতটুকুই বা। বছরের পর বছর যে অবস্থা-দৈন্যের মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে হাড়ভাঙ্গা মজুরীর উপরেও মন ব'লে মানুষের একটা কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়। তাকে সেই তৃপ্তি দেবার জন্যে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভূত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক ব'লে। জান্ত, এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে কেউ তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর কিছু দিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে : সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লী ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের

ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে, আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।

এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জন-সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়াল, অন্য দিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হোলো তারো প্রবাহ বইল না সর্ব্বজনীন দেশের অভিমুখে। (পাথরে গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল, তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডূষ ভর্ত্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আটঘাট বাঁধা।) মন্দাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটাজূটের মধ্যে বিশেষ ভাবে, তবুও দেব-ললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে দেন, বহে যান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্ত্ত্যজনের দ্বারের সম্মুখ দিয়ে, ঘটে ঘটে ভরে দেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেই জন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।

ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্ত্তিনী হয়ে চলতে পারে না। (সেই জন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাইনে। চারি দিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন, আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ, সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েচে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোট বইয়ের শাসন, আমাদের বিচার-বুদ্ধিতে নেই সাহস, আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্য্যন্ত হোলো না। (যেন কনে রইল বাপের বাড়ির অন্তঃপুরে, শ্বশুরবাড়ি নদীর ওপারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া নৌকাটা গেল কোথায়?)

পারাপারের একখানা ডোঙা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে সাহিত্য। এ কথা মানতেই হবে আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বর্ত্তমান যুগের অন্নে বস্ত্রে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েচে একালের ছোঁওয়া, কিন্তু

খাদ্য তো ওপার থেকে পুরোপুরি বহন করে আনচে না। যে-বিদ্যা বর্ত্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করচে, উদ্ঘাটন করচে বিশ্বরহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলা সাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া-আসা নেই বললেই হয়। চিন্তা করে যে-মন, যে-মন বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগ সাধন করে যে, সে পড়ে আছে পূর্ব্ব-যুগান্তরে, আর যে-মন রস সম্ভোগ করে সে যাতায়াত সুরু করেচে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণ-শালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েচে সেই দিক্‌টাতে যে-দিকে চলেছে মদের পরিবেষণ, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েচে মাতাল।

গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব সেখানে দেহ-মন-প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপৃত। তাই সেখানে যদি ত্রুটি থাকে তো পূর্ত্তিও আছে। বটগাছের কোনো ডাল-বা ঝড়ে ভাঙল, কোনোখানে-বা পোকায় ছিদ্র করেচে, কোনো বৎসর-বা বৃষ্টির কার্পণ্য, কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেচে আপন স্বাস্থ্য আপন বলিষ্ঠতা। তেমনি পাশ্চাত্ত্য দেশের মনকে ক্রিয়াবান্ করে রেখেচে তার বিদ্যা, তার শিক্ষা, তার সাহিত্য। সমস্ত মিলে, তার কর্ম্মশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটিয়েচে এই সমস্তের উৎকর্ষ।

আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেই জন্যে যখন কোনো অসংযম, কোনো চিত্তবিকার, অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে রুগ্‌ণ বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রৎ না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোড়া হয়ে রাঙিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সেই আশঙ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে আমরা নজির দেখাই পাশ্চাত্ত্য সমাজের, বলি এটাই তো সভ্যতার আধুনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেই সঙ্গে সকল দিকে আধুনিক সভ্যতার যে সচিন্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে, সেটার কথা চাপা রাখি।

একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধুসাধকের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত, তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চ্চার

সংবাদ আমাকে জানিয়েচে। তাতে ধর্ম্মের প্রশ্রয় ছিল। তাদেরই কাছে শুনেচি এই প্রশ্রয় সুরঙ্গপথে শহর পর্য্যন্ত গোপনে শিষ্যে প্রশিষ্যে শাখায়িত। এই পৌরুষনাশী ধর্ম্মনামধারী লালসার লোলতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে এই সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড়ো বড়ো চিন্তাকে বুদ্ধির সাধনাকে আশ্রয় ক'রে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।

এ জন্যে অন্ততঃ বাঙালী সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য সারগর্ভ নয় ব'লে এ'কে নিন্দা করা সহজ, কিন্তু কী করলে এ'কে সারালো করা যায় তার পন্থা নির্ণয় করা তত সহজ নয়। রুচির সম্বন্ধে লোকে বেপরোয়া, কেন-না ওদিকে কোনো শাসন নেই। অশিক্ষিত রুচিও রসের সামগ্রী থেকে যা হোক কোন একটা আস্বাদন পায়। আর যদি সে মনে করে তারই বোধ রসবোধের চরম আদর্শ, তবে তা নিয়ে তর্ক তুললে ফৌজদারী পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারে। (কবিতা গল্প নাটকের বাজারের দিকে যারা সমজদারের রাজপথটা পায়নি, অন্ততঃ তারা আনাড়িপাড়ার মাঠ দিয়েও চলতে পারে, কোনো মাশুল দিতে হয় না কোথাও।) কিন্তু যে-বিদ্যা মননের, সেখানে কড়া পাহারার সিংহদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়, মাঠ পেরিয়ে নয়। যে-সব দেশের 'পরে লক্ষ্মী প্রসন্ন এবং সরস্বতীও, তারা সেই বিদ্যার দিকে নতুন নতুন পথ পাকা করচে প্রত্যহ, পণ্যের আদানপ্রদান চলচে দূরে নিকটে, ঘরে বাইরে। আমাদের দেশেও তো বিলম্ব করলে চলবে না।

বাংলার আকাশে দুর্দ্দিন এসেচে চার দিক্ থেকে ঘন ঘোর ক'রে। একদা রাজদরবারে বাঙালীর প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালী কর্ম্মে পেয়েচে খ্যাতি, শিক্ষা-প্রসারণে হয়েচে অগ্রণী। সে দিন সেখানকার লোকের কাছে সে শ্রদ্ধা পেয়েচে, পেয়েচে অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা। আজ রাজপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন, অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সংকুচিত, দ্বার অবরুদ্ধ। এ দিকে বাংলার আর্থিক দুর্গতিও চরমে এলো।

অবস্থার দৈন্যে অশিক্ষার আত্মগ্লানিতে যেন বাঙালী নীচে তলিয়ে না যায়, যেন তার মন মাথা তুল্‌তে পারে দুর্ভাগ্যের ঊর্দ্ধে, এই দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টা জাগাতে হবে তো। মানুষের মন যখন ছোটো

হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্রতার নখচঞ্চুর আঘাতে সকল উদ্‌যোগকেই সে ক্ষুণ্ণ করে। বাংলাদেশে এই ভাঙন-ধরানো ঈর্ষ্যা নিন্দা দলাদলি এবং দুয়ো দেবার উত্তেজনা তো বরাবরই আছে, তার উপরে চিত্তের আলো যতই ম্লান হয়ে আসবে ততই নিজের 'পরে অশ্রদ্ধাবশতই অন্য সকলকে খর্ব্ব করবার অহৈতুক প্রয়াস আরো উঠবে বিষাক্ত হয়ে।

আজ হিন্দুমুসলমানে যে একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করচে তার মূলেও আছে সর্ব্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অলক্ষ্মী সেই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েছে, আত্মীয়কে তুলচে শত্রু ক'রে, বিধাতাকে করচে আমাদের বিপক্ষ। শেষকালে নিজের সর্ব্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্য্যন্ত আজ এগোলো যে বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েচে; শিক্ষার ও সাহিত্যের যে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্ত্বেও এক-রাষ্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা, সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ ব্যথা পেল না, লজ্জা পেল না। দুঃখ পাই তাতে ধিক্কার নেই কিন্তু দেশজোড়া অশিক্ষাগ্রস্ত হেয়তা আমাদের মাথা হেঁট করে দিল, ব্যর্থ ক'রে দিল আমাদের সকল মহৎ উদ্যম। রাষ্ট্রিক হাটে রাষ্ট্রাধিকার নিয়ে দরদস্তুর ক'রে হট্টগোল যতই পাকানো যাক, সেখানে গোলটেবিলের চক্রবাত্যায় প্রতিকারের চরম উপায় মিলবে না, তরীর তলায় যেখানে বাঁধন আলগা সেইখানে অবিলম্বে হাত লাগাতে হবে।

সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। ইস্কুল কলেজের বাইরে শিক্ষা বিছিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য। কিন্তু সেই সাহিত্যকে সর্ব্বাঙ্গীণরূপে শিক্ষার আধার করতে হবে, দেখতে হবে তাকে গ্রহণ করবার পথ সর্ব্বত্র সুগম হয়েচে। এ জন্যে কোন্ বন্ধুকে ডাকব, বন্ধু যে আজ দুর্লভ হোলো। তাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেই আবেদন উপস্থিত করচি।

মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্ব্বদেহে। প্রশ্ন এই কেমন ক'রে করা যেতে পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে,—একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে

পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপকভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হতে পারে না, তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করচে এইটি দেখবার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সে রকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়ে আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেটুকু অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার কোনো কারণ দেখিনে।

বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানের বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা প্রসারণ করে, তবেই বাংলাভাষায় যথোচিত পরিমাণে শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থরচনা সম্ভবপর হবে। নইলে কোনো কালেই বাংলা সাহিত্যে বিষয়ের দৈন্য ঘুচতেই পারে না। যে সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয়, তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃভাষাকে চিরদিন অপমানিত ক'রে রাখা হবে। বাঙালী যারা বাংলাভাষাই জানে, শিক্ষিত-সমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে? এমনো এক সময় ছিল যখন ইংরেজি ইস্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা বাংলা জানিনে বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে তাদের চৌকি এগিয়ে দিয়েচে। সে দিন আজ আর নেই বটে কিন্তু বাঙালীর ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয় শুধু কেবল বাংলাভাষা জানি বলতে। (এ দিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগেনি বললে কম বলা হয়।) এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে। বিলাতে যাতায়াতের প্রথম যুগে ইঙ্গবঙ্গী নেশা যখন উৎকট ছিল তখন সেই মহলে স্ত্রীকে সাড়ি পরালে প্রেষ্টিজ হানি হোত। শিক্ষা-সরস্বতীকে সাড়ি পরালে আজও অনেক

বাঙালী বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। (অথচ এটা জানা কথা যে, সাড়িপড়া বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলা ফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।)

একদিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে, যখন আমার শক্তি ছিল, তখন কখনো কখনো ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা ক'রে শুনিয়েচি। আমার শ্রোতারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বীকার করেচেন ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলাভাষায় তাঁদের মনে সহজে সাড়া পেয়েচে। বস্তুতঃ আধুনিক শিক্ষা ইংরেজি ভাষাবাহিনী ব'লেই আমাদের মনের প্রবেশপথে তার অনেকখানি মারা যায়।) ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালীর ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি. এণ্ড ও. কোম্পানীর ডিনার কামরায় যখন খেতে বসে, তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটা ছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত ব'লেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবী সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা,—আছে সবই অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়। এ যা বলচি এ কলেজি যজ্ঞের কথা, আমার আজকের আলোচ্য বিষয় এ নিয়ে নয়। আমার বিষয়টা সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। (শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছয় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা।) মাতৃভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোষ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাহারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী?

বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মত উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি—তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন ক'রে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগ-শিক্ষার উদ্বেল ধারা বাঙালীচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দ-ধ্বনি।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এমন দিন ছিল, যখন ইংরেজিপাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি ছিল না। বাড়ি আসিতাম, সেখানেও পাঠশালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিত। বন্ধুকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজিকাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজি বক্তৃতায়। আজ যখন সেই পাঠশালা হইতে, একেবারে না হোক, ক্ষণে ক্ষণে ছুটি পাইয়া থাকি, তখন সেই ছুটির সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায়? মাতার অন্তঃপুরে নহে কি? দিনের পড়া তো শেষ হইল, তার পরে ক্রিকেটখেলাতেও না হয় রণজিৎ হইয়া উঠিলাম। তার পরে? তার পরে গৃহবাতায়ন হইতে মাতার স্বহস্তজ্বালিত সন্ধ্যাদীপটি কি চোখে পড়িবে না? যদি পড়ে, তবে কি অবজ্ঞা করিয়া বলিব, ওটা মাটির প্রদীপ? ঐ মাটির প্রদীপের পশ্চাতে কি মাতার গৌরব নাই? যদি মাটির প্রদীপই হয় তো সে দোষ কার? মাতার কক্ষে সোনার প্রদীপ গড়িয়া দিতে কে বাধা দিয়াছে? যেমনি হোক না কেন, মাটিই হোক আর সোনাই হোক, যখন আনন্দের দিন আসিবে, তখন ঐখানেই আমাদের উৎসব ; আর যখন দুঃখের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, তখন রাজপথে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলা যায় না, তখন ঐ গৃহ ছাড়া আর গতি নাই।

আজ এখানে আমরা সেই পাঠশালার ফেরৎ আসিয়াছি। আজ সাহিত্য-পরিষদ্‌ আমাদিগকে যেখানে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা কলেজক্লাস হইতে দূরে, তাহা ক্রিকেট্‌ময়দানেরও সীমান্তরে, সেখানে আমাদের দরিদ্র জননীর সন্ধ্যাবেলাকার মাটির প্রদীপটি জ্বলিতেছে।

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে— সেইজন্যই বঙ্গবাণীর হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্‌ আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

কলেজের বাহিরে যে-দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগস্থাপন করিতে হইবে।

অন্য দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে-সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ—সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই।

এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় এই হইয়াছে, কী করিলে বিদেশীচালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাকার্য্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনোমতে পুঁথির গন্ডীর বাহিরে আনা দুঃসাধ্য হইবে।

নানা আলোচনা, নানা বাদ প্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি যেখানে প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে, যাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন, সেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া যায়, তাহা নহে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যার অসহ্য জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায়, তাহারই মধ্যে একান্তভাবে বদ্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষ উদ্যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাজের জন্য আমি বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্‌কে অনুরোধ করিতেছি—আমার অনুনয়, বাঙালী ছাত্রদের জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব একটি স্বাধীনশিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিন—যে-ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কিঞ্চিৎ-পরিমাণেও নিজের শক্তি-প্রয়োগ ও বুদ্ধির কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া চিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্ত্তিদান করিতে পারিবে।

বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহাকিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল

হইতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি ; ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি, তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

এইরূপে স্বদেশকে মুখ্যভাবে, সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না। আর একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে-বস্তু চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত নাই, যে-বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চ্চা যদি প্রধানতঃ তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্ব্বল হইবেই। যাহা পরিচিত, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে, যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে, তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।

আমাদের বিদেশী গুরুরা প্রায়ই আমাদিগকে খোঁটা দিয়া বলেন যে, এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্থবিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।

যদি তাঁহাদের এ অপবাদ সত্য হয়, তবে ইহার প্রধান কারণ এই, বস্তুর সহিত বাহির বিদ্যা আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে-সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জন-প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ, নানা স্মৃতি আমাদের ঘরেবাইরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস, তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের

কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্ম্মের যেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্ব্বক, অভিনিবেশপূর্ব্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্ম্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন, দূরদেশের ধর্ম্ম- ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বই পড়িবামাত্র কখনো হইতেই পারে না।

ধারণা যখন অস্পষ্ট ও দুর্ব্বল থাকে, তখন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না; এমন কি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তবিক অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এইজন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই; কেতাবে বিজ্ঞান শিখিয়াও অভূতপূর্ব্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি; ধর্ম্ম, সমাজ, এমন কি সাহিত্য-সমালোচনাতেও অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।

বাস্তবিকতাবিবর্জিত হইলে আমাদের মনই বলো, হৃদয়ই বলো, কল্পনাই বলো, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের দেশহিতৈষা ইহার প্রমাণ। দেশের লোকের হিতের সঙ্গে এই হিতৈষার যোগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ হইতেছে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নষ্ট হইতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্য যাহারা কিছুমাত্র নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তাহারা বিদেশী সাহিত্য ইতিহাসের পুঁথিগত প্যাট্রিয়টিজম্ নানাপ্রকার অসঙ্গত অনুকরণের দ্বারা লাভ করিয়াছি বলিয়া কল্পনা করে। এইজন্যই এত কাল গেল, তথাপি এই প্যাট্রিয়টিজম্ আমাদিগকে যথার্থ কোনো ত্যাগ-স্বীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না! যে-দেশে প্যাট্রিয়টিজম্ অবাস্তব নহে, পুঁথিগত অনুকরণমূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতেছে, আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না, সময় দিতে পারি না—আমাদের দেশ যে কিরূপ, তাহা সন্ধানপূর্ব্বক জানিবার জন্য উৎসাহ অনুভব করি না। যোশিদা তোরাজিরো জাপানের একজন বিখ্যাত প্যাট্রিয়ট্ ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথমাবস্থায় চালচিঁড়া বাঁধিয়া পায়ে হাঁটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। এইরূপে দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া তাহার পরে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত হন—শেষদশায় তাঁহাকে দেশের কাজে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এরূপ প্যাট্রিয়টিজমের অর্থ বোঝা যায়। দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিতৈষা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই তাহা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মতো ফল দিতে থাকে।

অতএব এ-কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষবস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্ আপনার আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনা-ব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারিদিক্‌কে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানার চর্চ্চা যথার্থ দেশপ্রীতির চর্চ্চার অঙ্গ।

বাংলাদেশে এমন জিলা নাই, যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্তসংগ্রহে ইঁহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্যপরিষদ্ সার্থকতা লাভ করিবেন। এ সাহায্য কিরূপ এবং তাহার কতদূর প্রয়োজনীয়তা, তাহার দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্যপরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণসংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে, তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা এ-কথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্যগতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহা নহে—নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্ত্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্ত্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা

আমি বলি না—যেখানেই হোক্ না কেন, মানবসাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে, তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে,—পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে ; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে, কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা, তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ Ethnology বই যে পড়ি না, তাহা নহে, কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুণ আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম, কৈবর্ত্ত, পোদ্-বাগ্দি রহিয়াছে, তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনি বুঝিতে পারি, পুঁথি-সম্বন্ধে আমাদের কত-বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কত-বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব, তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্ব্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্যছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুতঃ দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্যপরিষদ্ নিজের কর্ত্তব্যনিরূপণ করিয়াছেন।

আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্ম্মশালায় সহায়স্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্য আমার অনুরোধ পরিষদ্ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অদ্যকার এই সভায়

আমি ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি। সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদের তরুণাবস্থার কথা আমার মনে পড়িতেছে।

আমাদের তরুণাবস্থা বলিলে যে অত্যন্ত সুদূরকালের কথা বোঝায়, এত-বড়ো প্রাচীনত্বের দাবি আমি করিতে পারি না—কিন্তু আমাদের তখনকার দিনের সঙ্গে এখনকার দিনের এমন একটা পরিবর্তন দেখিতে পাই যে, সেই অদূরবর্তী সময়কে যেন একটা যুগান্তর বলিয়া মনে হয়। এই পরিবর্তনটা বয়সের দোষে আমি দেখিতেছি অথবা এই পরিবর্তনটা সত্যই ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। একটু বয়স বেশি হইলেই প্রাচীনতর লোকেরা তাঁহাদের সেকালের সঙ্গে তুলনা করিয়া একালকে খোঁটা দিতে বসেন—তাহার একটা কারণ, সেকাল তাঁহাদের আশা করিবার কাল ছিল এবং একালটা তাঁহাদের হিসাব বুঝিবার দিন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, একালের যুবকেরাও আশা করিয়া জীবন আরম্ভ করিতেছে, এখনো তাহারা চস্‌মা চোখে হিসাব মিটাইতে বসে নাই। অতএব আমাদের সেদিনকার কালের সঙ্গে অদ্যকার কালের যে প্রভেদটা আমি দেখিতেছি, তাহা যথার্থ কি না, তাহার বিচারক একা আমি নহি, তোমাদিগকেও তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সত্যমিথ্যা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু মনে হয়, এখনকার ছেলেদের চেয়ে তখন আমরা অনেক বেশি ছেলেমানুষ ছিলাম। সেটা ভালো কি মন্দ, তাহার দুই পক্ষেই বলিবার কথা আছে—কিন্তু ছেলেমানুষ থাকিবার একটা গুণ এই ছিল যে, আমাদের আশার অন্ত ছিল না, ভবিষ্যতের দিকে কী চোখে যে চাহিতাম, কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না। তখন আমরা এমন-সকল সভা করিয়াছিলাম, এমন-সকল দল বাঁধিয়াছিলাম, এমন-সকল সংকল্পে বদ্ধ হইয়াছিলাম, যাহা এখনকার দিনে তোমরা শুনিলে নিশ্চয় হাস্য সংবরণ করিতে পারিবে না—এবং আমাদের সাহিত্যে কোনো কোনো স্থলে আমাদের সেদিনকার চিত্র হাস্যরসরঞ্জিত তূলিকায় চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সব কথা যদি খুলিয়া বলি, তবে তোমরা এই মনে করিয়া বিস্মিত হইবে যে, আমাদের সেকালে আমরা,—বালকেরা,—সকলেই যে একবয়সী ছিলাম, তাহা নহে, আমাদের মধ্যে পক্ককেশের অভাব ছিল না এবং তাঁহাদের আশা ও উৎসাহ আমাদের চেয়ে যে কিছুমাত্র অল্প ছিল, তাহাও বলিতে

পারি না। তখন আমরা নবীনে-প্রবীণে মিলিয়া ভয়-লজ্জা-নৈরাশ্য কেমন নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, তাহা আজও ভুলিতে পারিব না।

সেদিনের চেয়ে নিঃসন্দেহই আজ আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু আজ আকাশে আশার আলোক যেন ম্লান এবং পথিকের হস্তে আনন্দের পাথেয় যেন অপ্রচুর।

কেন এমনটা ঘটিল, তাহার জবাবদিহি এখনকার কালের নহে, আমাদিগকেই তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। যে আশার সম্বল লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা পথের মধ্যে কোন্‌খানে উড়াইয়া-পুড়াইয়া দিয়া আজ এমন রিক্ত হইয়া বসিয়া আছি?

অপরিমিত আশা-উৎসাহ আমাদের অল্পবয়সের প্রথম সম্বল; কর্ম্মের পথে যাত্রা করিবার আরম্ভকালে বিধাতৃমাতা এইটে আমাদের অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থ যেমন খাদ্য নহে, তাহা ভাঙাইয়া তবে খাইতে হয়, তেমনি আশা-উৎসাহমাত্র আমাদিগকে সার্থক করে না, তাহাকে বিশেষ কাজে খাটাইয়া তবে ফললাভ করি। সে-কথা ভুলিয়া আমরা বরাবর ঐ আশা-উৎসাহেই পেট ভরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

শিশুরা শুইয়া শুইয়াই হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে,—তাহাদের সেই শরীর-সঞ্চালনের কোনো লক্ষ্য নাই। প্রথমাবস্থায় শক্তির এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট বিক্ষেপের একটা অর্থ আছে—কিন্তু সেই অকারণ হাত-পা-ছোঁড়া ক্রমে যদি তাহাকে সকারণ চেষ্টার জন্য প্রস্তুত করিয়া না তোলে, তবে তাহা ব্যাধি বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদেরও অল্প বয়সে উদ্যমগুলি প্রথমে কেবলমাত্র নিজের আনন্দেই বিক্ষিপ্তভাবে, উদ্দামভাবে চারিদিকে সঞ্চালিত হইতেছিল—তখনকার পক্ষে তাহা অদ্ভুত ছিল না, তাহা বিদ্রূপের বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমেই যখন দিন যাইতে লাগিল, এবং আমরা কেবল পড়িয়া-পড়িয়া অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিলাম, কিন্তু চলিতে লাগিলাম না, শরীরের আক্ষেপ-বিক্ষেপকেই অগ্রসর হইবার উপায় বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, তখন আর আনন্দের কারণ রহিল না—এবং এক সময়ে যাহা আবশ্যক ছিল, অন্য সময়ের পক্ষে তাহাই দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

আমাদের প্রথমবয়সে ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায়

প্রত্যক্ষ আছেন, তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই—লক্ষ্মী দূরে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্য্যন্ত কখনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়্‌রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গারিবল্‌ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং প্যাট্রিয়টিজমের ভাবরস-সম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে-দেশ প্রত্যক্ষ, তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখদুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীয় রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম—এমন অবস্থাতেও, এমন ফাঁকি দিয়াও, ফললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ববিধাতার চক্ষে ধূলা দিবার আয়োজন করিতে হয়।

"আইডিয়া" যত বড়োই হোক্, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হোক্, দীন হোক্, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলি করুণসুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ-কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্যভাণ্ডারের দিকে হতাশদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণ চীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরাণিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্দ্ধাসনে পরের পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

যাহাই হউক্, কিছুই হইল না। বিজয়ীর মতো বাহির হইলাম, ভিখারীর মতো পরের দ্বারে দাঁড়াইলাম, অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বসিয়া

সেভিংস্-ব্যাঙ্কের খাতা খুলিলাম। কারণ, যে ভারতমাতা, যে ভারতলক্ষ্মী কেবল সাহিত্যের ইন্দ্রধনুবাষ্পে রচিত, যাহা পরানুসরণের মৃগতৃষ্ণিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চেয়ে নিজের সংসারটুকু যে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ,—নিজের জঠরগহ্বরটা যে ঢের বেশি সুনির্দ্দিষ্ট—এবং ভারতমাতার অশ্রুধারা ঝিঁঝিট-খাম্বাজ-রাগিণীতে যতই মর্ম্মভেদী হউক্ না, ডেপুটিগিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণঝঙ্কারমধুর বেতনটি মিলে, তাহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাওয়া যায়, ইহা পরীক্ষিত। এম্‌নি করিয়া যে মানুষ একদিন উদারভাবে বিস্ফারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে সে যখন সেই ভাবপুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষবস্তুতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তখন সে আত্মম্ভরি স্বার্থপর হইয়া ব্যর্থভাবে দিনশেষ করে—একদিন যে-ব্যক্তি নিজের ধনপ্রাণ সমস্তই হঠাৎ দিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হয়, সে যখন দান করিবার কোনো লক্ষ্য নির্ণয় করিতে পারে না, কেবল সংকল্পকল্পনার বিলাসভোগেই আপনাকে পরিতৃপ্ত করে, সে একদিন এমন কঠিনহৃদয় হইয়া উঠে যে, উপবাসী স্বদেশকে যদি সুদূরপথে দেখে, তবে টাকা ভাঙাইয়া সিকিটি বাহির করিবার ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, শুদ্ধমাত্র ভাব যত বড়োই হউক্, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষবস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।

এইজন্যই বলিতেছিলাম, যাহা আমরা পুঁথি হইতে পড়িয়া পাইয়াছি, যাহাকে আমরা ভাবসম্ভোগ বা অহংকারতৃপ্তির উপায়স্বরূপ করিয়া রসালস-জড়ত্বের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ও ক্রমে অবসাদের মধ্যে অবতরণ করিতেছি, তাহাকে প্রত্যক্ষতার মূর্ত্তি, বাস্তবিকতার গুরুত্ব দান করিলে তবে আমরা রক্ষা পাইব। শুধু বড়ো জিনিস কল্পনা করিলেও হইবে না, বড়ো দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না এবং ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিলেও হইবে না, দ্বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোটো কাজ সুরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চর্চ্চা হইবে—সেই শক্তির চর্চ্চামাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতামাত্রেই আনন্দ।

আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ যে কী, তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব—কিন্তু নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও তো ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মতো পক্ককেশের নীচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাঙ্ক্ষার রাগিণী মনে যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে, তোমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম, সেই তীক্ষ্ম, সেই প্রভাতসূর্য্যরশ্মিনির্ম্মিত তন্তুর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই—উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্ব্বিচারে আত্মবিসর্জ্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে, তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র-বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই; আমি জানি স্বদেশ যখন অপমানিত হয়, আহত অগ্নির ন্যায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে—নিজের ব্যবসায়ের সংকীর্ণতা ও স্বার্থসাধনের চেষ্টা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাই; দেশের অভাব ও অগৌরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে, সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভৃত অবকাশকে আক্রমণ করে;—আমি জানি, ইতিহাসবিশ্রুত যে-সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্য, লোকহিতের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত, স্বার্থকে লজ্জিত ও দুঃখক্লেশকে অমরমহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া গেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে, তখন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মতো বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও না—তোমাদের সেই অনাঘ্রাত পুষ্প, অখণ্ড পুণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বত-বর্গের নামে আহ্বান করিতেছি—ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্ম্মের পথে।

কর্ম্মশালার প্রবেশদ্বার অতি ক্ষুদ্র, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের ন্যায় ইহা অভ্রভেদী নহে—কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নহে—গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্য দ্বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না; ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আসিতে হয়;—এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নতব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন, সেই মঙ্গল-বিধাতার নিকট। তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এ পর্য্যন্ত কেহ তো সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই;—দেশ যখন বিলাতি পিনাক বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল, তখন তোমরা পশ্চাৎপদ হও নাই—প্রাচীন শ্লোকে যে-স্থানটাকে শ্মশানের ঠিক পূর্ব্বেই বসাইয়াছেন সেই রাজদ্বারে তোমরা যাত্রা করিয়া

আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছ—আর আজ সাহিত্যপরিষদ্ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন, তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে? দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্ব্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটীরে পরিষদ্ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, সেখানে, বিদেশী লোকে কোনোদিন বিস্ময়দৃষ্টিপাত করে না, সেখান হইতে সংবাদপত্রবাহন খ্যাতি সমুদ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না—সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই—কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিস্‌মাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পারো, তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্ম্মে স্বদেশ-প্রেমকে সার্থক করো। তাহা হইলে অন্ততঃ এইটুকু বুঝিবে যে, যদি শক্তি থাকে তবে কর্ম্মও আছে, যদি প্রীতি থাকে তবে সেবার উপলক্ষের অভাব নাই, সেজন্য গবর্ণমেণ্টের কোনো আইন-পাসের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং কোনো অধিকারভিক্ষার প্রত্যাশায় রুদ্ধদ্বারের কাছে অনন্যকর্ম্মা হইয়া দিনরাত্রি যাপন করা অত্যাবশ্যক নহে।

আমার আশঙ্কা হইতেছে, অদ্যকার বক্তব্যবিষয়সম্বন্ধে আমি ঠিক মাত্রারক্ষা করিতে পারি নাই। কথাটা তো শুদ্ধমাত্র এই যে, দেশী ভাষার ব্যাকরণ চর্চ্চা করো, অভিধান সংকলন করো, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো। এই সামান্য প্রস্তাবের অবতারণার জন্য এমন করিয়া উচ্চভাবের দোহাই দিয়া দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করা কিছু যেন অসংগত হইয়াছে। হইয়াছে স্বীকার করি—কিন্তু কালের গতিকে এইরূপ অসংগত ব্যাপার আমাদের দেশে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে যদি বলা যায় যে, দেশের জন্য বক্তৃতা করো, তর্ক করো, সভা করো, তবে তাহা সকলেই অতি সহজেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু যদি বলা হয়, দেশকে জানো ও তাহার পরে স্বহস্তে যথাসাধ্য দেশের সেবা করো, তবে দেখিয়াছি, অর্থ বুঝিতে লোকের বিশেষ কষ্ট হয়। এমন অবস্থায় দেশেব প্রতি কর্ত্তব্যসম্বন্ধে দুটো-একটা সামান্য কথা বলিতে যদি অসামান্য বাক্যব্যয় করিয়া থাকি, তবে মার্জ্জনা করিতে হইবে। বস্তুতঃ সকাল-বেলায় যদি ঘন-কুয়াশা হইয়া থাকে, তবে অধীর হইয়া ফল নাই এবং

হতাশ হইবারও প্রয়োজন দেখি না—সূর্য্য সে কুয়াশা ভেদ করিবেনই এবং করিবামাত্র সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

আজ আমি অধীরভাবে অধিক আকাঙ্ক্ষা করিব না—অবিচলিত আশার সহিত, আনন্দের সহিত এই কথাই বলিব, নিবিড় কুজ্ঝটিকার মাঝে মাঝে ঐ যে বিচ্ছেদ দেখা যাইতেছে—সূর্য্যরশ্মির ছটা খরধার কৃপাণের মতো আমাদের দৃষ্টির আবরণ তিনচারি জায়গায় ভেদ করিয়াছে—আর ভয় নাই—গৃহদ্বারের সম্মুখেই আমাদের যাত্রা-পথ অনতিবিলম্বে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে—তখন দিগ্বিদিক্‌সম্বন্ধে দশজনে মিলিয়া দশপ্রকারের মত লইয়া ঘরে বসিয়া বাদবিতণ্ডা করিতে হইবে না—তখন সকলে আপন-আপন শক্তি অনুসারে আপন-আপন পথ নির্ব্বাচন করিয়া তর্ক-সভা হইতে, পুঁথির রুদ্ধকক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িব,—তখন নিকটের কাজকে দূর মনে হইবে না এবং অত্যাবশ্যক কাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা জন্মিবে না।

এই শুভলক্ষণ আসিবে বলিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে—সেইজন্য, পরিষদের অদ্যকার আহ্বান যদি তোমাদের অন্তরে স্থান না পায়, বাংলাদেশের ঘরের কথা জানাকে যদি তোমরা বেশি একটা কিছু বলিয়া মনে না করো—তবু আমি ক্ষুব্ধ হইব না এবং আমার যে মাতৃভূমি এতদিন তাঁহার সন্তানগণের গৃহ-প্রত্যাগমনের জন্য অনিমেষদৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিব, জননি, সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটীরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তানদের পদধ্বনি ঐ শোনা যাইতেছে,—এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ—তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোটো-বড়ো সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রুগদ্‌গদ আশীর্ব্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকো।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসবের দিন

সকালবেলায় অন্ধকার ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আলোক যেমনি ফুটিয়া বাহির হয়, অমনি বনে-উপবনে পাখীদের উৎসব পড়িয়া যায়। সে-উৎসব কিসের উৎসব? কেন এই সমস্ত বিহঙ্গের দল নাচিয়া-কুঁদিয়া গান গাহিয়া এমন অস্থির হইয়া উঠে? তাহার কারণ এই প্রতিদিন প্রভাতে আলোকের স্পর্শে, পাখীরা নূতন করিয়া আপনার প্রাণশক্তি অনুভব করে। দেখিবার শক্তি, উড়িবার শক্তি, খাদ্যসন্ধান করিবার শক্তি তাহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তোলে—আলোকে উদ্ভাসিত এই বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে সে আপনার প্রাণবান্, গতিবান্, চেতনাবান্ পক্ষিজন্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া অন্তরের আনন্দকে সংগীতের উৎসে উৎসারিত করিয়া দেয়।

জগতের যেখানে অব্যাহতশক্তির প্রচুর প্রকাশ, সেইখানেই যেন মূর্ত্তিমান্ উৎসব। সেইজন্য হেমন্তের সূর্য্যকিরণে অগ্রহায়ণের পক্কশস্যসমুদ্রে সোণার উৎসব হিল্লোলিত হইতে থাকে—সেইজন্য আম্রমঞ্জরীর নিবিড় গন্ধে ব্যাকুল নববসন্তে পুষ্পবিচিত্র কুঞ্জবনে উৎসবের উৎসাহ উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে আমরা নানাস্থানে নানাভাবে শক্তির জয়োৎসব দেখিতে পাই।

মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষ-ভাবে স্মরণ করে,—বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। যেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দ্বারা চালিত করি, সেদিন না—যেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বারা ক্ষুব্ধ করি, সেদিন না—যেদিন প্রাকৃতিক নিয়মপরম্পরার হস্তে আপনাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলীর মত ক্ষুদ্র ও জড়ভাবে অনুভব করি, সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে;—সেদিন ত আমরা জড়ের মত, উদ্ভিদের মত, সাধারণ জন্তুর মত—সেদিন ত আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্ব্বজয়ী মানবশক্তি উপলব্ধি করি না—সেদিন আমাদের আনন্দ কিসের? সেদিন আমরা গৃহে অবরুদ্ধ, সেদিন

আমরা কর্ম্মে ক্লিষ্ট—সেদিন আমরা উজ্জ্বলভাবে আপনাকে ভূষিত করি না—সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহ্বান করি না—সেদিন আমাদের ঘরে সংসারচক্রের ঘর্ঘর-ধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু সংগীত শোনা যায় না।

প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ—সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।

হে ভ্রাতৃগণ, আজ আমি তোমাদের সকলকে ভাই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছি—আজ, আলোক জ্বলিয়াছে, সংগীত ধ্বনিতেছে, দ্বার খুলিয়াছে—আজ মনুষ্যত্বের গৌরব আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে—আজ আমরা কেহ একাকী নহি—আজ আমরা সকলে মিলিয়া এক—আজ অতীত সহস্রবৎসরের অমৃতবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে—আজ অনাগত সহস্রবৎসর আমাদের কণ্ঠস্বরকে বহন করিবার জন্য সম্মুখে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

আজ আমাদের কিসের উৎসব? শক্তির উৎসব। মানুষের মধ্যে কি আশ্চর্য্যশক্তি আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে! আপনার সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মানুষ কোন্ ঊর্দ্ধ্বে গিয়া দাঁড়াইয়াছে! জ্ঞানী জ্ঞানের কোন্ দুর্লক্ষ্য দুর্গমতার মধ্যে ধাবমান হইয়াছে, প্রেমিক প্রেমের কোন্ পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, কর্ম্মী কর্ম্মের কোন্ অশ্রান্ত দুঃসাধ্য সাধনের মধ্যে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়াছে? জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে মানুষ যে অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছে, আজ আমরা সে-শক্তির গৌরব স্মরণ করিয়া উৎসব করিব। আজ আমরা আপনাকে, ব্যক্তিবিশেষ নহে, কিন্তু মানুষ বলিয়া জানিয়া ধন্য হইব।

মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। পশুর জন্য মাঠ ভরিয়া তৃণ পড়িয়া আছে, মানুষকে অন্নের জন্য প্রাণপণ করিয়া মরিতে হয়! প্রতিদিন আমরা যে অন্নগ্রহণ করিতেছি, তাহার পশ্চাতে মানুষের বুদ্ধি, মানুষের উদ্যম, মানুষের উদ্যোগ রহিয়াছে—আমাদের অন্নমুষ্টি আমাদের গৌরব। পশুর গাত্রবস্ত্রের অভাব একদিনের জন্যও নাই, মানুষ উলঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। শক্তির দ্বারা আপন স্বভাবকে জয় করিয়া মানুষকে আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে হইয়াছে—গাত্রবস্ত্র মনুষ্যত্বের গৌরব। আত্মরক্ষার উপায় সঙ্গে লইয়া মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই, আপন শক্তির দ্বারা তাহাকে আপন অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে

হইয়াছে—কোমল ত্বক্ এবং দুর্ব্বল শরীর লইয়া মানুষ যে আজ সমস্ত প্রাণি-সমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে, ইহা মানবশক্তির গৌরব। মানুষকে দুঃখ দিয়া ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করিয়াছেন,—তাহাকে নিজের পূর্ণশক্তি অনুভব করিবার অধিকারী করিয়াছেন।

মানুষের এই শক্তি যদি নিজের প্রয়োজন-সাধনের সীমার মধ্যেই সার্থকতা লাভ করিত, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলেও আমরা জগতের সমস্ত জীবের উপরে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের শক্তির মধ্যে কোন্ মহাসমুদ্র হইতে একি জোয়ার আসিয়াছে—সে আমাদের সমস্ত অভাবের কূল ছাপাইয়া, সমস্ত প্রয়োজনকে লঙ্ঘন করিয়া অহর্নিশ অক্লান্ত উদ্যমের সহিত এ কোন্ অসীমের রাজ্যে, কোন্ অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে! যাহাকে জানিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিতেছে. তাহাকে জানিবার ইহার কি প্রয়োজন? যাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ইহার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার সহিত ইহার আবশ্যকের সম্বন্ধ কোথায়? যাহার কর্ম্ম করিবার জন্য এ আপনার আরাম, স্বার্থ, এমন কি, প্রাণকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিতেছে, তাহার সঙ্গে ইহার দেনা-পাওনার হিসাব লেখা থাকিতেছে কই? আশ্চর্য্য! ইহাই আশ্চর্য্য! আনন্দ! ইহাই আনন্দ! যেখানটায় মানুষের সমস্ত আবশ্যক সীমার বাহিরে চলিয়া গেছে, সেইখানেই মানুষের গভীরতম, সর্ব্বোচ্চতম শক্তি সর্ব্বদাই আপনাকে স্বাধীন আনন্দে উধাও করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। জগতের আর কোথাও ইহার কোনো তুলনা দেখি না। মনুষ্যশক্তির এই প্রয়োজনাতীত পরম গৌরব অদ্যাকার উৎসবে আনন্দসঙ্গীতে ধ্বনিত হইতেছে। এই শক্তি অভাবের উপরে জয়ী, ভয়শোকের উপরে জয়ী, মৃত্যুর উপরে জয়ী। আজ অতীত-ভবিষ্যতের সুমহান্ মানবলোকের দিকে দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক মানবাত্মার মধ্যে এই অভ্রভেদী চিরন্তনশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে সার্থক করিব।

একদা কত-সহস্র-বৎসর পূর্ব্বে মানুষ এই কথা বলিয়াছে—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অন্ধকারের পরপারবর্ত্তী। এই প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে ইহাই আমাদের জানা আবশ্যক যে, কোথায় আমাদের খাদ্য,

কোথায় আমাদের খাদক, কোথায় আমাদের আরাম, কোথায় আমাদের ব্যাঘাত—কিন্তু এই সমস্ত জানাকে বহুদূরে পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষ চির-রহস্য অন্ধকারের এ কোন্ পরপারে, এ কোন্ জ্যোতির্লোকে কিসের প্রত্যাশায় চলিয়া গেছে। মানুষ এই যে তাহার সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অভ্যন্তরেও সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছে, আজ আমরা মানুষের সেই আশ্চর্য্য জ্ঞানের গৌরব লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। যে জ্ঞানের শক্তি কোনো সংকীর্ণতা, কোনো নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যকের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহে না, যে জ্ঞানের শক্তি কেবল মাত্র মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য সীমাহীনের মধ্যে পরম সাহসের সহিত আপন পক্ষ বিস্তার করিয়া দেয়—যে তেজস্বী জ্ঞান আপন শক্তিকে কোনো প্রয়োজনসাধনের উপায়রূপে নহে, পরন্তু চরমশক্তিরূপেই অনুভব করিবার জন্য অগ্রসর—মনুষ্যত্বের মধ্যে অদ্য আমরা সেই জ্ঞান, সেই শক্তিকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব।

কত-সহস্র-বৎসর পূর্ব্বে মানুষ একদা এই কথা উচ্চারণ করিয়াছে—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন!—ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না। এই পৃথিবীতে যেখানে প্রবল দুর্ব্বলকে পীড়ন করিতেছে, যেখানে ব্যাধি-বিচ্ছেদ-মৃত্যু প্রতিদিনের ঘটনা, বিপদ্ যেখানে অদৃশ্য থাকিয়া প্রতি পদক্ষেপে আমাদের প্রতীক্ষা করে এবং প্রতিকারের উপায় যেখানে অধিকাংশস্থলে আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, সেখানে মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া একি কথা বলিয়াছে যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন! আজ আমরা দুর্ব্বল মানুষের মুখের এই প্রবল অভয়বাণী লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। সহস্রশীর্ষ ভয়ের করাল কবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারিয়াছে, ব্রহ্ম আছেন, ভয় নাই—অদ্য আপনাকে সেই মানুষের অন্তর্গত জানিয়া গৌরব লাভ করিব। বহু-সহস্র-বৎসর পূর্ব্বেও উচ্চারিত এই বাণী আজিও ধ্বনিত হইতেছে—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরো যদয়মাত্মা—

অন্তরতর এই যে আত্মা ইনি এই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়,

অন্য সমস্ত হইতেই প্রিয়। সংসারের সমস্ত স্নেহপ্রেমের সামগ্রীর মধ্যে মানুষের যে প্রেম সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় নাই, সংসারের সমস্ত প্রিয়পদার্থের অন্তরে তাহার অন্তরতর যে প্রিয়তম, যিনি সমস্ত আত্মীয়পরের অন্তরতর, যিনি সমস্ত দূর নিকটের অন্তরতর, তাঁহার প্রতি যে প্রেম এমন প্রবল আবেগে, এমন অসংশয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে—আমরা জানি, মানুষের যে পরমতম প্রেম আপনার সমস্ত প্রিয়সামগ্রীকে এক মুহূর্ত্তে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়, মানুষের সেই পরমাশ্চর্য্য প্রেমশক্তির গৌরব অদ্য আমরা উপলব্ধি করিয়া উৎসব করিতে সমাগত হইয়াছি।

সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সেরূপ দেখিয়াছি, স্বদেশীয়-স্বদলের জন্য আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি—পিপীলিকাকেও, মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে—বৎস যেমন গাভী-মাতার পূর্ণ স্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো-শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্য্যে আপনাকে নির্ব্বিশেষে সর্ব্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশতঃ নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্য্যবশতই আপনাকে নির্ব্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি। বুদ্ধদেব বলিয়াছেনঃ—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

তিঠ্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাব তস্‌স বিগতমিদ্ধো।
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয়ং ব্রহ্মমেতং বিহারমিদমাহু।।

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্দ্ধদিকে, অধোদিকে, চতুর্দ্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্ম-বিহার বলে।

এই যে ব্রহ্ম-বিহারের কথা ভগবান্‌ বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে--আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্ম-বিহার—এই সমস্ত-আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না—এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মত সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্য্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট্‌ অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্ম্ম-বিস্তারকার্য্যে, মঙ্গলসাধনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কি সুতীব্র, তাহা আমরা সকলেই জানি—সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মত গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না—ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে—ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্য্যাপ্ত প্রাচুর্য্য—ইহা সহসা চক্রবর্ত্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে একমুহূর্ত্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড় বড় রাজার

বড় বড় সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত, ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির মহান্ আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গৌরব হইতে, তাহার সহায়তা হইতে মানুষ আর কোনোদিন বঞ্চিত হইবে না। আজ মানুষের মধ্যে, সমস্ত-স্বার্থজয়ী এই অদ্ভুত মঙ্গল-শক্তির মহিমা স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত-অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মানুষের এই সকল মহত্ত্ব আজ আমাদের দীনতমকে আমাদের শ্রেষ্ঠতমের সহিত এক গৌরবের বন্ধনে মিলিত করিয়াছে। আজ আমরা মানুষের এই সকল অবারিত সাধারণসম্পদের সমান অধিকারের সূত্রে ভাই হইয়াছি—আজ মনুষ্যত্বের মাতৃশালায় আমাদের ভ্রাতৃসম্মিলন।

ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতিরুন্মেষের মধ্যে দেখিয়াছি—ফাল্গুনের পুষ্পপর্য্যাপ্তির মধ্যে দেখিয়াছি—মহাসমুদ্রের নীলাম্বুনৃত্যের মধ্যে দেখিয়াছি—কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট্ বিকাশ দেখিতে সমাগত হই, সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব। মনুষ্যত্বের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা যে শত শত অভ্রভেদী শিখরমালায় জাগ্রত-বিরাজিত সেখানে সেই উত্তুঙ্গ শৈলাশ্রমে আমরা মানবমাহাত্ম্যের ঈশ্বরকে মানবসঙ্ঘের মধ্যে বসিয়া পূজা করিতে আসিয়াছি।

আমাদের ভারতবর্ষে সমস্ত উৎসবই এই মহান্ ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ-কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের জীবনের যে-সমস্ত ঘটনাকে উৎসবের ঘটনা করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটাতেই আমরা বিশ্বমানবের গৌরব অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। জন্মোৎসব হইতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্য্যন্ত কোনোটাকেই আমরা ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্রতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি নাই। এই সকল উৎসবে আমরা সংকীর্ণতা বিসর্জন দিই—সেদিন আমাদের গৃহের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত হইয়া যায়, কেবল আত্মীয়স্বজনের জন্য নহে, কেবল বন্ধুবান্ধবের জন্য নহে, রবাহূত-অনাহূতের জন্য। পুত্র যে জন্মগ্রহণ করে, সে আমার ঘরে নহে, সমস্ত মানুষের ঘরে। সমস্ত মানুষের গৌরবের অধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। তাহার জন্ম-মঙ্গলের আনন্দে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করিব না? সে যদি শুদ্ধমাত্র আমার ঘরে ভূমিষ্ঠ হইত, তবে তাহার মত দীনহীন জগতে আর কে থাকিত! সমস্ত মানুষ যে তাহার জন্য অন্ন, বস্ত্র, আবাস, ভাষা, জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের

অন্তরস্থিত সেই নিত্যচেতন মঙ্গলশক্তির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সে যে একমুহূর্ত্তে ধন্য হইয়াছে। তাহার জন্ম উপলক্ষে একদিন গৃহের সমস্ত দ্বার খুলিয়া দিয়া যদি সমস্ত মানুষকে স্মরণ না করি, তবে কবে করিব? অন্য সমাজ যাহাকে গৃহের ঘটনা করিয়াছে; ভারতসমাজ তাহাকে জগতের ঘটনা করিয়াছে; এবং এই জগতের ঘটনাই জগদীশ্বরের পূর্ণমঙ্গল আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিবার যথার্থ অবকাশ। বিবাহব্যাপারকেও ভারতবর্ষ কেবলমাত্র পতি-পত্নীর আনন্দমিলনের ঘটনা বলিয়া জানে না। প্রত্যেক মঙ্গলবিবাহকে মানব-সমাজের এক-একটি স্তম্ভস্বরূপ জানিয়া ভারতবর্ষ তাহা সমস্ত মানবের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে—এই উৎসবেও ভারতের গৃহস্থ সমস্ত মনুষ্যকে অতিথিরূপে গৃহে অভ্যর্থনা করে—তাহা করিলেই যথার্থভাবে ঈশ্বরকে গৃহে আবাহন করা হয়—শুদ্ধমাত্র ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেই হয় না। এইরূপে গৃহের প্রত্যেক বিশেষ ঘটনায় আমরা এক-একদিন গৃহকে ভুলিয়া সমস্ত মানবের সহিত মিলিত হই এবং সেইদিন সমস্ত মানবের মধ্যে ঈশ্বরের সহিত আমাদের মিলনের দিন।

হায়, এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি। এককালে যাহা বিনয়রসাপ্লুত মঙ্গলের ব্যাপার ছিল, এখন তাহা ঐশ্বর্য্যমদোদ্ধত আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের হৃদয় সংকুচিত, আমাদের দ্বার রুদ্ধ। এখন কেবল বন্ধুবান্ধব এবং ধনিমানী ছাড়া মঙ্গলকর্ম্মের দিনে আমাদের ঘরে আর কাহারো স্থান হয় না। আজ আমরা মানবসাধারণকে দূর করিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র করিয়া, ঈশ্বরের বাধাহীন পবিত্রপ্রকাশ হইতে বঞ্চিত করিয়া বড় হইলাম বলিয়া কল্পনা করি। আজ আমাদের দীপালোক উজ্জ্বলতর, খাদ্য প্রচুরতর, আয়োজন বিচিত্রতর হইয়াছে—কিন্তু মঙ্গলময় অন্তর্য্যামী দেখিতেছেন আমাদের শুষ্কতা, আমাদের দীনতা, আমাদের নির্লজ্জ কৃপণতা। আড়ম্বর দিনে দিনে যতই বাড়িতেছে, ততই এই দীপালোকে, এই গৃহসজ্জায়, এই রসলেশশূন্য কৃত্রিমতার মধ্যে সেই শান্ত-মঙ্গলস্বরূপের প্রশান্ত-প্রসন্ন মুখচ্ছবি আমাদের মদান্ধ দৃষ্টিপথ হইতে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। এখন আমরা কেবল আপনাকেই দেখিতেছি, আপনার স্বর্ণ রৌপ্যের চাকচিক্য দেখাইতেছি, আপনার নাম শুনিতেছি ও শুনাইতেছি।

হে ঈশ্বর, তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান কর!—বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান কর! আজ উৎসবের দিন, শুদ্ধমাত্র ভাবরসসম্ভোগের দিন নহে,

শুদ্ধমাত্র মাধুর্য্যের মধ্যে নিমগ্ন হইবার দিন নহে—আজ বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তিসংগ্রহের দিন। আজ তুমি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাত্যহিক জড়ত্ব, প্রাত্যহিক ঔদাসীন্য হইতে উদ্বোধিত কর, প্রতিদিনের নির্বীর্য্য নিশ্চেষ্টতা হইতে,—আরাম-আবেশ হইতে উদ্ধার কর! যে কঠোরতায়, যে উদ্যমে, যে আত্মবিসর্জনে আমাদের সার্থকতা, তাহার মধ্যে আজ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কর! আমরা এতগুলি মানুষ একত্র হইয়াছি ; আজ যদি, যুগে যুগে তোমার মনুষ্যসমাজের মধ্যে যে সত্যের গৌরব, যে প্রেমের গৌরব, যে মঙ্গলের গৌরব, যে কঠিনবীর্য্য নির্ভীক মহত্ত্বের গৌরব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা না দেখিতে পাই, দেখি কেবল ক্ষুদ্র দীপের আলোক, তুচ্ছ ধনের আড়ম্বর, তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল—যুগে যুগে মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে যে সকল অভয়বাণী—অমৃতবাণী উৎসারিত হইয়াছে, তাহা যদি মহাকালের মঙ্গলশঙ্খনির্ঘোষের মত আজ না শুনিতে পাই—শুনি কেবল লৌকিকতার কলকলা' এবং সাম্প্রদায়িকতার বাগ্‌বিন্যাস—তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল! এই সমস্ত ধনাড়ম্বরের নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া একবার সেই সমস্ত পবিত্র দৃশ্যের মধ্যে লইয়া যাও—যেখানে ধূলিশয্যায় নগ্নদেহে তোমার সাধক বসিয়া আছেন—যেখানে তোমার সর্ব্বত্যাগী সেবক কর্ত্তব্যের কঠিনপথে রিক্তহস্তে ধাবমান হইয়াছেন—যেখানে তোমার বরপুত্রগণ দারিদ্র্যের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, বিষয়ীদের দ্বারা পরিত্যক্ত, মদান্ধদের দ্বারা অপমানিত। হায় দেব, সেখানে কোথায় দীপচ্ছটা, কোথায় বাদ্যোদ্যম, কোথায় স্বর্ণভাণ্ডার, কোথায় মণিমাল্য! কিন্তু সেইখানে তেজ, সেইখানে শক্তি, সেইখানে দিব্যৈশ্বর্য্য, সেইখানেই তুমি! দূর কর এই সমস্ত আবরণ-আচ্ছাদন, এই সমস্ত ক্ষুদ্র দম্ভ, এই সমস্ত মিথ্যা কোলাহল, এই সমস্ত অপবিত্র আয়োজন—মনুষ্যত্বের সেই অভ্রভেদিচূড়াবিশিষ্ট নিরাভরণ নিস্তব্ধ রাজনিকেতনের দ্বারের সম্মুখে অদ্য আমাকে দাঁড় করাইয়া দাও! সেখানে, সেই কঠিন ক্ষেত্রে, সেই রিক্ত নির্জনতার মধ্যে, সেই বহুযুগের অনিমেষ দৃষ্টিপাতের সম্মুখে তোমার নিকট হইতে দীক্ষা লইব, প্রভু!

দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ! অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু! তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ

ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে!
কর মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়! পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলঙ্কার! ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে!

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেকালের সুখদুঃখ

নবাব সিরাজদ্দৌলার নাম সকলের কাছেই চিরপরিচিত। তিনি অতি অল্পদিন মাত্র বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন; কিন্তু সেই অল্পদিনের মধ্যেই স্বদেশে এবং বিদেশে আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। সিরাজদ্দৌলা নাই। তাঁহার সময়ে যে বাঙ্গালা দেশ ছিল, সে বাঙ্গালা দেশও নাই। মোগল বাদশাহেরা "সমুদয় মানব জাতির স্বর্গতুল্য বঙ্গভূমি" বলিয়া অনুশাসনপত্রে যাহার উল্লেখ করিতেন, সে স্বর্গ এখন গৌরবচ্যুত। সে শিল্প নাই, সে বাণিজ্য নাই, জমীদারদিগের সে জীবন-মরণের বিচারক্ষমতা নাই,—সে বাহুবল, সে রণকৌশল—সকলই এখন ইতিহাসগত অতীত কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সিরাজদ্দৌলা যে সময়ের লোক, সে সময় এখন বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে।

সেকালের সকল চিত্রই এত পুরাতন, এত জরাজীর্ণ, এত অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন আর ভাল করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বিচার করিবার উপায় নাই। বহুদিন হইতে এ দেশ হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি বলিয়া পরিচিত

হইয়াছে; গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে বহুদিন হইতে হিন্দু-মুসলমান বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে জন্মভূমির রণপতাকা বহন করিতেছে। সিরাজদ্দৌলার সময়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মগত পার্থক্য ছিল; কিন্তু ক্ষমতাগত, পদগৌরবগত কোনই পার্থক্য ছিল না। মুসলমানের শিষ্টাচার. মুসলমানের প্রয়োজনাতীত-সৌজন্য-পরিপ্লুত, শ্লথ-বিন্যস্ত, শ্রুতিসুমধুর, সুমার্জ্জিত যাবনিক ভাষা এবং পদবিজ্ঞাপক যাবনিক উপাধি গৌরবের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সমভাবে ব্যবহার করিতেন।

দিল্লীর বাদশাহ নামমাত্র বাদশাহ ; বাঙ্গালার নবাবই বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত "মা-বাপ" হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই নবাব-দরবারে হিন্দু-মুসলমানের কোনরূপ আসনগত পার্থক্য বা ক্ষমতাগত তারতম্য ছিল না, বরং অনেকাংশে হিন্দুদিগেরই বিশেষ প্রাধান্য জন্মিয়াছিল। বিলাসলোলুপ মুসলমান ওমরাহগণ আহার-বিহার লইয়াই সমধিক ব্যস্ত থাকিতেন; কর্ম্মকুশল হিন্দু অধিবাসিগণ, কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেহ কোষাধ্যক্ষ. কেহ-বা সেনানায়ক হইয়া বুদ্ধিবলে, শাসনকৌশলে, বাহুবিক্রমে বাঙ্গালা দেশের ভাগ্য-বিবর্ত্তন করিতেন।

মুসলমান নবাব আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। বাঙ্গালা দেশই তাঁহার স্বদেশ, এবং বাঙ্গালী জাতিই তাঁহার স্বজাতি হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকোষের ধনরত্ন বাঙ্গালা দেশেই সঞ্চিত থাকিত ; যাহা ব্যয় হইত, তাহাও বাঙ্গালীগণ কেহ দ্রব্য-বিনিময়ে, কেহ শ্রম-বিনিময়ে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে পারিত। দেশের টাকা দেশেই থাকিত. তাহা সাত সমুদ্র তের নদী পারে চির-নির্ব্বাসিত হইত না।

সেই একদিন আর এই একদিন। আজ সে দিনের বিলুপ্ত কাহিনীর আলোচনা করিতে হইলে অতীতের স্বপ্ন-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া বাস্তব রাজ্যের বাস্তব চিত্রপটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে ; সেকালের চক্ষু লইয়া, সেকালের প্রাণ লইয়া সেকালের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে হইবে। সে ইতিহাস কেবল হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার মর্ম্ম-বেদনার ইতিহাস নহে,—তাহা আমাদিগের পূজনীয় পিতাপিতামহের সুখদুঃখের ইতিহাস।

সিরাজদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গালা দেশ ১৩ চাক্‌লায় এবং ১,৬৬০ পরগনায় বিভক্ত ছিল। পরগনাগুলি কোন-না-কোন জমীদারের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারা বাহুবলে আপন আপন রাজ্য রক্ষা করিয়া, বিচারবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া, যথাকালে নবাব-সরকারে রাজস্ব দিতে পারিলে তাঁহাদের

স্বাধীন-শক্তির প্রবল প্রতাপে কেহই বাধা দিতে চাহিত না। চাক্‌লায় চাক্‌লায় এক একজন হিন্দু অথবা মুসলমান "ফৌজদার" অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা থাকিতেন ; তাঁহারা যথাকালে রাজস্ব-সংগ্রহের সাহায্য করা ভিন্ন অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। গঙ্গা, ভাগীরথী, ব্রহ্মপুত্র বাঙ্গালীর বাণিজ্য-ভাণ্ডার বহন করিত ; সে বাণিজ্যে জেতৃ-বিজিত বলিয়া শুল্কদানের কোনরূপ তারতম্য ছিল না। মুসলমান নবাব কোন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাত্রমিত্র লইয়া দরবার করিতেন, কিন্তু অভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে প্রায়ই মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইতেন না। জগৎ-শেঠের ইতিহাস-বিখ্যাত বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বাদশাহের নামে স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা মুদ্রিত হইত ; পরগনাধিপতি জমীদারগণ জগৎ-শেঠের কোষাগারে রাজস্ব ঢালিয়া দিয়া মুক্তিপত্র গ্রহণ করিতেন, এবং কখন কখন শিষ্টাচারের অনুরোধে রাজধানীতে আসিয়া কাবা-চাপকান পরিয়া, উষ্ণীষ বাঁধিয়া, জানু পাতিয়া মুসলমানী প্রথায় নবাব-দরবারে সমাসীন হইতেন।

দেশে যে অত্যাচার-অবিচার ছিল না তাহা নহে ; বরং অনেক সময়েই দেশে ভয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইত। কিন্তু সে অরাজকতায় জমীদার ও মহাজন যতই উৎপীড়িত হন না কেন, কৃষক-কুটীরে তাহার ছায়াস্পর্শ হইত না। কৃষক যথাকালে হল চালনা করিয়া, যথা-প্রাপ্য শস্য সঞ্চয় করিয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া যথাসম্ভব নিরুদ্বেগেই কালযাপন করিত। দেশে দস্যু-তস্করের উৎপীড়নের অভাব ছিল না, কিন্তু দেশের লোকের অস্ত্রশস্ত্র-ব্যবহারেও কোনরূপ নিষেধ ছিল না। সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকেরাও লাঠি-তরবারি চালনা করিতে জানিতেন। দস্যু-তস্করের উপদ্রব হইলে গ্রামের লোকে দল বাঁধিয়া, রাত্রি জাগিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, মশাল জ্বালাইয়া, তরবারি ভাঁজিয়া, বর্শা চালাইয়া আত্মরক্ষা করিত। দস্যু-তস্কর ধরা পড়িলে গ্রামবাসীরাই দশজনে মিলিয়া প্রয়োজনাতীত উত্তম-মধ্যম দিয়া সংক্ষেপে বিচারকার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিত।

ইহাতে যেমন দুঃখ ছিল, সেইরূপ সুখও ছিল। আজকাল দস্যু-তস্করে উপদ্রব করিলে কেহ কাহারও সাহায্য করিতে বাহির হয় না ; অসহায় গৃহস্থ ঘরে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। দস্যুদল সর্ব্বস্ব লুটিয়া, মানসম্ভ্রম পদদলিত করিয়া, হেলিতে দুলিতে ধীরে ধীরে বহুদূরে চলিয়া গেলে গৃহস্থ পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া থানায় গিয়া পুলিসে সংবাদ দিয়া আসে। দারোগা, বক্‌সী, কনেষ্টবল এবং চৌকীদার মহাশয় অবসর-অনুসারে একে একে শুভাগমন

করিলে গৃহস্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া একহাতে চোখের জল মুছিতে মুছিতে, আর একহাতে তাঁহাদের যথাযোগ্য মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য ঋণ-গ্রহণে বাহির হয়। দস্যু-তস্কর ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, সন্দেহে পড়িয়া অনেক গরীবকে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়; দুই-এক স্থলে মিথ্যা অভিযোগ বলিয়া গৃহস্থকে রাজদ্বারে বিলক্ষণ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। সেকালে সুবিচারের সূক্ষ্মযন্ত্র ছিল না. সুতরাং কাহাকেও বিচার-বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না।

অনেক বিষয়ে অসুবিধা ছিল, কিন্তু অনেক বিষয়ে সুবিধাও ছিল। পথঘাট ছিল না, ত্বরিত গমনের সদুপায় ছিল না, দাতব্য-চিকিৎসালয় এবং বিনামূল্যে বিতরণীয় ঔষধালয় ছিল না;—কিন্তু লোকের ধনধান্য ছিল, স্বাস্থ্য ও বাহুবল ছিল; হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া দেশে দেশে ছুটিয়া বেড়াইবার বিশেষ প্রয়োজন হইত না। লোকে ঘরে বসিয়া হাতে-লেখা তুলট-কাগজের রামায়ণ মহাভারত পড়িত, অবসর-সময়ে কবিকঙ্কণের চন্ডীর গান গাহিত, এবং আপন আপন বাসস্থলে নিপুণভাবে, প্রসন্নচিত্তে আপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। অভাব অল্প হইলে দুঃখও অল্প হইয়া থাকে। সভ্যতাবিরোধী সুচিক্কণ সূক্ষ্ম-বস্ত্রের জন্য সকলেই লালায়িত হইত না; দেশের মোটা ভাত মোটা কাপড়েই অধিকাংশ লোকের এক রকম দিন চলিয়া যাইত। পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের অথবা তাঁহার বেত্রদণ্ডের মহিমায় যথাসম্ভব বিদ্যাভ্যাস করিয়া বালকেরা অবসর-সময়ে মাঠে মাঠে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত; কখনও-বা ঘোড়া ধরিয়া তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠে নিতান্ত অসঙ্গতরূপে একজনের স্থানে দুই-তিনজন চাপিয়া বসিত: কখনও-বা বর্ষার জলে—নদ, নদী, খাল, বিলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া সাঁতার কাটিত; সময়ে-অসময়ে গৃহস্থের গরু-বাছুর চরাইয়া, হাট-বাজার বহিয়া, দিনশেষে ঠাকুরমার উপকথায় হুঁ দিতে দিতে স্নেহের কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। যুবকদল দিবসে তাস-পাশা খেলিয়া, দাবা-ব'ড়ে টিপিয়া, বৈকালে লাঠি-তরবারি ভাঁজিত; সন্ধ্যা-সমাগমে সযত্ন-বিন্যস্ত লম্বা কোঁচা দোলাইয়া, অনাবৃত দেহ-সৌষ্ঠবের গৌরব বাড়াইবার জন্য কাঁধের উপর রঙিন গামছা ছড়াইয়া দিয়া, বাব্‌রী-চুলে চিরুনী গুঁজিয়া, শুক-সারী, অথবা নিতান্ত অভাবপক্ষে একটা পোষা বুল্‌বুল্‌ হাতে লইয়া, তাম্বূল-রাগ-রঞ্জিত অধরোষ্ঠে মৃদুমন্দ শিস্‌ দিতে দিতে পাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইত। বৃদ্ধেরা গৃহকর্ম্ম সারিয়া পর্য্যাপ্ত ভোজনের পর তৈলাক্ত স্নিগ্ধতনু দিবা-নিদ্রায় সমাহিত করিয়া, সায়াহ্নে তামাকু সেবনের জন্য

চণ্ডীমণ্ডপে, নদীসৈকতে অথবা বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া দেশের কথা, দশের কথা, কত কি আবশ্যক-অনাবশ্যক বিষয়ের মীমাংসা করিয়া সন্ধ্যার পর হরিসংকীর্ত্তনে অথবা পুরাণশ্রবণে ভক্তি-গদ্‌গদ-হৃদয়ে নিমগ্ন হইতেন। সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মীরূপিণী অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাঁহারা দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও পোষ্যবর্গের সেবা করিয়া, সময়ে-অসময়ে ছেলে ঠেংগাইয়া, নথ নাড়িয়া, চুল খুলিয়া সন্ধ্যার শীতল বাতাসে পুকুর-ঘাট আলো করিয়া বসিতেন ; কত কথা, কত রঙ্গরস—তাহার সঙ্গে প্রৌঢ়ার সগর্ব্ব-হস্তসঞ্চালন, নবীনার অবগুণ্ঠন-জড়িত অস্ফুট সখী-সম্ভাষণ, এবং স্থবিরার স্খলদ্‌বচনে শিবমহিম্নঃস্তোত্রের বিকৃত আবৃত্তি সান্ধ্য সম্মিলনকে কতই মধুময় করিয়া তুলিত!

সে দিন আর নাই; এখন আমরা সভ্য হইয়াছি। বালকেরা দন্তোদ্‌গমের পূর্ব্বেই ক, খ ধরিয়া পাঁচ ঘণ্টা স্কুলের কঠিন কাষ্ঠাসনে কখন দাঁড়াইয়া, কখনও-বা বসিয়া, বৈকালে গৃহশিক্ষকের তীব্র তাড়না সহ্য করিয়া আহার না করিতেই ঘুমাইয়া পড়ে ; যুবারা হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া চাকুরীর আশায়, উমেদারীর আশায়, কখনও-বা শুধু একখানি প্রশংসাপত্র পাইবার আশায় দেশে-দেশে ছুটাছুটি করিয়া অল্প দিনেই অধ্যয়নক্লিষ্ট দুর্ব্বল দেহে নিতান্ত অসময়েই স্থবিরত্ব লাভ করে; বৃদ্ধেরা অনাবশ্যক উৎসাহে সেকালের জীর্ণ খুঁটার সঙ্গে উড্ডীয়মান জাতীয় জীবনকে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য পাড়ায়-পাড়ায় দলাদলির বৈঠক করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি করেন : আর সমাজের যাঁহারা লক্ষ্মী-রূপিণী, সেই অর্দ্ধাঙ্গিনীগণ অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনে স্বামিপুত্রের সঙ্গে দেশে-দেশে ফিরিয়া কেবল অনাবশ্যকরূপে চিকিৎসকের এবং স্বর্ণকারের ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। এ সকল যদি একালের সুখের চিত্র বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি, তবে সেকালে দেশের লোকের সুখশান্তির একেবারেই অভাব ছিল বলিয়া উপহাস করা শোভা পায় না।

—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

স্বদেশমন্ত্র

বাহ্য জাতির সংঘর্ষে ভারত ক্রমে বিনিদ্র হইতেছে। এই অল্প জাগরূকতার ফলস্বরূপ স্বাধীন চিন্তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ। একদিকে প্রত্যক্ষ শক্তি-সংগ্রহ-রূপ, প্রমাণ-বাহন, শতসূর্য্য-জ্যোতিঃ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দৃষ্টি-প্রতিঘাতী প্রভা ; অপরদিকে স্বদেশী বিদেশী বহু মনীষীর উদ্ঘাটিত, যুগ-যুগান্তরের সহানুভূতিযোগে সর্ব্বশরীরে ক্ষিপ্রসঞ্চারী, বলদ, আশাপ্রদ, পূর্ব্বপুরুষদিগের অপূর্ব্ব বীর্য্য, অমানব প্রতিভা ও দেবদুর্লভ অধ্যাত্মতত্ত্ব-কাহিনী।

একদিকে জড়বিজ্ঞান, প্রচুর ধনধান্য, প্রভূত বলসঞ্চয়, তীব্র ইন্দ্রিয়সুখ, বিজাতীয় ভাষায় মহাকোলাহল উত্থাপিত করিয়াছে ; অপরদিকে এই মহাকোলাহল ভেদ করিয়া, ক্ষীণ অথচ মর্ম্মভেদী স্বরে, পূর্ব্ব-দেবদিগের আর্ত্তনাদ কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্রিত পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুল নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গীতে অপূর্ব্ব বাসনার উদয় করিতেছে ; আবার মধ্যে মধ্যে সে দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়া, ব্রত, উপবাস, সীতা, সাবিত্রী, তপোবন, জটাবল্কল, কাষায়, কৌপীন, সমাধি, আত্মানুসন্ধান ইত্যাদির দৃশ্য উপস্থিত হইয়াছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজের স্বার্থপর স্বাধীনতা, অপরদিকে আর্য্যসমাজের কঠোর আত্ম-বলিদান। এ বিষম সংঘর্ষে সমাজ যে আন্দোলিত হইবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? পাশ্চাত্ত্য দেশে উদ্দেশ্য—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ভাষা—অর্থকরী বিদ্যা, উপায়—রাজনীতি। ভারতে উদ্দেশ্য—মুক্তি, ভাষা—বেদ, উপায়—ত্যাগ। বর্ত্তমান ভারত একবার যেন বুঝিতেছে—বৃথা ভবিষ্যৎ অধ্যাত্ম কল্যাণের মোহে পড়িয়া ইহলোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি, আবার মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতেছে—

"ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ।
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।।"

একদিকে, নব্য ভারত-ভারতী বলিতেছেন, পতি-পত্নী-নির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত ; কারণ, যে বিবাহ আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব : অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত ; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।

একদিকে, নব্য ভারত বলিতেছেন. পাশ্চাত্ত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইব : অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূর্খ, অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জ্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না ; সিংহ-চর্ম্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?

একদিকে, নব্য ভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্য জাতিরা যাহা করে, তাহাই ভাল ; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী : তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান!

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই? আমাদের কি চেষ্টাযত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই?

আমরা কি সম্পূর্ণ? আমাদের সমাজ কি সর্ব্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।" যে ব্যক্তি বা যে সমাজের শিখিবার কিছুই নাই, তাহা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্ব্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। কিন্তু একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন যে. "বুঝি কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে, তাহাতে এও প্রশংসা করিল।"

হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা ; পাশ্চাত্ত্য অনুকরণ-মোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান, আর বুঝি বিচার শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গেরা যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই

ভাল ; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ। হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কি?

পাশ্চাত্ত্য নারী স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, অতএব তাহাই ভাল ; পাশ্চাত্ত্য নারী স্বয়ংবরা, অতএব তাহাই উন্নতির উচ্চতম সোপান ; পাশ্চাত্ত্য পুরুষ আমাদের বেশ, ভূষা, অশন, বসন ঘৃণা করে, অতএব তাহা অতি মন্দ ; পাশ্চাত্ত্যেরা মূর্ত্তিপূজা দোষাবহ বলে,—অতএব মূর্ত্তিপূজা অতি দূষিত, সন্দেহ কি?

পাশ্চাত্ত্যেরা একটি দেবতার পূজা মঙ্গলপ্রদ বলে, অতএব আমাদের দেবদেবী গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দাও। পাশ্চাত্ত্যেরা জাতিভেদ ঘৃণিত বলিযা জানে, অতএব সর্ব্ববর্ণ একাকার হও। পাশ্চাত্ত্যেরা বাল্যবিবাহ সর্ব্বদোষের আকর বলে, অতএব তাহা অতি মন্দ নিশ্চিত।

আমরা এই সকল প্রথা রক্ষণোপযোগী বা ত্যাগযোগ্য—ইহাই বিচার করিতেছি না ; তবে যদি পাশ্চাত্ত্যদিগের অবজ্ঞা-দৃষ্টিমাত্রই আমাদের রীতি-নীতির জঘন্যতার কারণ হয়, তাহার প্রতিবাদ অবশ্য কর্ত্তব্য।

বলবানের দিকে সকলে যায় ; গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে কোনওপ্রকার একটু লাগে, দুর্ব্বলমাত্রেরই এই ইচ্ছা। যখন ভারতবাসীকে ইউরোপীয়-বেশ-ভূষা-মণ্ডিত দেখি, তখন মনে হয়, বুঝি ইহারা পদদলিত বিদ্যাহীন দরিদ্র ভারতবাসীর সহিত আপনাদের স্বজাতীয়ত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত!! চতুর্দ্দশ শত বর্ষ যাবৎ হিন্দুরক্তে পরিপালিত পার্শীরা এক্ষণে আর "নেটিভ" নহেন। জাতিহীন ব্রাহ্মণম্মন্যের ব্রাহ্মণ্যগৌরবের নিকট মহারথী কুলীন রাক্ষসেরও বংশমর্য্যাদা বিলীন হইয়া যায়। আর পাশ্চাত্ত্যেরা এক্ষণে শিক্ষা দিয়াছে যে, ঐ যে কটিতটমাত্র-আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচজাতি উহারা অনার্য্যজাতি!! উহারা আর আমাদের কেহ নহে!!!

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা-সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের বা নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই

"মায়ের" জন্য বলি প্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামানবের ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্নেহের জয়

(চন্দ্রগুপ্ত নাটক হইতে)

স্থান—চাণক্যের বাটি। কাল—প্রভাত

চাণক্য একাকী

চাণক্য—একটা সমুদ্র—তরঙ্গহীন, শব্দহীন, অন্তহীন। যতদূর দেখা যাচ্ছে, মৃত্যুর মত স্থির। (ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে লাগিলেন ; পরে

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন)—ক্ষমতা স্নেহের অভাব পূর্ণ ক'রতে পারে না। হৃদয়ের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা, গৈরিক নিঃস্রাবের মত উঠে, ভস্ম হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্নেহের উৎস হৃদয়ের অন্তস্তম স্তর থেকে উঠে মস্তিষ্কের তীব্র জ্বালাস্পর্শে বাষ্প হ'য়ে উড়ে যায়। (পরে স্থির-নেত্রে দূরে আলোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া কহিলেন)—এই সুন্দর প্রভাত, ঐ গাঢ় নীলিমা,—একদিন ছিল—কে?

(প্রহরিবেষ্টিত কাত্যায়নের প্রবেশ)

চাণক্য—এই যে, এসেছ? এস বন্ধু।

কাত্যায়ন—ব্যঙ্গের প্রয়োজন কি, চাণক্য? আমি তোমার বন্দী। অন্যায় করেছি, শাস্তি দাও।

চাণক্য—বন্ধন উন্মোচন ক'রে দাও প্রহরী।

(প্রহরী বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিল)

চাণক্য—এখন আর তুমি আমার বন্দী নও। আর আমাদের মধ্যে প্রভেদ নেই।

কাত্যায়ন—প্রভেদ নাইই বটে! আমার চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী!

চাণক্য—তোমরা বাহিরে যাও।

(প্রহরিগণ চলিয়া গেল)

চাণক্য—আর আমাদের প্রভেদ নেই, বন্ধু!

কাত্যায়ন—প্রভেদ নেই!—তোমার এক ইঙ্গিতে এই মুহূর্ত্তেই আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত হ'তে পারে! আমি বন্দী—আর তুমি একটা বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

চাণক্য—এই ছোরা নাও। আমার বক্ষে আমূল বসিয়ে দাও, তোমার মন্ত্রিত্বের পথ পরিষ্কার কর। (ছোরা দিলেন)

কাত্যায়ন—তোমার অভিপ্রায় কি, চাণক্য?

চাণক্য—আমি সাম্রাজ্যের জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে দিয়েছি। এক ঊষর প্রান্তরকে উর্ব্বরক্ষেত্রে পরিণত ক'রেছি।—তুমি যা পারো নি। এই বিশাল

সাম্রাজ্যে একটা ত্রস্ত শান্তি বিরাজ কচ্ছে। বাহিরে শত্রুগণ ত্রস্ত। রাজপথ-পার্শ্বে সম্পত্তি রেখে পথিক নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পারে। কিন্তু এই বিরাট্ শান্তি পর্ব্বতের মত স্থির নিষ্প্রাণ! না, আমি পারি নি। তুমি হয়তো পার্বে।—মন্ত্রিত্ব চাও, ছেড়ে দিচ্ছি।

কাত্যায়ন—তুমি কূট। তোমার অভিসন্ধি বোঝা আমার অসাধ্য।

চাণক্য—আমি এই পৈতা ছুঁয়ে বলছি—আমি এই মুহূর্ত্তে মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করছি—তুমি যদি চাও।—তুমি মূর্খ, কিন্তু তোমার হৃদয় আছে। তুমি পার্বে, আমি পারি নি।

কাত্যায়ন—সে কি! ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে উঠিয়ে—

চাণক্য—সব ভ্রম। হৃদয়কে উপবাসী রেখে শাসন করা চলে না। আমি বুঝেছি যে, আমার কঠোর শাসনে যে ক্ষমতা স্বপ্নের প্রাসাদের মত অভ্রভেদ ক'রে উঠ্ছে, তা' স্বপ্নের প্রাসাদের ন্যায় আকাশে বিলীন হ'য়ে যাবে। এ বাড়ী নয়, ইটের পাঁজা! এ বৃক্ষ নয়, এ শুষ্ক কাঠের গুচ্ছ। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ফিরিয়ে আন্তে পারি না। শূদ্রকে চোখ রাঙিয়ে শাসাতে পারি, কিন্তু তার হৃদয়ে আবার ভক্তির স্রোত বহাতে পারি না। রাক্ষসি, আমায় কোথায় নিয়ে এসেছিস্? আমি কি করেছি—কি করেছি!

কাত্যায়ন—কি করেছো?

চাণক্য—ঐ বৌদ্ধধর্ম্মের বন্যা আস্ছে।—আমি দূর-ভবিষ্যতে কি দেখ্ছি জানো?

কাত্যায়ন—কি?

চাণক্য—এই পুনরায় বিখণ্ডিত সাম্রাজ্যের উপরে প্রেতের ভৈরব নৃত্য! তারপর এক মহাশক্তি এসে গলিত শবের উপর তা'র যাদুদণ্ড বুলিয়ে সেই খণ্ডিত মাংসপিণ্ডগুলিকে এক ক'রে নূতন শক্তিতে সঞ্জীবিত কর্বে: আর তার ন্যায়শাসনে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকে চ'ষে সমভূমি কর্বে!—নাও এই মন্ত্রিত্ব।

কাত্যায়ন—কি দামে বিকাচ্ছো?

চাণক্য—তোমার বন্ধুত্ব চাই, এইমাত্র।

কাত্যায়ন—উত্তম অভিনয়।

চাণক্য—অভিনয় নয়, বিশ্বাস কর বন্ধু; আজ আমি বড় দীন। চাণক্য কূট-কৌশলী, বিচক্ষণ। চাণক্য ভারতে জীবিত জাতির সমবায়ে এক মহা-সংগীত রচনা ক'রেছে। আকাশে যদি ঈশ্বর থাকেন, তা হ'লে তিনি চাণক্যের

এই মহাসৃষ্টি মুগ্ধদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছেন। সব ক'রেছি, কিন্তু তা'তে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না। পারব কোথা থেকে? বাহিরে এই মনীষা দেখছো, কিন্তু আমার হৃদয় চিরে দেখ বন্ধু! এ শুষ্ক মরুভূমি—এক কণা করুণা নেই, স্নেহ নেই, বিশ্বাস নেই! শাঁস নেই, খোসা নিয়ে কি করব? ভেঙেগ টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেই।

(বক্ষে করাঘাত)

কাত্যায়ন—আশ্চর্য্য! তুমি অধীর, চাণক্য! এই দুর্দ্দম তেজ, এই অটল প্রতিজ্ঞা, এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—

চাণক্য—বুদ্ধি, বুদ্ধি, বুদ্ধি! শুনতে শুনতে অধীর হ'য়ে গেছি। পথে, ঘাটে, প্রান্তরে বিশ্বশুদ্ধ ঐ এক কথা—চাণক্যের কি বুদ্ধি! সমস্ত জগৎ নির্নিমেষ বিস্ময়ে আমার পানে চেয়ে দেখছে—যেমন লোকে বিভীষিকা দেখে, ধূমকেতু দেখে! যে বুদ্ধিকে এতদিন আমি দৈববাণীর মত অনুসরণ ক'রে এসেছি—সে বর নয়, সে অভিশাপ। এখন সে ফিরে দাঁড়িয়েছে, তার মুখ দেখতে পেয়েছি; সে সজীব মূর্ত্তি নয়, সে কঙ্কাল। সে এতদিন আমায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল—এখন তাড়া ক'রেছে—ভয়ঙ্কর!

(শিহরিয়া উঠিলেন)

কাত্যায়ন—তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছ, চাণক্য।

চাণক্য—(ক্ষণেক নীরব থাকিয়া)—এই সুন্দর প্রভাত—ধরণী বিবাহের কন্যার মত সেজেছে। তার মুখের উপর সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত এসে প'ড়েছে। আর সৃষ্টিছাড়া আমিই দ্বারস্থ ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে তাই দেখছি।

কাত্যায়ন—চাণক্য! চাণক্য!

চাণক্য—এই সুন্দর হাস্যময় জগৎ—আর আমি তার কেউ নই। একা আমি অসীম সৌন্দর্য্য-রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত। বিশ্বে অমৃতের সমুদ্রের ঢেউ ব'হে যাচ্ছে—আর পঙ্গু আমি তাপিত তৃষিত হৃদয়ে তীরে ছটফট করছি—তপোবনের প্রান্তে শূকরের মত পল্বলপঙ্কে প'ড়ে আছি।

কাত্যায়ন—আশ্চর্য্য! এরূপ কখনও দেখি নি!

চাণক্য—তবু একদিন ছিল—

(দূরে সঙ্গীত)

চাণক্য—তবু একদিন ছিল, যেদিন সংসার আমার কাছে উৎসব-মন্দির ব'লে বোধ হ'ত। পৃথিবীর উপর দিয়ে সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যেত, আকাশ ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত বোধ হ'ত। তারপর—

(সংগীত নিকটবর্ত্তী হইল)

চাণক্য—(উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া) সেই স্বর! কাত্যায়ন! বন্ধু! ডেকে আন।

কাত্যায়ন—কা'কে?

চাণক্য—ঐ ভিক্ষুককে আর ভিক্ষুকবালাকে।

কাত্যায়ন—সেকি!—তুমি কি—

চাণক্য—(সানুনয়ে) যাও ভাই—(কাত্যায়নের প্রস্থান)

চাণক্য—কেন এমন হয়! এই বালিকার স্বর শুনে কেন এমন হয়! (ঘর্ম্ম মুছিলেন)

(গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালার প্রবেশ। সঙ্গে কাত্যায়ন।)

গীত

ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সংগীত ঐ ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে "আয় চ'লে আয়,
ওরে, আয় চ'লে আয় আমার পাশে।"
বলে "আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা,
হেথা নাইক মৃত্যু, নাইক জরা,
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধভরা চির স্নিগ্ধ মধুমাসে;
হেথায় চিরশ্যামল বসুন্ধরা চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে।।
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে;
দেখ ঐ সুধা-সিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চ'লে আয় আমার পাশে।।
কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ;
ওরে, ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ!
ওরে, সেই সে পরমানন্দ, যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে, পরের কাছে, প'ড়ে আছিস্ পরবাসে।।"

কাত্যায়ন—এমন দার্শনিক ভিক্ষুক ত পূর্ব্বে কখন দেখি নি। "তৎপুরুষঃ সমানাধিকরণপদঃ কর্ম্মধারয়ঃ"—অর্থাৎ কিনা—সেই এক পুরুষ প্রকৃতির সহিত সমগুণান্বিত হইলে—অর্থাৎ জীবভাবে জন্মগ্রহণ করিলে, কর্ম্ম ধারণ করায়—আর কাজেই কর্ম্মফল ভোগ করে—ওঃ! ভিক্ষুক, তুমি পাণিনি প'ড়েছো নিশ্চয়!

ভিক্ষুক—আজ্ঞে না।

কাত্যায়ন—কিন্তু তোমার গানের প্রতি ছত্রে পাণিনি। এ সব গান শিখ্‌লে কার কাছে?

ভিক্ষুক—এক ব্রাহ্মণের কাছে বাবা!

কাত্যায়ন—হ'তেই হবে।

চাণক্য—(বালিকাকে) এই দিকে এস ত মা।

(বালিকা দৌড়িয়া চাণক্যের কাছে আসিল)

চাণক্য—(তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) একেবারে সেই মুখ! সেই চক্ষু দু'টি? একেবারে অথচ—ভিক্ষুক! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।—এ তোমার কন্যা! সত্য বল।

ভিক্ষুক—আমার বৈ কি? আর কার?

চাণক্য—সত্য বল। তোমায় প্রচুর অর্থ দিব। সত্য বল।

ভিক্ষুক—না বাবা, এ আমার মেয়ে নয়। পথে এ মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছি। তবে সেই অবধি তাকে নিজের মেয়ের মতই মানুষ ক'রেছি বাবা।

চাণক্য—(সাগ্রহে) তবে তোমার মেয়ে নয়?

ভিক্ষুক—না বাবা! কুড়িয়ে পেয়েছি।

চাণক্য—কোথায় পেলে?

ভিক্ষুক—ভগবান্ দিয়েছেন। নইলে এই অন্ধ বুড়োকে কে হাত ধ'রে নিয়ে বেড়াত? কি পুণ্যে মাকে পেয়েছি জানি না। ডাকাতি ক'রে খেতাম, এখন সেই পাপে চক্ষু দু'টি হারিয়েছি।

চাণক্য—(সমধিক আগ্রহে) দস্যু ছিলে।—ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছ?

ভিক্ষুক—দিইছি বৈ কি, বাবা! কার ঘাড়ের উপর দশটা মাথা আছে বাবা, যে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে ডাকাতি করে?

চাণক্য—মেয়ে কোথায় পেলে?

ভিক্ষুক—অবন্তীপুরে, বাবা!

চাণক্য—(উত্তেজিত ভাবে) অবন্তীপুরে? কোন্ জায়গায়?

ভিক্ষুক—পথে।

চাণক্য—না, এক ব্রাহ্মণের ঘর থেকে চুরি ক'রে এনেছিলে? সত্য বল—কোন ভয় নেই, চুরি করেছিলে?

ভিক্ষুক—না বাবা!

চাণক্য—হত্যা ক'র্‌ব!—সত্য বল! ডাকাতি ক'রে এনেছিলে?

ভিক্ষুক—হাঁ, বাবা!

চাণক্য—নদীর ধারে বাড়ী?

ভিক্ষুক—আজ্ঞে হাঁ।

চাণক্য—(বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া) হৃদয়, উদ্বেলিত হ'য়ো না। এখন এর বয়স?

ভিক্ষুক—তিন চারি বৎসর বাবা!

চাণক্য—এর নাম কি বলেছিল?

ভিক্ষুক—আত্তিরি!

চাণক্য—আত্রেয়ী! শুন্‌ছো কাত্যায়ন? বল্‌ছে আত্রেয়ী! এর বাপের নাম?

ভিক্ষুক—চাণক্য।

চাণক্য—(লাফাইয়া উঠিয়া, উচ্চৈঃস্বরে) দস্যু! —না, তোমায় মার্‌বো না। তোমার কেশাগ্র স্পর্শ ক'র্‌বো না। কোন ভয় নেই। কাত্যায়ন—না, রক্ষি!

(রক্ষিগণের প্রবেশ)

চাণক্য—না যাও!—ভিক্ষুক! আমিই সেই ব্রাহ্মণ। এ কন্যা আমার।

[রক্ষিগণের প্রস্থান]

ভিক্ষুক—আমার মেয়েটি কেড়ে নিও না, বাবা! এ আমার অন্ধের নড়ি। খেতে পাবো না।

চাণক্য—তোমায় এক রাজ্য-খণ্ড দিব। দস্যু! তুমি আমায় পথের ভিখারী করেছো। তুমি আমায় সম্রাট্ করেছো। তুমি আমায় নরকে নিক্ষেপ ক'রে

আবার স্বর্গে উঠিয়েছো। আমি তোমায় বধ ক'রে তোমার মূর্ত্তি গড়িয়ে পূজা কর্‌ব। না, না—একি! এ আনন্দ, না দুঃখ? এ যে—এ যে—না, একটা কিছু ক'র্‌তে হবে; যাতে বুঝ্‌তে পারি যে আমি বেঁচে আছি। (হাস্য)

কাত্যায়ন—চাণক্য! চাণক্য!

চাণক্য—কাত্যায়ন! নাড়ী দেখ্‌তে জানো? দেখ ত (হাত বাড়াইলেন) আমি বেঁচে আছি কি না? দেখ ত এ ইহকাল না পরকাল?—এ স্বপ্ন না সত্য? এ আলোকের উচ্ছ্বাস, না অন্ধকারের বন্যা? এ সৃষ্টির সঙ্গীত, না প্রলয়-কল্লোল?—দেখ ত!—নহিলে—একি সম্ভব? এতদিন পরে আমারই কন্যা—ভারত-শাসনকর্ত্তার কন্যা তারই দ্বারে এসেছে ভিক্ষা করতে!—কাত্যায়ন! কাত্যায়ন! (ক্রন্দন)

কাত্যায়ন—চাণক্য, প্রকৃতিস্থ হও।

চাণক্য—না, এ সম্ভবে না। এ ছলনা, প্রতারণা, ষড়্‌যন্ত্র। তোমার ষড়্‌যন্ত্র কাত্যায়ন! না, এ যে সেই মুখ, সেই চক্ষু দুটি। আত্রেয়ি—মা আমার? এতদিন সন্তানকে ভুলে ছিলি। কোথায় ছিলি পাষাণি মা! (কন্যাকে জড়াইয়া ধরিলেন)—কাত্যায়ন! শোন, কুঞ্জবনে একটা সামস্তোত্র উঠ্‌ছে না? দেখ ঐ নদী আনন্দে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। আকাশ থেকে একটা স্নিগ্ধ সৌরভ-হিল্লোল ভেসে আস্‌ছে। আমার শরীর অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে, আমাকে কুটীরে নিয়ে চল কাত্যায়ন!

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মহাকাব্য

ইংরাজি এপিক্ শব্দের অনুবাদে মহাকাব্য-শব্দের প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এপিকের সমস্ত লক্ষণের সহিত মহাকাব্যের সমস্ত লক্ষণ মিলে কি না তাহা বলিতে পারি না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, কিন্তু শুনিয়াছি যে আলঙ্কারিকেরা মহাকাব্যের লক্ষণ যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে মহাকবিগণের চিন্তার কারণ কিছুই রাখেন নাই। কালিদাস, ভারবি, মাঘ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য এ দেশে চলিত আছে, এবং ঐ সকল মহাকাব্য সম্ভবতঃ অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত মহাকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুই গ্রন্থকে মহাকাব্য বলা চলে কি না, তাহা লইয়া একটা তুমুল সমস্যা গোড়াতেই দাঁড়ায়। ইংরাজি পুস্তকে রামায়ণ ও মহাভারত এপিক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা উহাদিগকে মহাকাব্য বলিতে সর্ব্বদা সম্মত হন না। প্রথমতঃ, এ দুই গ্রন্থ অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মাবলী অত্যন্ত উৎকটরূপে লঙ্ঘন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মহাকাব্য বলিলে উহাদের গৌরবহানির সম্ভাবনা জন্মে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি আখ্যা দিলে, বোধ করি, এই দুই গ্রন্থের মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে। কিন্তু মহাকাব্য বলিলে উহাদের মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়।

বস্তুতই মাহাত্ম্য খর্ব্ব করা হয়। কুমারসম্ভব ও কিরাতার্জ্জুনীয় যে অর্থে মহাকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে অর্থে মহাকাব্য নহে। কুমারসম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয় যে শ্রেণীর—যে পর্য্যায়ের গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর—সে পর্য্যায়ের গ্রন্থ নহে। একের নাম মহাকাব্য দিলে, অন্যকে মহাকাব্য বলা কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

রামায়ণ-মহাভারতের ঐতিহাসিকত্বে ও ধর্ম্মশাস্ত্রত্বে সম্পূর্ণ আস্থাবান্ থাকিয়াও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে উহাতে কাব্যরসও যথেষ্ট পরিমাণে

বিদ্যমান। মহর্ষি বাল্মীকি ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, উঁহারা যাহা লিখিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব রহিয়া গিয়াছে,—হয়ত উঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে রহিয়া গিয়াছে ; কিন্তু কবিত্ব যে আছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

রামায়ণ-মহাভারতে কবিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলেই, মহর্ষিদ্বয়কে মহাকবি ও তাঁহাদের কাব্যদ্বয়কে মহাকাব্য না বলিলে চলে না : কেন-না, ভাষাতে আর কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই কাব্যদ্বয়ের সংগত নামকরণ চলিতে পারে। কুমারসম্ভব-কিরাতার্জুনীয়কে আপাততঃ মহাকাব্যের শ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া দিয়া আমরা রামায়ণ-মহাভারতকেই মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মনে হইতেছে মেকলে কোথায় বলিয়াছেন, সভ্যতার সহিত কবিত্বের কতকটা খাদ্য-খাদক বা অহি-নকুল সম্বন্ধ রহিয়াছে। সভ্যতা কবিত্বকে গ্রাস করে, অথবা সভ্যতার আওতায় কবিতার লতা বাড়িতে পায় না। বলা বাহুল্য, মেকলের অনেক উক্তির মত এই উক্তিটিকেও সুধীজনে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার আস্ফালন-সত্ত্বেও ইউরোপ-খণ্ডে কবিত্বের যেরূপ স্ফূর্তি দেখা গিয়াছে, তাহাই তাহার প্রমাণ। অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

কিন্তু আমার বোধ হয় মেকলের ঐ উক্তির ভিতর একটু প্রচ্ছন্ন সত্য আছে। সভ্যতা কবিত্বের মস্তক চর্ব্বণ না করিতে পারে, কিন্তু মহাকাব্যকে বোধ করি সশরীরে গ্রাস করিয়া ফেলে। আবার বলা আবশ্যক, মহাকাব্য-শব্দ আমি আলংকারিক-সম্মত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব ও প্যারাডাইস লষ্টকে আমি এ স্থলে মহাকাব্যের মধ্যে ফেলিতেছি না। রামায়ণ-মহাভারত যে পর্য্যায়ের কাব্য, সেই পর্য্যায়ের কাব্যকেই আমি মহাকাব্য বলিতেছি। পৃথিবীতে কত কবি কত কাব্য লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য সেই কোন্ কালে রচিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একখানাও রচিত হইল না। পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যে লেখকের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই ; কিন্তু সন্দেহ হয়, কেবল হোমারের নামে প্রচলিত গ্রন্থ-দুইখানি ব্যতীত আর কোন কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সমান পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত কবিত্বের অবনতি হইয়াছে, এ-কথা কেহই বলিতে পারিবে না। কিন্তু শেক্স্পীয়রের নাম মনে রাখিয়াও

অকুতোভয়ে বলা যাইতে পারে, ইউরোপ-মহাদেশেও এক বারের বেশী হোমারের জন্ম হয় নাই।

বস্তুতই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও সভ্যতার ইতিহাসে কোন্ প্রাচীনকালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহার পর কত হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না। কেন এরূপ হইল, তাহার কারণ চিন্তনীয়; কিন্তু সেই কারণ-আবিষ্কারে লেখকের ক্ষমতা নাই। তবে এক একবার মনে হয়, মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা, বোধ করি, আর সেই শ্রেণীর মহাকাব্য-উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল নহে।

রামায়ণ-মহাভারত ও হোমারের মহাকাব্যে আমরা মনুষ্যসমাজের যে চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে সেই সমাজকে আধুনিক হিসাবে সভ্য বলিতে পারা যায় না। মনুষ্যসমাজের সে অবস্থা আবার কখনও ফিরিয়া আসিবে কি না, তাহা জানি না; কিন্তু তাৎকালিক সমাজে যে সকল ঘটনা প্রতিদিন সংঘটিত হইত, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা ঘটিতে পারে না। আমরা এমন কল্পনায় আনিতে পারি না যে, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি কোন ইউরোপের রাজসভায় আতিথ্যস্বীকার করিয়া অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে ষ্টীমারে তুলিয়া প্রস্থান করিতেছেন, ও তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ ইউরোপের নরপালবর্গ ওয়াশিংটন অবরুদ্ধ করিয়া দশ বৎসরকাল বসিয়া আছেন। ডিলারী বন্দীকৃত লর্ড মেথুয়েন্‌কে গাড়ীর চাকায় বাঁধিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকার বন্ধুর উপত্যকায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা কোন দিনের টেলিগ্রামে দেখিবার কেহ আশা করেন না। সিডান্-ক্ষেত্রে বিসমার্ক লুই নেপোলিয়ান্‌কে হস্তগত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বুক চিরিয়া নেপোলিয়ান্-বংশের শোণিতের আস্বাদগ্রহণ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ত্রেতাযুগ-অবসানের বহুদিন পরে বুয়রদেশে লঙ্কাকাণ্ডের অপেক্ষাও তুমুল ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু কোন বিজয়ী মহাবীরকে তজ্জন্য লাঙ্গুলের ব্যবহার করিতে হয় নাই।

সেকালের এই অসভ্যতা আমাদের চোখে বড়ই বীভৎস ঠেকে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেকালের সামাজিকতার আর একটা দিক্ আছে, একালে সে দিক্‌টাও তেমন দেখিতে পাই না। বার্ক এক সময়ে আপনার মহাপ্রাণতার ঝোঁকে বলিয়াছিলেন, শিভাল্‌রির দিন গত হইয়াছে। শিভাল্‌রি-নামক

অনির্ব্বাচ্য বস্তু নগ্ন বর্ব্বরতার সহিত নিরাবরণ মনুষ্যত্বের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সমুৎপন্ন। একালে মানুষ মানুষের রক্তপান করিয়া জিঘাংসার তৃপ্তি করিতে চাহে না বটে, কিন্তু আবার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কটাক্ষমাত্র শাসনে, পত্নীর অপমান স্বচক্ষে দেখিয়াও, আত্মসংযমে সমর্থ হয় কি না, বলা যায় না। একালের রাজারা মালকোঁচা মারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গদাহস্তে অবতীর্ণ হন না সত্য বটে, কিন্তু ভীমরতিগ্রস্ত পিতার একটা কথা রাখিবার জন্য ফিজিদ্বীপে নির্ব্বাসন গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন কি না, বলিতে পারি না। অশ্বত্থামা ঘোর নিশাকালে সুখসুপ্ত বালকবৃন্দের হত্যাসাধন করিয়া ভীষণ ক্রূরতা দেখাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সভা ডাকিয়া ও খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া সেই ক্রূরতার সমর্থন তাঁহার নিতান্তই আবশ্যক হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণসহায় পাণ্ডবগণ যখন জয়বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হইয়া নিশাকালে শত্রুশিবিরে ভীষ্মের নিকট দীনভাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা ভীষ্মকে তাঁহার জীবনটুকু দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের লৌহবর্ম্মের অন্তরালে কারেন্‌সি নোটের গোছা লইয়া যাওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

গত চারি হাজার বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের বাহিরের মূর্ত্তিটা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে সত্য কথা, কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক প্রকৃতির কতটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। মনুষ্যের বাহিরের পরিচ্ছদটা সম্পূর্ণ বদলাইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যের ভিতরের গঠন অনেকটা একরূপই আছে। সেকালের রাজারাজড়াও, বোধ করি, সময়মত কৌপিনধারী হইয়া সভামধ্যে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না, কিন্তু এখনকার অন্নহীন শ্রমজীবীরাও সমস্ত অঙ্গের মালিন্য ও বিরূপতা পোশাকের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিতে বাধ্য হয়। সেকালে ক্রূরতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল. পাশবিকতা ছিল, এবং তাহা নিতান্ত নগ্ন নিরাবরণ অবস্থাতেই ছিল। তাহার উপর কোন আচ্ছাদন, কোনরূপ পালিশ্‌, কোনরূপ রঙ-ফলানো ছিল না। একালেও ক্রূরতা, বর্ব্বরতা ও পাশবিকতা হয়ত ঠিক তেমনি বর্ত্তমান আছে, তবে তাহার উপর একটা কৃত্রিম ভণ্ডামির আবরণ স্থাপিত হইয়া তাহার বীভৎস ভাবকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। সম্প্রতি চীনদেশে সভ্য ইউরোপের সম্মিলিত সেনা যে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে আটিলা ও জঙ্গিস্‌ খাঁর প্রেতাত্মার আ.র লজ্জিত হইবার কোন কারণই নাই।

বস্তুতই চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়, মনুষ্যচরিত্র অধিক বদলায় নাই; তবে সমাজের মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থা যে-কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই কাব্যের মূর্ত্তিও যে তদনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ থাক্ আর নাই থাক্, আধুনিক কালের সাহিত্যে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের আর আবির্ভাব হয় নাই, এবং আর যে কখনও হইবে তাহা আশা করাও দুষ্কর। সাহিত্যে মহাকাব্যের যুগ বোধ হয় অতীত হইয়া গিয়াছে। কালের যখন অবধি নাই ও পৃথ্বী যখন বিপুলা, তখন বড় কবির ও কাব্যের অসম্ভাব কখন হইবে না; কিন্তু মনুষ্যসমাজের সেই প্রাচীন অবস্থা ফিরিয়া আসিবার যদি সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে মহাকবির ও মহাকাব্যের, বোধ করি, আবির্ভাব আর হইবে না।

বস্তুতই আর আবির্ভাবের আশা নাই। মহাকাব্যের মধ্যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা আছে, তাহা, বোধ করি, আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না। সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন, কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে। মহাকাব্যগুলিকে আমরা মহাকায় অদ্ভুত পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। এক একবার মনে হয়, উহাদিগকে কোন মানবহস্তনির্ম্মিত কৃত্রিম কারুকার্য্যের সহিত তুলনা না করিয়া প্রকৃতির হস্তনির্ম্মিত নৈসর্গিক পদার্থের সহিত উপমিত করা উচিত।

আমাদের ভারতবর্ষের মহাভারতকে এক একবার ভারতবর্ষের হিমাচলের সঙ্গে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। হিমাচল যেমন তাহার বিপুল পাষাণ-কলেবরের অঙ্কদেশে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, মহাভারতের বিপুল কলেবর তেমনি ভারতীয় সাহিত্যকে কত সহস্র বৎসরকাল অঙ্কে রাখিয়া লালন-পালন ও পোষণ করিয়া আসিতেছে। হিমাচলের বিশাল বক্ষোদেশ হইতে বিনিঃসৃত সহস্র উৎস হইতে সহস্র স্রোতস্বিনী অমৃতরসপ্রবাহে ভারতভূমিকে আর্দ্র ও সিক্ত করিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' পুণ্যভূমিতে পরিণত করিয়াছে, সেইরূপ মহাভারতের মধ্য হইতে সহস্র উপাখ্যান, সহস্র কাহিনী, সহস্র কথা সমগ্র জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে সহস্র ধারা প্রবাহিত করিয়া পুণ্যতর ভাবপ্রবাহে জাতীয় সাহিত্যকে চিরহরিৎ রাখিয়া

বহুকোটী লোকের জাতীয় জীবনে পুষ্টি ও কান্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। ভূতত্ত্ববিৎ যেমন হিমাচলের ক্রমবিন্যস্ত স্তরপরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে কত বিস্ময়কর জীবের অস্থিকঙ্কাল উদ্ধার করিয়া অতীতের লুপ্তস্মৃতি কালের কুক্ষি হইতে উদ্ঘাটন করেন, সেইরূপ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এই বিশাল গ্রন্থের স্তরপরম্পরা হইতে ভারতীয় জনসমাজের অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত নিদর্শনের চিহ্ন ধরিয়া ইতিহাসের অতীত অধ্যায় আবিষ্কার করেন।

—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন

ঋগ্বেদের রুদ্রদেব বিনাশের দেবতা, তাঁহার জটাজুট অগ্নিশলাকার ন্যায়, তাঁহার নৃত্যের নাম তাণ্ডব, তাহাতে বিশ্ব বিকম্পিত হয় ও গ্রহগণ কক্ষচ্যুত হইয়া ব্যোমপথে বিক্ষিপ্তভাবে ছুটিতে থাকে। রুদ্রের নিশ্বাসের জ্বালা—জগতের শ্মশান ; তাঁহার শূলাগ্রে বিদ্ধ হইয়া দিগ্হস্তীরা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। তাঁহার নেত্রশাসনে চিত্ত-শ্মশানে কামদেব পুড়িয়া ছাই হয়, তাঁহার মুখোচ্চারিত প্রণব প্রলয়ের গান—বিনাশের ঝঞ্ঝা,—তাহা জগৎকে পুঞ্জীভূত ধূলায় পরিণত করিয়া উড়াইয়া লইয়া যায়, তাঁহার বিষাণবাদনের তালে তালে চতুর্দ্দশ মৃত্যু নৃত্য করিতে থাকে।

বৌদ্ধযুগের শেষভাগে রুদ্র তাঁহার তেজ সংবরণ করিলেন। সংহারের দেবতা অপূর্ব্ব সৌম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, যেন চিতা জ্বলিয়া পুড়িয়া

গেল, কতকগুলি ছাই রহিয়া গেল। (তাঁহার প্রলয়-বিষাণ থামিয়া গেল,—তিনি যোগীর আদর্শ যোগীশ্বর, ক্ষমার আদর্শ ভোলানাথ, ত্যাগীর আদর্শ সর্ব্বত্যাগী হইলেন,—এক কথায় তাঁহার ভয়ংকরত্ব চলিয়া গেল, তাঁহার তাণ্ডব-নৃত্য প্রেম-নৃত্যে পরিণত হইল।)

(কিন্তু বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতিকে যেরূপ ভয়ংকরী দেখিয়াছিলেন, তাহা তো এখনও আছে।)

কিন্তু জগতের যে ভীষণতা আছে, তাহার তো জীবনযাত্রার পদে পদে আমরা পরিচয় পাইতেছি। রোগ, শোক, মারীভয়, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু প্রভৃতি শতরূপে আমরা যে ভীষণতার—নির্ম্মমতার দর্শন পাই, তাহা তো সাধক একেবারে বাদ দিতে পারেন না। এই নির্ম্মম সত্যের কংকালহাসি যে আমাদিগকে নিত্যই দেখিতে হইবে। ফুল্লারবিন্দপ্রতিম শিশুর মৃদুহাস্য-মণ্ডিত মুখখানি যেরূপ সত্য, ভীষণ রোগশয্যার প্রেতপ্রতিম কংকালও যে তেমনি সত্য। এই ভয়ংকরের দেবতাকে উপেক্ষা করা যায় না।

এই ভীষণতার স্থান পূরণ করিবার জন্য চারিদিক হইতে নব নব দেবতা আসিয়া বংগদেশে শক্তিব্যূহ রচনা করিলেন,—বংগের ঘরে ঘরে পূজিতা—স্মেরাস্যা, হংসারূঢ়া, অরুণিতবসনা, মনসাদেবী এই ব্যূহের অন্যতমা।

কিন্তু এই শক্তিকেন্দ্রের প্রধান দেবতা হইলেন কালী। ইনি বৈদিক দেবতা নহেন। কিন্তু যে স্থান হইতেই ইঁহাকে আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি না কেন, আর্য্যকল্পনা, হিন্দুর সাধনা ইঁহাকে এমনই ধ্যানের মূর্ত্তি দিয়াছে যে ইনি একাধারে ভয় ও বরাভয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে এদেশের সর্ব্ব-প্রধান মাতৃ-দেবতা হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

আমরা বলিতে পারি না কেন এই দেশ বিশেষভাবে কালীমাতার অধিকারভুক্ত।) আর কোন্ দেশে এরূপ ভীষণ গর্জ্জনপূর্ব্বক পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র ধরিত্রী কম্পিত করিয়া চলিয়া যায়? এরূপ নির্ম্মমভাবে কোন্ নদনদী-তরংগ রাজনগরের মত কীর্ত্তি গ্রাস করিয়া লেলিহান, ধ্বংসলোলুপ জিহ্বা প্রসারণ করে? আর কোন্ ভূমি এরূপ ভীষণ সিংহব্যাঘ্রের জননী? Royal Bengal Tiger আর কোথায় এরূপ হস্তীর মস্তক চূর্ণ করিয়া রঞ্জিত নখর লেহন করে,—বংগদেশের জংগলের মত কোথায় এরূপ ভীষণ চন্দ্রবোড়া ও কেউটা জন্মিয়া থাকে? কৃষ্ণমেঘের মত বিশালকায় হস্তী আর কোন্ দেশের তমালতালীবনরাজিনীলা সমুদ্রবেলা ও গিরিগুহায়

বিচরণ করে? দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রক্তশোষণকারী দারিদ্র্য, নানা রোগ আর কোন্ দেশের লোককে এরূপ ঘন ঘন পীড়ন করে?

এক বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ, অপর বৎসর ধরিত্রী সুজলা সুফলা; এক ঋতুতে মেঘের গর্জনে, বিদ্যুৎস্ফুরণে কুটীরবাসী মুহুর্মুহুঃ জৈমিনির নাম স্মরণ করিয়া শতচ্ছিন্ন কন্থার মধ্যে ভয়ে কাঁপিতেছে; অপর ঋতুতে ফুলের বাগানে আনন্দ ধরে না; সরসীর সুনীল জলে রক্তপদ্মের উপর সৌরকর কি হাসিই না মাখাইয়া দিতেছে!

এক ঋতুতে পদ্মা মহাজনের কাকুতি-মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া তাহার সমস্ত সম্পদ্ উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বুদ্বুদের ন্যায় ডুবাইয়া দিতেছেন, অপর ঋতুতে পদ্মার পুত্রপ্রতিম জেলেরা মাঝ-দরিয়াকে সিংহাসন মনে করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র ডিঙ্গা চালাইয়া দিতেছে এবং করুণাময়ী মাতার নিকট হইতে ঝুড়ি ভরিয়া মৎস্য উপহার লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে।

এক ঋতুর গভীর তমিস্রার ন্যায় মেঘকুন্তলা দিগ্বধূগণ তাঁহাদের গাঢ় অন্ধকার-লহরীর বেণী দোলাইয়া দিয়া বিদ্যুৎ-কটাক্ষের পৈশাচিক দীপ্তি দ্বারা পথিককে ভয় দেখাইতেছেন; অপর ঋতুতে শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী প্রেমাবেশে ঢুলু ঢুলু চোখে চাহিয়া দম্পতি-হৃদয়ে আনন্দ ঢালিয়া দিতেছেন।

একদিকে যেমন বঙ্গপ্রকৃতি খাঁড়া ও নরমুণ্ড দেখাইয়া আতঙ্কিত করিতেছেন, আর একদিকে তেমনই বিচিত্র আনন্দ ও শোভাসম্পদ্ লইয়া যেন আমাদিগকে বর দিতেছেন। এক হস্তে উত্তোলিত খড়্গে বিদ্যুতের ঝলক খেলিতেছে, অপর দিকে প্রসারিত করপদ্ম দ্বারা মাতা "মাভৈঃ" এই ইঙ্গিত করিতেছেন।

সুতরাং আমাদের দেশ যে বিশেষভাবে এই করালবদনা, মহীয়সী, মধুর-হাসিনী মাতৃদেবতার অধিকারে, তাহা আর বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না। এই ভীষণ রূপের সহিত সুন্দরের সমাবেশ শাক্ত কবি ছাড়া আর কে করিতে পারিয়াছেন? এক ছত্রে তিনি বলিতেছেন, "নীলনলিনী জিনি ত্রিনয়নী"—অপর ছত্রেই বলিতেছেন, "লোলরসনা করালবদনী"।

রামপ্রসাদের সময়ে দেশব্যাপক অরাজকতা। তখন মোগল সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ। সেই পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যে বৈতরণীর পদ্মফুলের মত তাজমহল দাঁড়াইয়া ছিল। গত যুগের প্রেম ও সৌন্দর্য্যলিপ্সার অমর

স্মারকচিহ্ন এই তাজমহল। সেই শাসন যাহা একচ্ছত্র হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে নিরাপদ রাখিয়াছিল—প্রজাবৃন্দের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও উদারতা বিকশিত করিয়া শিল্প ও ত্যাগের আদর্শকে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, মোগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের অবসানের দিনে তাহার সমস্ত মহিমা অন্তর্হিত হইল। দেশময় দস্যু ও তস্করের ভীতি উপস্থিত হইল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা দিল্লীশ্বরের শাসনমুক্ত হইলেন এবং যেন মেষশাবকেরা সিংহ হইয়া প্রজাপীড়ন করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশও অরাজকতা ও অত্যাচারের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। এ অত্যাচার ও বিপদের দিনে মানুষের চিত্তে দুঃখবাদের প্রাবল্য স্বাভাবিক।

এই দুঃখময় জীবনের আঁধার দিকটার উপর জোর দিয়া বৈরাগ্যের যে সুরটা উঠিয়াছিল—এ যুগে তাহার প্রথম প্রেরণা দিয়াছিলেন রামপ্রসাদ। তিনি তাঁহার মায়ের উপর স্নেহের দাবী ফাঁদিয়া এই দুখের জন্য তাঁহাকে স্নেহমিষ্ট গঞ্জনা করিতে কসুর করেন নাই। মা আদরের ছেলের মুখে চুমো খাইয়া তাহাকে আবার শ্মশানে ডালি দিতেছেন কেন? ছেলেকে গৃহবাসী করিয়া কেন আবার সন্ন্যাসী করিলেন, এই সকল অনুযোগ দিয়া তিনি তাঁহাকে "সর্ব্বনাশী" বলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সংসারের ত্রিতাপ ভোগ করিয়া, মাকে সমস্ত বিধানের কর্ত্রী জানিয়াও তিনি মায়ের স্নেহের রাজ্যের বহির্ভূত হন নাই। তাঁহার সমস্ত অনুযোগ—আবদার মাত্র, তাহাতে কান্না আছে, "কেন মারছ?" বলিয়া আর্ত্তনাদ আছে, শিশু যেমন মায়ের মার খাইয়া তাঁহার আঁচল ছাড়ে না, রামপ্রসাদ বাহ্যিক বিদ্রোহসূচক শত শত অভিযোগ করিয়াও মায়ের প্রতি নির্ভর ছাড়েন নাই। তাঁহার সেই অভিযোগে সর্ব্বত্র বৈষ্ণব কবিদিগের মানের সুরটি পাওয়া যায়। ইহা শুধুই দুঃখবাদ নহে। বাউলের গানের দুঃখবাদের সঙ্গে রামপ্রসাদের গানের এইস্থলে প্রভেদ। বাউলের গানে নিছক বৌদ্ধভাব। বাউল শুধুই মড়া কান্না গাহিয়া বিরাগ শিখায়। রামপ্রসাদের কান্নায় দুঃখ-সৃষ্টির জন্য মায়ের প্রতি ভর্ৎসনা আছে, কিন্তু তাহা বিরাগ নয়, অনুরাগের ছদ্মবেশ। শত গালাগালি দিয়াও তিনি মায়ের আঁচলটিতে বাঁধা আছেন।

বাউলের সুরের দুঃখবাদ ও রামপ্রসাদের দুঃখবাদে এই প্রভেদ। বাউল মানুষকে জীবনের প্রতিপদে শত দুঃখ দেখাইয়া শ্মশানের নির্ব্বাণটাকে

শেষাশ্রয়স্বরূপ মনে করিয়াছে, রামপ্রসাদের দুঃখবাদে সংসারের শত দুঃখের প্রতি ইঙ্গিত থাকিলেও তাহা যে মাতৃপাদপদ্মের শরণ লইলে দূর হয় তাহা জোরের সহিত বলা হইয়াছে। এই নিছক সত্য, এই নির্ভরময় আত্মোৎসর্গমূলক সংগীত এককালে সমস্ত বাংগালা দেশকে জয় করিয়াছিল। সংসার কাঁটার বন, ইহা সাফ করিয়া যদি ভক্তির চর্চা করা যায় তবে মানবজীবন দুঃখময় না হইয়া স্বর্ণপ্রসূ হইতে পারে। হাটে, মাঠে, বাটে এই সকল গানের সুধা হরির লুটের মত তিনি বিলাইয়া গিয়াছেন।

তারপরে রামপ্রসাদই আগমনী গানের প্রথম কবি। তৎপূর্বে উমা ও মেনকা লইয়া বাৎসল্যরসের ধারা কোন কবি বংগসাহিত্যে বহাইয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

"গিরি, আমি প্রবোধ দিতে নারি উমারে,
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে।
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদিত শশী,
বলে উমা ধ'রে দে উহারে।
আমি বলিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়—
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।"

এই শ্রেণীর গানে যে বাৎসল্যরস প্রবাহিত হইতেছে তাহাই শাক্ত সংগীতের প্রধান উপজীব্য।

বাংগালার কুটীরের বালিকাদুহিতাদের স্বামিগৃহে যাওয়ার পর মাতৃহৃদয়ের বিরহের হাহাকারকে করুণরসের অফুরন্ত উৎস করিয়া যে সকল আগমনী গান পল্লীতে পল্লীতে বহিয়া গিয়াছে, সেই আগমনী গানের আদি গংগা হরিদ্বার এই প্রসাদসংগীত। (আশ্বিন মাসে ঝরা শিউলি ফুলের মত এই যে মাতৃমিলনের প্রত্যাশায় বালিকা বধূদের চক্ষুজল দিনরাত্রি ঝরিত, এই সকল আগমনী গান সেই সকল অশ্রুর দ্বারা রচিত হার, উহা তাৎকালিক বংগজীবনের জীবন্ত বিচ্ছেদরসে পুষ্ট।)

যেমন কৃষ্ণরূপ, শিবের রূপ, নানা স্তোত্র ও কবিতায় ধ্যানের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রামপ্রসাদের রচিত শত শত সংগীতে কালীমূর্ত্তি সেইরূপ উচ্চাংগের সাধনার সহায়ক হইয়াছে। জগতের যাহা কিছু সুন্দর শুদ্ধ তাহাই

নহে—যাহা কিছু ভৈরব—তাহাই দিয়া এই মূর্ত্তি তিনি রচনা করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কোন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর বা মৃৎশিল্পী, রামপ্রসাদবর্ণিত রূপকে আদর্শ করিতে পারেন নাই। চিত্রে ও মৃন্ময় বিগ্রহে কালীমূর্ত্তি স্থিরা, তাঁহার লীলা নাই, তাঁহার রূপ সংযত, কিন্তু কবি যেন তদ্‌বর্ণিত রূপে জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য, ভীষণত্ব ও চাঞ্চল্য ঢালিয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় যে জীবন্ত মূর্ত্তি পাই, এখনও মন্দিরে আমরা তাহা পাই নাই ; রামপ্রসাদের কালীমূর্ত্তির চিত্রকর ও ভাস্কর এখনও জন্মায় নাই।

—দীনেশচন্দ্র সেন

সাহিত্যে খেলা

(১)

জগদ্‌-বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোডাঁ—যিনি নিতান্ত জড় প্রস্তরের দেহ থেকে অসংখ্য জীবিত-প্রায় দেব-দানব কেটে বার করেছেন, তিনিও শুন্‌তে পাই, যখন-তখন হাতে কাদা নিয়ে, আঙ্গুলের টিপে মাটির পুতুল তোয়ের করে থাকেন। এই পুতুল-গড়া হচ্ছে তাঁর খেলা। শুধু রোডাঁ কেন, পৃথিবীর শিল্পিমাত্রেই এই শিল্পের খেলা খেলে থাকেন। যিনি গড়্‌তে জানেন, তিনি শিবও গড়্‌তে পারেন, বাঁদরও গড়্‌তে পারেন। আমাদের সঙ্গে বড় বড় শিল্পীদের তফাৎ এইটুকু যে, তাঁদের হাতে এক করতে আর

হয় না। সম্ভবতঃ এই কারণে কলারাজ্যের মহাপুরুষদের যা-খুসি-তাই কর্‌বার যে অধিকার আছে, ইতর-শিল্পীদের সে অধিকার নেই। স্বর্গ হতে দেবতারা মধ্যে মধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়াতে কেউ আপত্তি করেন না, কিন্তু মর্ত্ত্যবাসীদের পক্ষে রসাতলে গমন করাটা বিশেষ নিন্দনীয়। অথচ এ কথা অস্বীকার কর্‌বার জো নেই যে, যখন এ জগতে দশটা দিক্‌ আছে, তখন এই এই সব-দিকেই গতায়াত কর্‌বার প্রবৃত্তিটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মন উঁচুতেও উঠতে চায়, নীচুতেও নাম্‌তে চায়; বরং সত্য কথা বল্‌তে গেলে, সাধারণ লোকের মন স্বভাবতই যেখানে আছে তারি চারপাশে ঘুরে বেড়াতে চায়—উড়্‌তেও চায় না, ডুব্‌তেও চায় না। কিন্তু সাধারণ লোকে, সাধারণ লোককে, কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি কাব্য,—সকল রাজ্যেই অহরহ ডানায় ভর দিয়ে থাক্‌তেই পরামর্শ দেয়। একটু উঁচুতে না চড়্‌লে আমরা দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়নমন আকর্ষণ কর্‌তে পারিনে। বেদীতে না বসলে, আমাদের উপদেশ কেউ মানে না; রঙ্গমঞ্চে না চড়্‌লে, আমাদের অভিনয় কেউ দেখে না: আর কাষ্ঠমঞ্চে না দাঁড়ালে, আমাদের বক্তৃতা কেউ শোনে না। সুতরাং জনসাধারণের চোখের সম্মুখে থাক্‌বার লোভে আমরাও অগত্যা চব্বিশ ঘণ্টা টঙে চড়ে থাক্‌তে চাই,—কিন্তু পারিনে। অনেকের পক্ষে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত উচ্চস্থানে ওঠবার চেষ্টাটাই মহাপতনের কারণ হয়। এ সব কথা বলবার অর্থ এই যে, কষ্টকর হ'লেও আমাদের পক্ষে অবশ্য মহাজনদের পথ অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য: কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে ছোটখাট গলিঘুঁজিতে খেলাচ্ছলে প্রবেশ কর্‌বার যে অধিকার তাদের আছে, সে অধিকারে আমরা কেন বঞ্চিত হব? গান কর্‌তে গেলেই যে সুর তারায় চড়িয়ে রাখ্‌তে হবে, কবিতা লিখ্‌তে হলেই যে মনের শুধু গভীর ও প্রখর ভাব প্রকাশ কর্‌তে হবে, এমন কোন নিয়ম থাকা উচিত নয়। শিল্পরাজ্যে খেলা কর্‌বার প্রবৃত্তির ন্যায় অধিকারও বড়-ছোট সকলেরি সমান আছে। এমন কি, একথা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না যে, এ পৃথিবীতে একমাত্র খেলার ময়দানে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রভেদ নেই। রাজার ছেলের সঙ্গে দরিদ্রের ছেলেরও খেলায় যোগ দেবার অধিকার আছে। আমরা যদি একবার সাহস করে কেবলমাত্র খেলা কর্‌বার জন্যে সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করি, তাহ'লে নির্ব্বিবাদে সে জগতের রাজা-রাজড়ার দলে মিশে যাব। কোনরূপ উচ্চ আশা নিয়ে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেই নিম্ন শ্রেণীতে পড়ে যেতে হবে।

(২)

লেখকেরাও অবশ্য দশের কাছে হাততালির প্রত্যাশা রাখেন, বাহবা না পেলে মনঃক্ষুণ্ণ হন—কেননা তাঁরাই হচ্ছেন যথার্থ সামাজিক জীব,—বাদবাকী সকলে কেবলমাত্র পারিবারিক। (বিশ্বমানবের মনের সঙ্গে নিত্যনূতন সম্বন্ধ পাতানোই হচ্ছে কবি-মনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম। এমন কি, কবির আপন মনের গোপন কথাটিও গীতি-কবিতাতে রঙ্গভূমির স্বগতোক্তি স্বরূপেই উচ্চারিত হয়, যাতে করে সেই মর্ম্মকথা হাজার লোকের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে পারে।) কিন্তু উচ্চমঞ্চে আরোহণ করে উচৈঃস্বরে উচ্চবাচ্য না করলে যে জনসাধারণের নয়নমন আকর্ষণ করা যায় না, এমন কোন কথা নেই। সাহিত্য-জগতে যাঁদের খেলা করবার প্রবৃত্তি আছে, সাহস আছে ও ক্ষমতা আছে—মানুষের নয়নমন আকর্ষণ করবার সুযোগ বিশেষ করে তাঁদের কপালেই ঘটে। মানুষে যে খেলা দেখতে ভালবাসে, তার পরিচয় ত আমরা এই জড় সমাজেও নিত্যই পাই। টাউনহলে বক্তৃতা শুনতেই বা ক'জন যায়—আর গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতেই বা ক'জন যায়? অথচ এ কথাও সত্য যে, টাউনহলের বক্তৃতার উদ্দেশ্য অতি মহৎ—ভারত-উদ্ধার—আর গড়ের মাঠের খেলোয়াড়দের ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি আগাগোড়া অর্থশূন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীন। আসল কথা এই যে, মানুষের দেহমনের সকলপ্রকার ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ—কেননা তা উদ্দেশ্যহীন। মানুষে যখন খেলা করে, তখন সে এক আনন্দ ব্যতীত অপর কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। যে খেলার ভিতর আনন্দ নেই, কিন্তু উপরি-পাওনার আশা আছে, তার নাম খেলা নয়, জুয়াখেলা :—ও ব্যাপার সাহিত্যে চলে না, কেননা ধর্ম্মতঃ জুয়াখেলা লক্ষ্মী-পুজোর অঙ্গ, সরস্বতীপূজার নয়। এবং যেহেতু খেলার আনন্দ নিরর্থক অর্থাৎ অর্থগত নয়, সে কারণ তা কারও নিজস্ব হতে পারে না। এ আনন্দে সকলেরি অধিকার সমান।

সুতরাং সাহিত্যে খেলা-করবার অধিকার যে আমাদের আছে, শুধু তাই নয়—স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের যুগপৎ সাধনের জন্যে মনোজগতে খেলা করাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। (যে লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে ফলের চাষ করতে ব্রতী হন, যিনি কোনরূপ কার্য্য-উদ্ধারের অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন,—তিনি গীতের মর্ম্মও বোঝেন না, গীতার ধর্ম্মও বোঝেন না;

কেননা খেলা হচ্ছে জীবজগতে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্ম, অতএব মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়।) স্বয়ং ভগবান্ বলেছেন, যদিচ তাঁর কোনই অভাব নেই, তবুও তিনি এই বিশ্ব সৃজন করেছেন ; অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র। কবির সৃষ্টিও এই বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ—সে সৃজনের মূলে কোনও অভাব দূর কর্‌বার অভিপ্রায় নেই—সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার স্ফূর্ত্তি, এবং তার ফুল আনন্দ। এক কথায় সাহিত্যসৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র, এবং সে লীলা বিশ্বলীলার অন্তর্ভূত—কেননা জীবাত্মা পরমাত্মার অংগ এবং অংশ।

(৩)

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া,—কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে, পরের জন্যে খেলনা তৈরি কর্‌তে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন কর্‌তে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্ম্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাঙ্গালা-দেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুম্‌ঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্ম্মের জয়ঢাক,—এই সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্য-রাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না। কারণ, পাঠকসমাজ যে খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙ্গে ফেলে ;—সে প্রাচ্যই হোক, আর পাশ্চাত্ত্যই হোক, কাশীরই হোক, আর জর্ম্মাণীরই হোক, দুদিন ধরে তা কারও মনোরঞ্জন কর্‌তে পারে না। আমি জানি যে পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শই বেদনা বোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছুই নেই—কেননা কাব্যজগতে যার নাম আনন্দ, তারি নাম বেদনা। সে যাই হোক, পরের মনোরঞ্জন কর্‌তে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন—তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন কর্‌তে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা কর্‌তেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হ'ত ; কেননা, Knowledge এবং Art উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। "বিদ্যাসুন্দর" খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা—সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলংকৃত ;

তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে,—অন্ততঃ জহুরীর কাছে। অপরপক্ষে এ যুগে পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ—সুতরাং তাঁদের মনোরঞ্জন কর্‌তে হ'লে, আমাদের অতি সস্তা খেলনা গড়্‌তে হবে—নইলে তা বাজারে কাট্‌বে না। এবং সস্তা করার অর্থ খেলো করা। বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সঙ্গত। অতএব সাহিত্যে আর যাই কর না কেন, পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন কর্‌বার চেষ্টা কোরো না।

(৪)

তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া?—অবশ্য নয়। কেননা কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল না বন্ধ হলে যে খেলার সময় আসে না, এ ত সকলেরি জানা কথা। কিন্তু সাহিত্য-রচনা যে আত্মার লীলা, এ কথা শিক্ষকেরা স্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত নন। সুতরাং, শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্ম্মকর্ম্ম যে এক নয়—এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ, শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু, যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ কর্‌তে বাধ্য হয়, অপরপক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে পান করে,—কেননা শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো ; সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো। কাব্য যে সংবাদপত্র নয়—এ কথা সকলেই জানেন। তৃতীয়তঃ, অপরের মনের অভাব পূর্ণ কর্‌বার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্মলাভ করেছে—কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দ দান করা—শিক্ষা দান করা নয়—একটি উদাহরণের সাহায্যে তার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বাল্মীকি আদিতে মুনিঋষিদের জন্য রামায়ণ রচনা করেছিলেন,—জনগণের জন্যে নয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, বড় বড় মুনিঋষিদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন, তার প্রমাণ—তাঁরা কুশী-লবকে তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি কৌপীন পর্য্যন্ত, পেলা দিয়েছিলেন। রামায়ণ কাব্যহিসাবে যে অমর, এবং জনসাধারণ আজও যে তার শ্রবণে পঠনে আনন্দ উপভোগ করে, তার একমাত্র কারণ, আনন্দের ধর্ম্মই

এই যে তা সংক্রামক। অপরপক্ষে লাখে একজনও যে যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণের ছায়া মাড়ান না, তার কারণ সে বস্তু লোককে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, আনন্দ দেবার জন্যে নয়। আসল কথা এই যে, সাহিত্য কস্মিন্‌-কালেও স্কুলমাষ্টারীর ভার নেয়নি। এতে দুঃখ কর্‌বার কোনও কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুলমাষ্টারেরা একালে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন।

কাব্যরস নামক অমৃতে যে আমাদের অরুচি জন্মেচে, তার জন্য দায়ী—এ যুগের স্কুল এবং তার মাষ্টার। কাব্য—পড়বার ও বোঝবার জিনিস ; কিন্তু স্কুলমাষ্টারের কাজ হচ্ছে বই পড়ানো ও বোঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুলমাষ্টার দণ্ডায়মান। এই মধ্যস্থদের কৃপায় আমাদের সংগে কবির মনের মিলন দূরে থাক, চার চক্ষুর মিলনও ঘটে না। স্কুলঘরে আমরা কাব্যের রূপ দেখতে পাইনে,—শুধু তার গুণ শুনি। কাব্যভাষ্যের প্রসাদে আমরা কাব্যসম্বন্ধে সকল নিগূঢ়তত্ত্ব জানি, কিন্তু সে যে কি বস্তু, তা চিনিনে। আমাদের শিক্ষকদের প্রসাদে আমাদের এ জ্ঞান লাভ হয়েছে যে, পাথুরে কয়লা হীরার সবর্ণ না হলেও সগোত্র—অপরপক্ষে হীরক ও কাচ যমজ হলেও সহোদর নয়। এর একের জন্ম পৃথিবীর গর্ভে. অপরটির মানুষের হাতে ; এবং এ উভয়ের ভিতর এক দা-কুমড়ার সম্বন্ধ ব্যতীত অপর কোনও সম্বন্ধ নেই। অথচ এত জ্ঞান সত্ত্বেও আমরা সাহিত্যে কাচকে হীরা এবং হীরাকে কাচ বলে নিত্য ভুল করি, এবং হীরা ও কয়লাকে এক-শ্রেণীভুক্ত কর্‌তে তিলমাত্র দ্বিধা করিনে ;—কেননা ওরূপ করা যে সংগত, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের মুখস্থ আছে। সাহিত্য—শিক্ষার ভার নেয় না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উল্টো। কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তারপরে তার শবচ্ছেদ করা—এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা। এই সব কারণে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়,—কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়। বিচারের সাহায্যে এই মাত্রই প্রমাণ করা যায়। তবে সাহিত্য-বস্তু যে কি, তার জ্ঞান অনুভূতি-সাপেক্ষ, তর্ক-সাপেক্ষ নয়। সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে—এ কথার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয়, তাহলে কোন সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা তা স্পষ্টতর করা আমার অসাধ্য।

এই সব কথা শুনে আমার জনৈক শিক্ষাভক্ত বন্ধু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাহিত্য খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়। এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, সরস্বতীকে কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষয়িত্রীতে পরিণত কর্‌বার জন্যে যতদূর শিক্ষাবাতিকগ্রস্ত হওয়া দরকার, আমি আজও ততদূর হতে পারিনি।

—প্রমথ চৌধুরী

শুভ উৎসব

প্রাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আর যাহাই হউক, আমাদের পুরাতন বিচিত্র উৎসবকলা যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এখনকার উৎসবগুলি ক্রমশই যেন আপিসী ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিতেছে—তাহার মধ্যে দেনাপাওনা হিসাবপত্রের হাঙ্গামা যত অধিক, আনন্দ আর সে পরিমাণে নাই। পূর্ব্বে যে দেনাপাওনার সম্বন্ধ আদৌ ছিল না তাহা নহে, এবং হয়ত সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে আর্থিক সম্বন্ধ তখনও এখনকার মত প্রবল ছিল, কিন্তু অন্যপ্রকার সম্বন্ধের আবরণে এই হিসাবী সম্বন্ধটা তখন কোথাও বড় প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া উঠে নাই। ব্রাহ্মণ ফলাহারের পর দক্ষিণা না লইয়া বাড়ী ফিরিতেন না, কিন্তু দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এমন একটি মধুর সম্বন্ধ ছিল যে, দক্ষিণার আর্থিকতা তাহার মধ্যে স্থান পাইত না। মন্ত্রপাঠের ব্রাহ্মণ হইতে সুরু করিয়া কামার কুমোর ধোপা নাপিত হাড়ি ডোম পর্য্যন্ত সকলেরই নিজ নিজ মর্য্যাদানুসারে উৎসবাঙ্গে স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল—কাহাকেও বাদ দিলে চলিত না।

কিন্তু এখন ইংরাজী পণ্যশালার অনুগ্রহে যান্ত্রিক ভাবেই অনেক কার্য্য নিঃশব্দে সমাধা হইয়া উঠে। এক কলমের আঁচড়ে হ্যারিসন হ্যাথাওয়ে, হোয়াইট্যাওয়ে লেড্‌ল, অস্‌লর, ল্যাজারাসের ভবন হইতে যাহা কিছু আবশ্যক আনাইয়া লওয়া যায় ; এমন কি, নাপিত, পাচক, পরিবেষকাদিও সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমাদের পণ্যক্রিয়ার মধ্যে সজীব সহৃদয় মনুষ্যত্বের মধুর সংস্পর্শে যে একটি নিগূঢ় আনন্দ ছিল, ইহাতে সেটুকু দিতে পারে না স্বীকার করিতে হয়।—তখনকার দিনে বড়লোকের বাটীতে কোন ক্রিয়া-কর্ম্মোপলক্ষে মাসেক কাল পূর্ব্বে হইতে নানাবিধ পণ্যভার লইয়া দোকানী-পসারীরা গতিবিধি সুরু করিত। শালওয়ালা ভাল ভাল কাশ্মীরী শাল ও রুমাল লইয়া আসিত, মুর্শিদাবাদ ও ঘাটাল অঞ্চলের বণিকেরা নানাবিধ গরদ তসর ও রেশমী বস্ত্র আমদানি করিত, ঢাকা শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গা সিমলার ব্যাপারীরা কত প্রকারের সূক্ষ্ম ও বিচিত্রপাড় কার্পাসবস্ত্র এবং পশ্চিমী ক্ষেত্রীরা বেনারসী ও চেলীর জোড় লইয়া উপস্থিত হইত। এতদ্ভিন্ন, স্বর্ণকার কর্ম্মকার মালাকার ময়রা গোয়ালা পাথরওয়ালা কাংস্য-পিত্তল-বিক্রেতা—নানান্ জনে নানাবিধ ফরমাসে নিত্য গতায়াত করিত। এমন কি, বেদানার বস্তা লইয়া বিদেশী কাবুলীওয়ালা পর্য্যন্ত বাদ যাইত না। কিন্তু এ গতিবিধি নিতান্তই বাহিরের লোকের মত ছিল না, এবং এই খরিদ-বিক্রয়টুকুর মধ্যেই তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়া যাইত না। সকলেই উৎসাহসহকারে উৎসবের নানাবিধ অনুষ্ঠান-বিষয়ে পাঁচটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত, মন্তব্য দিত, প্রশ্ন করিত, কোথায় কি হইবে না-হইবে দেখিয়া শুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কাজের দিনে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেপুলেগুলিকে লইয়া উৎসব দেখিতে আসিত, এবং পুরাতন কাবুলীওয়ালা তাহার সখের জরীর কোর্ত্তা গায়ে দিয়া প্রসন্নমুখে দ্বারদেশে আসিয়া প্রহরী হইয়া দাঁড়াইত। নিতান্ত জড়-বিনিময় মাত্র না হইয়া আমরা তাহাদের পণ্যসামগ্রীর সহিত অন্তরের শুভ প্রীতিও অনেকখানি করিয়া লাভ করিতাম, এবং মুদ্রাখণ্ডের সহিত উৎসবের ভাগও কতক পরিমাণে দিতাম। এই যে অন্তরে অন্তরে "ফাউ" আদান-প্রদানটুকু, ইহাতেই বিশেষ আনন্দ, এবং এইটুকুর জন্যই আমাদের মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধে হীনতা সহজে দেখা যাইত না।

কেবলি যে বাহিরে বাহিরে এইরূপ গতিবিধি ও আদান-প্রদান ছিল তাহাও নহে। অন্তঃপুরে কুম্ভকারপত্নী নূতন বরণডালা সাজাইয়া আনিয়া দিত,

মালিনী নিত্য নব নব ফুলভার যোগাইত এবং ফুলসজ্জার জন্য নূতন নূতন ফুলের গহনা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিত, নাপতানী দিদিঠাকুরাণী ও বধূঠাকুরাণীদিগের কোমল পদপল্লবে ঝামা ঘষিয়া আল্‌তা পরাইয়া দিয়া যাইত, তাঁতিনী নূতন নূতন পাড়ের মনোহারিণী নীলাম্বরী ও বিচিত্র বর্ণের শাটিকা লইয়া আসিত। গোয়ালিনী মধ্যাহ্নভোজনান্তে, আর কিছু না হউক, গোয়ালাপাড়ার দুইটা মন্তব্য শুনাইয়া যাইত, এবং পাড়ার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণঠাকুরাণী স্বহস্তকর্ত্তিত কয়গাছি পৈতার সূতা আনিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া গল্প করিতে বসিতেন। এই এতগুলি বর্ষীয়সী- ও যুবতী-সমাগম যে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে সাধিত হইত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। হাস্য-পরিহাস, গল্পগুঞ্জন, সমালোচনা, বিধিব্যবস্থা-নির্দ্ধারণ ও নানা অনাবশ্যক উপদেশ পরামর্শ ও বিচারপ্রসঙ্গে বয়স্‌ ও অবস্থার তারতম্য ঘুচিয়া গিয়া সকলের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও সরস হইয়া উঠিত—দেনাপাওনার সম্বন্ধটুকু আদৌ প্রকাশ পাইত না। সকলেই যেন আত্মীয়-পরিজনবর্গের মধ্যে—যেন একটি বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের নানা অঙ্গ।

এইরূপে আমাদের প্রত্যেকের কোন শুভানুষ্ঠানের মধ্যে অলক্ষিতে এই এতগুলি লোকের শুভকামনা কার্য্য করিত, এবং ইহাতেই আমাদের সামান্য ক্রিয়াকর্ম্মও বৃহৎ উৎসবে পরিণত হইত। (নব্যতন্ত্র রজতচক্রকে যেরূপ সকল সম্বন্ধের মধ্যবিন্দু করিয়া তুলিতে চাহে, তখন তাহা ছিল না। ধনের পদমর্য্যাদা যথেষ্ট থাকিলেও কুলের গৌরবকে, প্রীতির সম্বন্ধকে সে লঙ্ঘন করিতে পারিত না।) এমন কি, বেতনভুক্‌ সামান্য দাসদাসীদিগকেও সংসারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখা হইত, এবং সুগৃহিণী ইহাদের কেহ ক্ষুধিত থাকিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এই যে হৃদ্যতাটুকু—এই যে ব্যথার ব্যথী ভাব—ইহা আর কিছুতেই থাকে না। পূর্ব্বে যেখানে প্রীতিসূচক আত্মীয়তাই স্বাভাবিক ছিল, এক্ষণে সেখানে নিকট-সম্বন্ধস্থাপনই অনেক সময়ে অত্যন্ত অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়া ঠেকে। আশ্রিতজন এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় হৃদয়ের আশ্রয় আর বড় পায় না, এবং আশ্রয়দাতাও তাহাদের হৃদয়ের অধীশ্বরত্ব হইতে বঞ্চিত হয়েন। (অন্তরে-অন্তরে কাহারও সহিত কাহারও কোনরূপ অনিবার্য্য যোগ নাই।)

(আমাদের উৎসবে এই অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা।) সমারোহসহকারে আমোদ-প্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না, কিন্তু

তাহার মধ্যে সর্ব্বজনের আন্তরিক প্রসন্নতা ও শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়। উৎসব-প্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও যদি ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়, শুভ উৎসব যেন একান্ত ক্ষুণ্ণ হয়। যাত্রা হউক, কথা হউক, রামায়ণগান হউক বা চণ্ডীপাঠ হউক,—যখন যাহা হয় উন্মুক্ত গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া সর্ব্বসাধারণে তাহাতে অকাতরে যোগদান করে, এবং সকলের সহিত একত্র হইয়া গৃহকর্ত্তা তাহা উপভোগ করেন।

যাহাতে আমার নিজের কিছুমাত্র আনন্দ আছে, সেই আনন্দটুকু যখন দশজনের মধ্যে বিতরণ করিতে চাহি, তখন উপলক্ষের অভাব ঘটিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি—এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। অনেক ছোটখাট বিষয়েও আমি হয়ত একটুকু আনন্দ পাই,—নিজের বাড়ীখানি হইলে সুখী হই, পুষ্করিণীটি থাকিলে লাগে ভাল, গোরুগুলির কল্যাণকামনা করি—গৃহপ্রবেশ, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠাষ্টমী—এইরূপ এক একটি উৎসব-উপলক্ষে পাঁচজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী, পোষ্যপরিজন, দীন দুঃখীকে আহবান করিয়া যথাসাধ্য সৎকারে আমার সুখের ভাগী করিতে চাহি। আমি যে আজ একজন গৃহহীনকে আশ্রয় দিতে পারি, তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসা নিবারণ করিতে পারি, অবোলা জীবের কিছুমাত্র সুখবিধান করিতে সমর্থ হই, আমার এ সৌভাগ্য যেন সকলের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহে। সাবিত্রীব্রত, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জামাতৃষষ্ঠী-উপলক্ষে আপন প্রিয়জন ও স্নেহাস্পদগণকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়: বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্যসুখ দিয়াছেন, ইহা সকলের সহিত বণ্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায়? উৎসব ইহারই উপলক্ষ। সেই জন্য আমাদের উৎসবে ভাবেরই প্রাধান্য—বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে। পতিব্রতা স্ত্রীর হাতের সামান্য লোহা ও মাথার সিন্দূর যেমন আমাদের মনে একটি অনির্ব্বচনীয় লক্ষ্মীশ্রী সূচিত করিয়া দেয়, নেত্রঝলসানো অলঙ্কাররাজি তাহা পারে না,—প্রীতি-বিকশিত উৎসবের সামান্য মঙ্গলঘট ও চূতপল্লবগুচ্ছ সেইরূপ আমাদের অন্তরে একটি শিবসুন্দর ভাব সঞ্চারিত করিয়া তুলে, সহস্র তাড়িতালোক ও বিলাস-উৎস সে শুভ কমনীয়তা সঞ্চার করিতে পারে না। বিলাসের মণিমুক্তা আমাদের বাহিরের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক মাত্র, কিন্তু উৎসবের

ধান্যদূর্ব্বামুষ্টি অন্তরের অকৃত্রিম শুভকামনার বাহ্য চিহ্ন। ইহার সহিত ধনীর রত্নভাণ্ডারেরও তুলনা সম্ভব নহে। (ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মত ইহার মধ্যে যেন কেমন একটি অক্ষুণ্ণ শুচিতা আছে—বাহ্যাড়ম্বর-বাহুল্যের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।)

—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুন্দর

যারা ভারি পণ্ডিত তারা সুন্দরকে প্রদীপ ধ'রে দেখতে চলে আর যারা কবি ও রূপদক্ষ তারা সুন্দরের নিজেরই প্রভায় সুন্দরকে দেখে' নেয়, অন্ধকারের মধ্যেও অভিসার করে তাদের মন। আলোর বেলাতেই কেবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে, কালোর দিক থেকে তিনি দূরে থাকেন—একথা একেবারেই বলা চল্ল না, বিষম অন্ধকার না ব'লে বলতে হ'ল বিশদ অন্ধকার—যদিও ভাষাতত্ত্ববিদ্ এরূপ কথায় দোষ দেখবেন। কালো দিয়ে যে আলো এবং রঙ সবই ব্যক্ত করা যায় সুন্দরভাবে তা রূপদক্ষ মাত্রেই জানেন। এই যে সুন্দর কালো এর সাধনা বড় কঠিন। সেইজন্য জাপানে ও চীনদেশে একটা বয়স না পার হ'লে কালি দিয়ে ছবি আঁকতে হুকুম পায় না গুরুর কাছ থেকে শিল্পশিক্ষার্থীরা। যে রচনায় রস রইলো সেই রচনাই সুন্দর হ'ল এটা স্থির, কিন্তু রস পাবার মত মনটি সকল মানুষেই সমানভাবে বিদ্যমান নেই, কাজেই এটা ভাল ওটা ভাল নয় এই রকম কথা ওঠে। মেঘের সঙ্গে ময়ূরের মিত্রতা, তাই কোন্ একদিন নিজের গলা থেকে গন্ধর্ব্বনগরের বিচিত্র রঙের তারা-ফুলে গাঁথা রঙ্গীন মালা ময়ূরের গলায় পরিয়ে দিয়ে মেঘ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে

দিলে। মানুষ প্রথম ভাবলে, এমন সুন্দর সাজ কারো নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সে দেখলে বকের পাতি পদ্মফুলের মালার ছলে সুন্দর হয়ে মেঘের বুক থেকে মাটির বুকে নেমে এল,—মানুষ বল্লে, ময়ূর ও বক এরা দুইটিই সুন্দর। আবার এল একদিন জলের ধারে সারস পাখী—মেঘ যাকে নিজের গায়ের রঙে সাজিয়ে পাঠালে। এমনি একের পর এক সুন্দর দেখতে দেখতে মানুষ বর্ষাকাল কাটালে, তারপর শরতে দেখা দিলে আকাশে নীলপদ্মমালার দুটি পাপড়িতে সেজে নীলকণ্ঠ পাখী। এমনি ঋতুর পর ঋতুতে সুন্দরের সন্দেশ-বহ আসতে লাগলো একটির পর একটি মানুষের কাছে—সবশেষে এলো রাতের কালো পাখী আকাশপটের আলো নিভিয়ে অন্ধকার দুখানি পাখ্না মেলে—পৃথিবীর কোন ফুল, আকাশের কোন তারার সঙ্গে মানুষ তার তুলনা খুঁজে না পেয়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো।

এই যে একটি মানুষের কথা বল্লেম, এমন মানুষ জগতে একটি দুটি পাই যার কাছে সুন্দর ধরা দিচ্ছেন সকল দিকে নানা সাজে নানা রূপে বর্ণে সুরে ছন্দে! ময়ূরই সুন্দর, কলবিঙ্ক নয়, কাক নয় এই কথা যারা বলছে এমন মানুষই পৃথিবী ছেয়ে র'য়েছে দেখতে পাই।

যার চোখ সুন্দরকে দেখতে পেলে না আজন্ম তার চোখের উপরে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা ঘ'ষে ঘ'ষে ক্ষইয়ে ফেল্লেও ফল পাওয়া যায় না, আবার যে সুন্দরকে দেখতে পেলে সে অতি-সহজেই দেখে নিতে পারলে সুন্দরকে, কোনো গুরুর উপদেশ পরামর্শ এবং ডাক্তারি দরকার হ'ল না তার, বিনা অঞ্জনেই সে নয়নরঞ্জনকে চিনে নিলে।

মাটি থেকে আরম্ভ ক'রে সোনা পর্য্যন্ত, যে ভাষায় কথা চলে সেটি থেকে ছন্দোময় ভাষা পর্য্যন্ত, তারের সুর থেকে গলার সুর পর্য্যন্ত বহুতর উপকরণ দিয়ে রূপদক্ষেরা রচনা ক'রে চলেছেন সুন্দরের জন্য বিচিত্র আসন, মানুষের কাজে কতটা লাগবে কি না লাগবে এ ভাবনা তাঁদের নেই। কাদায় যে গড়ে সে কাদাছানা থেকেই সুন্দরের ধ্যান ক'রে চলে, না হ'লে গড়ার উপযুক্ত ক'রে মাটি কিছুতে প্রস্তুত করতে পারে না সে—একথাটা কারিগরের কাছে হেঁয়ালী নয়। চাষের আরম্ভ থেকেই সোনার ধানের স্বপ্ন জমীতে বিচিয়ে দেয় চাষা, কিন্তু যার সুন্দরের ধ্যান মনে নেই সে যখন ভাল মাটি নিয়ে ব'সে যায় এবং দেখে মাটি বাগ মানছে না তার হাতে, তখন সে হয়তো বোঝে হয়তো বোঝেও না কথাটার মর্ম্ম।

ছন্দ, সুর-সাধা এবং রঙ-প্রস্তুত ও তুলি-টানার প্রকরণ সহজে মানুষ আয়ত্ত করতে পারে, কিন্তু তুলি-টানা হাতুড়ি-পেটা কলম-চালানোর আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত সুন্দরের ধ্যানে মনকে স্থির রাখতে সবাই পারে না, এমন কি যারা রূপদক্ষ তারাও সময়ে সময়ে লক্ষ্য হারিয়ে ফেলছে তাও দেখা যায়।

যে রচনাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তার মধ্যে রচনার কল-কৌশল ধরা যায় না—কথা সে যেন ভারি সহজে বলা হয়ে যায় সেখানে। এই যে সহজ গতি এ থাকে না যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয় তাতে—কৌশল নৈপুণ্য সবই চোখে পড়ে। কবিতা থেকে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, ছবি মূর্ত্তি সব থেকে এটা প্রমাণ করা চলে। কর্ম্ম কোনো রকমে নিষ্পন্ন হ'ল এবং কর্ম্ম খুব হাঁকডাক ধূমধামে নিষ্পন্ন হয়ে গেল, কিন্তু কর্ম্মের জঞ্জালগুলো চোখে পড়লো না।

আমি একবার একটা ছাপার কল অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। যন্ত্রটা একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের কাজ একা করছে, মানুষের চেয়ে সুচারু ও দ্রুতভাবে। এতে ক'রে ভারি একটা আনন্দ হ'ল, কিন্তু একটি পাখীকে উড়তে দেখে যে আনন্দ তার সঙ্গে সেদিনের আনন্দের তফাৎ ছিল। পাখীর ডানার মধ্যে নানা কল-বল কি ভাবে কাজ করছে তার খোঁজই নেই, ওড়ার সুন্দর ছন্দই সেখানে দেখা দিয়ে মনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কোন্ দেশে তার ঠিক নেই। সৃষ্টির নিয়মে সমস্ত সুন্দর জিনিষ আপনার নির্ম্মাণের কৌশল লুকিয়ে চল্লো দর্শকের কাছ থেকে এবং এই নিয়মই মেনে চল্লো সমস্ত সুন্দর জিনিষ যা মানুষে রচনা ক'রলে—যেখানে নির্ম্মাণের নানা প্রকরণ ও কৌশল ধরা প'ড়ে গেল সেখানেই রচনার সৌন্দর্য্য হানি হ'ল, কলের দিক্ ফুটলো কিন্তু রসের দিক্ সৌন্দর্য্যের দিক্ চাপা প'ড়ে গেল। ঘুড়ি যখন আকাশে ওড়ে তখন যে কলটি তাতে বেঁধে দেয় কারিগর, সেটি বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায় তবেই সুন্দর ঠেকে ঘুড়িখানির ওড়ার ছন্দ। জাহাজ এমন কি উড়ো কল তারাও দেখায় সুন্দর এই কারণে এবং সবচেয়ে দেখায় সুন্দর গঙ্গার উপরে নৌকাগুলি যার চলার হিসেব ও কল-বল প্রত্যক্ষ হয়েও চক্ষুশূল হচ্ছে না।

সুন্দর জিনিষের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা—যেমন রূপ, তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্ত্তমান হ'ল। চোখের বাইরে যে পরকলা তার সঙ্গে

চোখের ভিতরে যে মণিদর্পণ তার যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য হ'ল; তখনই সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া গেল বিশ্বের জিনিষ, চশমার কাঁচে আঁচড় প'ড়লো চোখ রইলো পরিষ্কার, কিংবা চোখের মণিতে ছানি প'ড়লো চশমা রইলো ঠিকঠাক, এ হ'লে সুন্দর দেখা একেবারেই সম্ভব হ'ল না।

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জগন্নাথের রথ

আদর্শ সমাজ মনুষ্য-সমষ্টির অন্তরাত্মা ভগবানের বাহন, জগন্নাথের যাত্রার রথ। ঐক্য, স্বাধীনতা, জ্ঞান, শক্তি—সেই রথের চারি চক্র।

মনুষ্যবুদ্ধির গঠিত কিংবা প্রকৃতির অশুদ্ধ প্রাণস্পন্দনের খেলায় সৃষ্ট যে সমাজ, তাহা অন্য প্রকার। এটি সমষ্টির নিয়ন্তা ভগবানের রথ নহে, মুক্ত অন্তর্যামীকে আচ্ছাদিত করিয়া যে বহুরূপী দেবতা ভগবৎ-প্রেরণাকে বিকৃত করে, ইহা সমষ্টিগত সেই অহঙ্কারের বাহন। এটি চলিতেছে নানা ভোগপূর্ণ লক্ষ্যহীন কর্ম্মপথে, বুদ্ধির অসিদ্ধ অপূর্ণ সংকল্পের টানে, নিম্নপ্রকৃতির পুরাতন বা নূতন অবশ প্রেরণায়। যত দিন অহঙ্কারই কর্ত্তা, ততদিন প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব,—লক্ষ্য জানা গেলেও সেদিকে সোজা রথ চালানো অসাধ্য। অহঙ্কার যে ভাগবত পূর্ণতার প্রধান বাধা, এই তথ্য যেমন ব্যষ্টির, তেমনই সমষ্টির পক্ষেও সত্য।

সাধারণ মনুষ্যসমাজের তিনটি মুখ্য ভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমটি নিপুণ কারিগরের সৃষ্টি, সুঠাম চাকচিক্যময় উজ্জ্বল অমল সুখকর, তাহাকে বহিয়া চলিয়াছে বলবান্ সুশিক্ষিত অশ্ব, সে অগ্রসর হইতেছে সুপথে সযত্নে ত্বরারহিত

মন্থর গতিতে। সাত্ত্বিক অহংকার ইহার মালিক আরোহী। যে উপরিস্থ উত্তুংগ প্রদেশে ভগবানের মন্দির, রথ তাহারই চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু কিছু দূরে দূরে রহিয়া, সেই উচ্চভূমির খুব নিকটে সে পেঁাছিতে পারে না। যদি উঠিতে হয়, তবে রথ হইতে নামিয়া একা পদব্রজে উঠাই নিয়ম। বৈদিকযুগের পরে প্রাচীন আর্য্যদের সমাজকে এই ধরণের রথ বলা যায়।

দ্বিতীয়টি বিলাসী কর্ম্মঠের মোটরগাড়ী। ধূলার ঝড়ের মধ্যে ভীমবেগে বজ্রনির্ঘোষে রাজপথ চূর্ণ করিয়া অশান্ত অশ্রান্ত গতিতে সে ধাইয়াছে, ভেরীর রবে শ্রবণ বধির, যাহাকে সম্মুখে পায় দলিয়া পিষিয়া চলিয়া যায়। যাত্রীর প্রাণের সংকট, দুর্ঘটনা অবিরল, রথ ভাঙিগয়া যায়, আবার কষ্টেসৃষ্টে মেরামতের পর সদর্প চলন। নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, তবে যে নূতন দৃশ্য অনতিদূরে চোখের সম্মুখে পড়ে, "এই লক্ষ্য, এই লক্ষ্য" চীৎকার করিয়া রথের মালিক রাজসিক অহংকার সেই দিকে ছুটে। এই রথে চলায় যথেষ্ট ভোগসুখ আছে, বিপদ্‌ও অনিবার্য্য, ভগবানের নিকট পেঁাছানো অসম্ভব। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজ এই ধরণেরই মোটরগাড়ী।

তৃতীয়টি মলিন পুরানো কচ্ছপগতি আধভাংগা গোরুর গাড়ী, টানে কৃশ অনশনক্লিষ্ট আধমরা বলদ, চলিতেছে সংকীর্ণ গ্রাম্যপথে ; একজন ময়লা-কাপড়পড়া ভুঁড়িসর্ব্বস্ব শ্লথ অন্ধ বৃদ্ধ ভিতরে বসিয়া মহাসুখে কাদামাখা হুঁকা টানিতে টানিতে গাড়ীর কর্কশ ঘ্যান্ ঘ্যান্ শব্দ শুনিতে শুনিতে অতীতের কত বিকৃত আধ আধ স্মৃতিতে মগ্ন। এই মালিকের নাম তামসিক অহংকার। গাড়োয়ানের নাম পুঁথি-পড়া জ্ঞান, সে পঞ্জিকা দেখিতে দেখিতে গমনের সময় ও দিক্ নির্দ্দেশ করে, মুখে এই বুলি "যাহা আছে বা ছিল, তাহাই ভাল, যাহা হইবার চেষ্টা তাহাই খারাপ।" এই রথে ভগবানের নিকট না হউক, শূন্যে ব্রহ্মে পেঁাছিবার বেশ আশু সম্ভাবনা আছে।

তামসিক অহংকারের গোরুর গাড়ী যতক্ষণ গ্রামের কাঁচাপথে চলে, ততক্ষণ রক্ষা। যেদিন জগতের রাজপথে সে উঠিয়া আসিবে যেখানে ভূরি ভূরি বেগদৃপ্ত মোটরের ছুটাছুটি, সেদিন তাহার কি পরিণাম হইবে, সে কথা ভাবিতেই প্রাণ শিহরিয়া উঠে। বিপদ্ এই যে, রথ বদলানোর সময় চেনা বা স্বীকার করা তামসিক অহংকারের জ্ঞানশক্তিতে কুলায় না। চিনিবার প্রবৃত্তিও নাই, তাহা হইলে তাহার ব্যবসা ও মালিকত্ব মাটি। সমস্যা যখন উপস্থিত, যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ বলে "না থাক, ইহাই ভাল, কেননা ইহা আমাদেরই"--তাহারা গোঁড়া

অথবা ভাবুক দেশভক্ত। কেহ কেহ বলে, "এদিক্ ওদিক্ মেরামত করিয়া লও না"—এই সহজ উপায়ে নাকি গোরুর গাড়ী অমনি অনিন্দ্য অমূল্য মোটরে পরিণত হইবে ;—ইহাদের নাম সংস্কারক। কেহ কেহ বলে, "পুরাতন কালের সুন্দর রথটি ফিরিয়া আসুক"—তাহারা সেই অসাধ্য সাধনের উপায়ও খুঁজিতে মাঝে মাঝে প্রয়াসী। আশার অনুরূপ ফল যে হইবে, তাহার বিশেষ কোন লক্ষণ কোথাও কিন্তু নাই।

তিনটির মধ্যেই যদি পছন্দ করা অনিবার্য্য হয়, আরও উচ্চতর চেষ্টা যদি আমরা পরিহার করি, তবে সাত্ত্বিক অহংকারের নূতন রথ নির্ম্মাণ করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু জগন্নাথের রথ যতদিন সৃষ্ট না হয়, আদর্শ সমাজও ততদিন গঠিত হইবে না। সেইটিই আদর্শ, সেইটিই চরম, গভীরতম উচ্চতম সত্যের বিকাশ ও প্রতিকৃতি। মনুষ্যজাতি গুপ্ত বিশ্বপুরুষের প্রেরণায় তাহাকেই গড়িতে সচেষ্ট, কিন্তু প্রকৃতির অজ্ঞানবশে গড়িয়া বসে অন্যরূপ প্রতিমা—হয় বিকৃত অসিদ্ধ কুৎসিত, নয় চলনসই অর্দ্ধসুন্দর বা সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ ; শিবের বদলে হয় বামন, নয় রাক্ষস, নয় মধ্যম লোকের অর্দ্ধদেবতা।

জগন্নাথের রথের প্রকৃত আকৃতি বা নমুনা কেহ জানে না, কোন জীবন-শিল্পী আঁকিতে সমর্থ নয়। সেই ছবি বিশ্বপুরুষের হৃদয়ে প্রস্তুত, নানা আবরণে আবৃত। দ্রষ্টা কর্ত্তার অনেক ভগবদ্‌বিভূতির অনেক চেষ্টায় আস্তে আস্তে বাহির করিয়া স্থূল জগতে প্রতিষ্ঠা করা অন্তর্য্যামীর অভিসন্ধি।

জগন্নাথের এই রথের আসল নাম সমাজ নয়, সংঘ। বহুমুখী শিথিল জনসংঘ বা জনতা নয়; আত্মজ্ঞানের, ভাগবতজ্ঞানের ঐক্যমুখী শক্তির বলে সানন্দে গঠিত বন্ধনরহিত অচ্ছেদ্য সংহতি, ভাগবত-সংঘ।

অনেক সমবেত মনুষ্যের একত্র কর্ম্ম করিবার উপায় যে সংহতি, তাহাই সমাজ নামে খ্যাত। শব্দের উৎপত্তি বুঝিয়া অর্থও বোঝা যায়। সম্ উপসর্গের অর্থ একত্র, অজ্ ধাতুর অর্থ গমন, ধাবন, যুদ্ধ। সহস্র সহস্র মানব কর্ম্মার্থে ও কামার্থে সমবেত, এক ক্ষেত্রে নানা লক্ষ্যের দিকে ধাবিত, কে আগে যায়, কে বড় হয়, তাহা লইয়া ধস্তাধস্তি—competition—যেমন অন্য সমাজের সঙ্গে তেমন পরস্পরের সঙ্গেও যুদ্ধ ও ঝগড়াঝাঁটি—এই কোলাহলের মধ্যেই শৃঙ্খলার জন্য, সাহায্যের জন্য, মনোবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য নানা সম্বন্ধস্থাপন, নানা আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ফলে কষ্টসিদ্ধ অসম্পূর্ণ অস্থায়ী কিছু, ইহাই সমাজের, প্রাকৃত সংসারের চেহারা।

ভেদকে ভিত্তি করিয়া প্রাকৃত সমাজ। সেই ভেদের উপর আংশিক অনিশ্চিত ও অস্থায়ী ঐক্য নির্ম্মিত। আদর্শ সমাজের গড়ন ঠিক ইহার বিপরীত। ঐক্য ভিত্তি; আনন্দবৈচিত্র্যের জন্য—ভেদের নয়, পার্থক্যের খেলা। সমাজে পাই শারীরিক, মানসকল্পিত ও কর্ম্মগত ঐক্যের আভাসমাত্র। আত্মগত ঐক্য সংঘের প্রাণ।

আংশিকভাবে সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সংঘস্থাপনের নিষ্ফল চেষ্টা কতবার হইয়াছে, হয় তাহা বুদ্ধিগত চিন্তার প্রেরণায়—যেমন পাশ্চাত্ত্যদেশে, নয় নির্ব্বাণোন্মুখ কর্ম্মবিরতির স্বচ্ছন্দ অনুশীলনার্থে—যেমন বৌদ্ধদের, নয় ত ভাগবত ভাবের আবেগে—যেমন প্রথম খৃষ্টীয় সংঘ। কিন্তু অল্পের মধ্যেই সমাজের যত দোষ, অসম্পূর্ণতা, প্রবৃত্তি ঢুকিয়া সংঘকে সমাজে পরিণত করে। চঞ্চল বুদ্ধির চিন্তা টেকে না, পুরাতন বা নূতন প্রাণ প্রবৃত্তির অদম্য স্রোতে ভাসিয়া যায়। ভাবের আবেগে এই চেষ্টার সাফল্য অসম্ভব, ভাব নিজের খরতায় পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। নির্ব্বাণকে একাকী খোঁজা ভাল, নির্ব্বাণ-প্রিয়তায় সংঘসৃষ্টি একটা বিপরীত কাণ্ড। সংঘ স্বভাবতঃ কর্ম্মের, সম্বন্ধের লীলাভূমি।

যেদিন জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভাবের সামঞ্জস্যে ও একীকরণে আত্মগত ঐক্য দেখা দিবে, সমষ্টিগত বিরাট্‌পুরুষের ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায়, সেদিন জগন্নাথের রথ জগতের রাস্তায় বাহির হইয়া দশ দিক্‌ আলোকিত করিবে। সত্যযুগ নামিবে পৃথিবীর বক্ষে, মর্ত্ত্য মানুষের পৃথিবী হইবে দেবতার খেলার শিবির, ভগবানের মন্দির-নগরী, temple city of God—আনন্দপুরী।

—শ্রীঅরবিন্দ

ভদ্রতা

ভদ্রতা আত্মীয়তার চেয়ে কিছু কম এবং সামাজিকতার চেয়ে কিছু বেশী। আত্মীয়তা আন্তরিক, সামাজিকতা আনুষ্ঠানিক। ভদ্রতা উভয়ের মধ্যে সেতু-স্বরূপ, এবং উভচর।

এই বন্ধনের গুণেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয় : নচেৎ বাকি শুধু উচ্ছৃংখল একাকার পশুত্ব,—কিংবা মুক্ত নিরাকার দেবত্ব!

অবশ্য যেখানে ভালবাসা, ভক্তি, ভয় বা অন্য কোন ভ-পূর্ব্বক ভাবাত্মক সম্বন্ধ বিদ্যমান, সেখানে ভদ্রতার কথা ওঠেই না,—কারণ, খণ্ড ত সমগ্রের অন্তর্গত। যেখানে সন্তুষ্ট করবার ইচ্ছে স্বাভাবিক, সেখানে ব্যবহার ত আপনা হইতেই শুধু শিষ্ট কেন, মিষ্টই হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে অপরিচয় বা অতি পরিচয় বা ঔদাসীন্যবশতঃ মন সহজে অনুকূল নয়, সেইখানেই ভদ্রতার শিক্ষা ও চর্চ্চার প্রয়োজন। অর্থাৎ মনোভাব যেমনই থাকুক না কেন, লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নাম ভদ্রতা। এবং যে সমাজ যত সভ্য, তার লোক-ব্যবহার তত সদ্ভাবমূলক ও সুরুচিব্যঞ্জক।

সকলের মত এক না হলেও যেমন কার্য্যক্ষেত্রে অধিকাংশের মতে মত দিতে হয়, নইলে কাজ চলে না ; তেমনি সকলের মন সমান না হলেও, সামাজিক অনুষ্ঠানে সৌভ্রাত্র ও সৌষ্ঠব রক্ষার্থে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়, তাকে বলে রীতি। ভদ্রতা রীতিমাত্র নয়, তার চেয়ে কিছু বেশী উদার। কারণ, রীতি ক্রিয়া-কর্ম্মক্ষেত্রে ও স্বশ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ ; কিন্তু ভদ্রতা সমাজবিশেষ ও স্থানবিশেষ ছাড়িয়ে সকল সমাজ এবং সকল অবস্থায় পরিব্যাপ্ত। মানুষমাত্রেই পরস্পরের কাছে তা সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা দাবি করতে পারে।

অপরপক্ষে নীতির তুলনায় ভদ্রতার ক্ষেত্র অনেক সংকীর্ণ। কোমর বেঁধে পৃথিবীর দুঃখ দূর বা পরের উপকার করতে যাওয়া, কিংবা ন্যায়ান্যায়ের বিচারপূর্ব্বক চলা, অথবা মহৎ কর্ত্তব্য পালন করা ভদ্রতার এলাকা নয়। যারা কাছাকাছি আছে, কিংবা ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে, তাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করাই তার মূল উদ্দেশ্য। সাময়িক এবং উপস্থিত নিয়ে তার কারবার,—কিন্তু অভাবপক্ষে তারই মধ্যে খণ্ডপ্রলয় বেধে যেতে পারে।

কিন্তু রীতির সঙ্গে ভদ্রতার এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে, সব সময় সকলের প্রতি সকলের মনে সমান সদ্ভাব থাকা যখন সম্ভব নয়, তখন অন্ততঃ বাইরের প্রকাশের সুষমাবিধানার্থে অনুষ্ঠানের ন্যায়-ব্যবহারকেও কতকগুলি নিয়মাধীন করা সমাজ আবশ্যক মনে করে। আর নীতির সঙ্গে তার এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে, মানুষের অন্তরতম প্রদেশে যদি মানুষের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি না থাক্‌ত ও পরস্পরের মনে আঘাত দেবার সহজ অপ্রবৃত্তি না হ'ত, তাহ'লে দীর্ঘকাল ধরে বহু লোকের পক্ষে সে নিয়ম রক্ষা করে চলা প্রায় অসম্ভব হ'ত। সুতরাং ভদ্রতাকে সংক্ষেপে লোকব্যবহারের ক্ষুদ্র রীতিনীতি বলা যেতে পারে। কিংবা মনুষ্য সম্বন্ধের 'ল· সা· গু·',—অর্থাৎ প্রত্যেকের পরস্পরের প্রতি সেই পরিমাণ সদ্ভাব-প্রকাশ, যেটুকু নইলে জীবন-যান তৈলাভাবে অচল হয়ে পড়ত। কি ঘরে, কি বাইরে, এই সামান্য স্নেহলাভেও যে অনেক সময় মানুষকে বঞ্চিত হ'তে হয়, সেটি বড়ই দুঃখের বিষয়। অবশ্য সভ্যসমাজে অধিকাংশ লোকই স্পষ্টতঃ অভদ্র নয় : কিন্তু যে মার্জ্জিত ও মোলায়েম, সদাশয় ও সুশ্রী, চৌকোষ ও চোস্ত ব্যবহারকে যথার্থ ভদ্রতা বলা যেতে পারে, তাও সুলভ নয়।

অনেকে আজকাল আক্ষেপ করেন যে, একালের ছেলেদের ভদ্রতা কমে গিয়েছে। যেহেতু অল্প লোকেরই দ্বিকালজ্ঞ হবার সুযোগ ঘটে, সে কারণ আমি এ কথার সমর্থন বা প্রতিবাদ করতে অক্ষম। তবে এইটুকু স্বীকার্য্য যে, আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার দিন এদেশে গেছে বা যেতে বসেছে।

তার কারণ হয়ত এই যে, একালের লোকের সময়-সংক্ষেপ। প্রত্যেক চিঠির লাইন যোড়া ভিন্ন ভিন্ন পাঠ শিখতে ও লিখতে হ'লে বোধ হয় ইস্কুলের পাঠ বন্ধ করতে হয়। আর উঠতে বসতে যদি প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়, কিংবা সকলের কুশল প্রশ্ন অন্তে অন্য কথা পাড়তে হয়, তাহ'লেও আধুনিক জীবনযাত্রা চালানো দায় হয়ে পড়ে।

আর এক কারণ এই হ'তে পারে যে, একালে গুরু-লঘু সম্পর্কের দূরতাকে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত করবার দিকে আমাদের ঝোঁক হয়েছে। মাকে 'আপনি' বলা, বাপ-খুড়োর সামনে তটস্থ হয়ে থাকা, শাশুড়ী-ননদের কাছে এক হাত ঘোমটা টেনে ইসারায় কথা কওয়ার আমলের তুলনায় আজকাল আমরা হয়ত অপেক্ষাকৃত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

কিন্তু এমন যে ব্রাহ্মণ জাতি,—যার তুল্য গুরু সেকালে ছিল না, তারাও যখন কলিকালে পূর্ব্বপ্রাপ্য পদমর্য্যাদা থেকে চ্যুত হ'তে বাধ্য হয়েছেন, তখন অন্যান্য গুরুজনকেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণে নিজ নিজ বাকি খাজনা এবং উপরি পাওনার লোভ সংবরণপূর্ব্বক সমতল সমকক্ষতার শ্রীক্ষেত্রে হাসিমুখে নামতে হবে, এবং কালের সংগে সমপদবিক্ষেপে চল্‌তে হবে। সুতরাং উপরি-উক্ত অনুষ্ঠানের ত্রুটি মার্জনা ক'রে দেখতে হবে যে, সারভূত ভদ্রতার লক্ষণ কি,—যে ভদ্রতা সব দেশের, সব কালের এবং সব পাত্রের।

প্রতীক বা স্মরণচিহ্ন রচনার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মজ্জাগত। অসীমকে সসীমে বাঁধবার, নিরাকারকে সাকারে ধরবার প্রয়াস তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৌত্তলিক ; তবে প্রকাশের তারতম্য আছে, সাকারীকরণের মাত্রাভেদ আছে। মূর্ত্তিও সাকার, মন্ত্রও সাকার,—কিন্তু কম বেশী। বড়কে ছোটর দ্বারা, ব্যষ্টিকে সমষ্টি দ্বারা, অরূপকে রূপ দ্বারা প্রকাশ করবার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য অস্পষ্টকে পরিস্ফুট এবং অলক্ষ্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা। তোমার মনে অনেকখানি ভক্তি থাকতে পারে, কিন্তু বাইরে তার কোন চিহ্ন না দেখালে আমিই বা জানব কি ক'রে, তুমিই বা জানাবে কি ক'রে?—অতএব প্রণাম কর। অতএব দাম্পত্য-জীবনের বন্ধন লৌহ দ্বারা স্মরণ করাও, তার আনন্দ সিন্দূর-অলক্তক-তাম্বূলের লোহিত রাগে ব্যক্ত কর ; এবং বৈধব্যের শূন্যতা বরণাভরণহীন বেশে সূচিত হোক্। খৃষ্টের পরার্থপর অমানুষিক যন্ত্রণা একটি ক্রুশের চতুঃসীমায় আবদ্ধ, বিশ্বলক্ষ্মীর অপরিসীম, অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য একটি পদ্মে বিকশিত, ভক্তির চক্ষে অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি একটি অংগুষ্ঠপরিমাণ প্রতিমায় প্রতিষ্ঠিত।

এই চিহ্নতন্ত্রে লাভও আছে, যেহেতু মানুষের সহজ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংযত ক'রে আনবার সাহায্য করে ; আবার ক্ষতিও আছে, যেহেতু জড়বস্তু দ্বারা চেতনকে, অনুষ্ঠান দ্বারা অনুভূতিকে চাপা দেবারও সাহায্য করে। প্রণাম আন্তরিক ভক্তিজ্ঞাপনও করতে পারে, আবার তার অভাব গোপনও করতে পারে।

সেইজন্য সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সত্যের সেই সকল প্রমাণের প্রতি বোধ হয় মানুষের বেশী ঝোঁক হয়েছে, যা অত সুলভ ও ক্ষণস্থায়ী নয়; যা একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট আচরণে পর্য্যবসিত নয়, কিন্তু সমগ্র জীবনে পরিব্যাপ্ত।

এইজন্যই বল্‌ছিলুম যে আনুষ্ঠানিক বা স্থূল ভদ্রতা অপেক্ষা আজকাল সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর মূল ভদ্রতার মূল্য বেশী হ'তে চলেছে। দেশকাল-ভেদে প্রথমোক্তের নানা ভিন্ন প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু শেষোক্ত-সম্বন্ধে মতভেদের অবসর কম। ভদ্রতার এই বাহ্য আকৃতিবৈষম্য ভুলে গিয়ে তার অন্তঃপ্রকৃতি-বিশ্লেষণের প্রতি মন দিলে দেখতে পাব যে. তার কতকগুলি লক্ষণ সর্ব্বজনীন ও সর্ব্ববাদিসম্মত।

প্রথমতঃ—ভদ্রতার মূল পরহিতৈষণা, এবং তার ফুল সংযম। উপস্থিতমত পরের যাতে কষ্ট না হয়,—আমার বাড়ী এসে বা আমার সম্পর্কে থেকে ক্ষণকাল যাতে অন্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে,—ভদ্রলোকের স্বভাবতই এই ইচ্ছা হয়। এবং সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে হ'লে অনেক সময় নিজের তৎকালীন প্রতিকূল ইচ্ছা দমন করতে হয়, নিজের আপাত সুবিধা বিসর্জন দিতে হয়। আমার যে সময় জরুরী কাজ আছে, সে সময় হয়ত একজন দেখা করতে এলেন; ভদ্রতার নিয়মানুসারে আমার সব কাজ ফেলে রেখে তার আতিথ্যে মনোনিবেশ করতে হবে। কিংবা হয়ত কোন মাননীয় ব্যক্তি আমার মুখের সামনে হয়কে নয়, সাদাকে কালো বলছেন; আমার কণ্ঠাগ্রে এলেও মুখে বলবার সাধ্য নেই যে, "ওগো, তুমি মিথ্যে কথা বল্‌ছ"; কিংবা আর একজনকে—"তোমার নিজেরই সম্পূর্ণ দোষে ত্রুটি ঘটেছে"; কিংবা অপর একজনকে—"অন্যের নিন্দা করবার আগে, একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখ্‌লে ভাল হয় না?"

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সম্প্রতি যে অভদ্রতার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, এই প্রসঙ্গে সেজন্য দুঃখপ্রকাশ না ক'রে থাকা যায় না। সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করবার সময়ও কি জুতজোড়াটার সঙ্গে আমরা বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ দলাদলির ভাবটা বাইরে রেখে আসতে পারিনে? অবশ্য সাহিত্যচর্চ্চার যদি কোন উচ্চ লক্ষ্য থাকে ত, সে কেবল লীলা-কমলের ব্যজনে অবলীলাক্রমে সাধিত হবে না, তা জানি,—অকল্যাণকে তাড়াতে হ'লে মধ্যে মধ্যে কুলোর বাতাসও দেওয়া চাই। কিন্তু তীক্ষ্ন সূক্ষ্ম মারাত্মক আর যে-কোন প্রকার ভাষার অস্ত্র সাহিত্যরথী ব্যবহার করুন না কেন, ইতরতা বা রূঢ়তার অস্ত্রপ্রয়োগ এস্থলে নিষিদ্ধ হওয়া

উচিত। যিনি বাণীর সেবক হবার স্পর্দ্ধা রাখেন, অশুদ্ধ বাণী ব্যবহার করা তাঁর পক্ষে বিশেষরূপে বিসদৃশ নয় কি?

স্পষ্টবাদীর দল উল্লিখিত সংযমাত্মক ভদ্রতাকে কপটতার নামান্তর মনে করেন। "আমার বাপু স্পষ্ট কথা" ব'লে আরম্ভ ক'রে তাঁরা মুখে যা আসে তাই বল্‌তে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, বরং গর্ব্বই অনুভব করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মন এবং মুখের মধ্যে একটা পাকা বাঁধ বেঁধে না রাখলে দু'দিনও কি সমাজ টিকতে পারে?—আমার ত মনে হয় কতকগুলি কথা বা বিষয়কে একঘরে করা ভালই হয়েছে। স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়ে ভদ্রসমাজে সে বাঁধ ভাঙ্গায় আমি ত কোন বাহাদুরি বা সুবিধা দেখতে পাইনে। সামান্য একটি খিল খুলে দিলে অতি বড় বন্ধনও সহজে শিথিল হয়ে পড়ে; একটি পরদা তুলে ফেল্লেও অনেকটা আব্রু নষ্ট হ'তে পারে। কথার সংযম কিছু কম গুরুতর জিনিস নয়। যদি তা কপটতাই হয় ত সে-পরিমাণ কপটতা সমাজরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। আমাদের কান যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সূক্ষ্ম শব্দের বেশী শুনতে পায় না; চোখ যেমন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরতার বেশী দেখতে পায় না; তেমনি বোধ হয় অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্য আমাদের মন গ্রাহ্য বা সহ্য করতে পারবে না ব'লেই ভগবান্ দয়া ক'রে অন্তরের আড়ালে রেখে দিয়েছেন। ঐখানেই ত তার ভদ্রতা!—বেশী তলিয়ে বুঝে লাভ কি? অনেক সময় কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোয়; কিংবা ঐ কথাই একটু ঘুরিয়ে ভাব দিয়ে বলা যেতে পারে যে, অনেক সময় সত্য খুঁজতে খুঁজতে শুধু "নিখিল অশ্রুসাগরকূলে" গিয়ে পোঁছতে হয়।

কিন্তু অল্পমাত্রায় যা উপকারী, বেশী মাত্রায় তাতেই হিতে বিপরীত হ'তে পারে,—যথা হোমিওপ্যাথি ওষুধ। পরের মনে লাগানো কথা বল্‌ব না ব'লেই যে পরের মন-যোগানো কথা বল্‌তে হবে, তার কোন মানে নেই। কেউ কেউ ভদ্রতার সঙ্গে খোসামুদির তফাৎ করতে পারেন না ব'লে নিজের মানরক্ষার জন্য পরকে অপমান করা আবশ্যক এবং কর্ত্তব্য বোধ করেন। কিন্তু এ দু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে ব'লে ত আমার বিশ্বাস।—ভদ্রতার সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি, খোসামুদির দৃষ্টি কেবল নিজের প্রতি; ভদ্রতা নিজের অসুবিধা ক'রেও পরের সুবিধা ক'রে দিতে উৎসুক, খোসামুদি নিজের সুবিধাটুকুই বোঝে ও খোঁজে: ভদ্রতা চৌকোষ, সবল ও সুন্দর,—খোসামুদি একপেশে, কুটিল ও কুৎসিত। একটু সংসারজ্ঞানের চর্চ্চাই খোসামুদি এড়াবার প্রকৃষ্ট উপায়। যে

পৃথিবীতে এসেছি, সেটা কি রকম জায়গা জানতে না পারলে উন্নতিচেষ্টা করব কি ক'রে?—যেখানে শক্ত, সেইখানেই ভক্ত বা অতি ভক্ত!—যেখানে অক্ষমতা সেইখানেই পরমুখাপেক্ষিতা। ছোট ছেলে কি কম খোসামুদে? তবে তাদের সবই সুন্দর।

আর একটি জিনিস আছে, যা ভদ্রতার বেনামিতে চলে, অথচ বেশী পরিমাণে যা ক্ষতিকর:—সেটি হচ্ছে চক্ষুলজ্জা। এটি আমাদের দেশের ও জাতের একটি রোগবিশেষ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, এবং খুব কম লোকই সে রোগ হ'তে মুক্ত। মনে মনে আমার কোন একটি অনুরোধ রক্ষা করবার মোটেই ইচ্ছা নেই, এমন কি অভিপ্রায় নেই,—অথচ চক্ষুলজ্জায় পড়ে আমি অনুরোধকর্ত্তার সামনে বেশ একটু উৎসাহসহকারেই তার প্রস্তাবে সম্মত হলুম। এ স্থলে যদি বিরক্তভাবে কাজটা ক'রে দিই ত মন্দের ভাল; কিন্তু একবার একজনের জন্য করলেই ত অব্যাহতি পাওয়া যায় না, আর ক্রমাগত অনিচ্ছাসত্ত্বে ঢোঁক গিললেও নিজের হজমশক্তির উপর একটু অত্যাচার করা হয়! আবার যদি করব ব'লে না করি, তাহ'লে নিজের কথারও খেলাপী হয়, নিজের মনও খুঁৎখুঁৎ করে, আর অনর্থক পরের আশাভঙ্গও করা হয়। মতামত সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ভদ্রতার সঙ্গে একটু দৃঢ়তা মেশানোই উক্ত রোগের একমাত্র চিকিৎসা। অমায়িক অথচ আত্মপ্রতিষ্ঠ, লোকপ্রিয় অথচ সত্যনিষ্ঠ,—এমন সংমিশ্রণ এদেশে এত দুর্লভ কেন? কেন খাঁটি লোক যেন রুক্ষ হ'তেই বাধ্য, এবং শিষ্ট শান্ত ব্যক্তির উপর জুলুম হওয়াটাই নিয়ম?—তাও বলি যে, দাতা ও গ্রহীতা না হ'লে যেমন দান সম্পূর্ণ হয় না, তেমনি অনুরোধকারীও মাত্রা বুঝে পীড়াপীড়ি করলে তবেই ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব,—নইলে অযথা টান পড়লে ছিঁড়তে কতক্ষণ!

সংযম যেমন ভদ্রতার প্রধান নিবৃত্তিমূলক লক্ষণ, তেমনি সর্ব্বভূতে সমান দৃষ্টি বা মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা তার প্রধান প্রবৃত্তিমূলক লক্ষণ। অর্থ-সামর্থ্য, বিদ্যাবুদ্ধি, রূপগুণ, মানমর্য্যাদা যার যেমনই থাকুক না কেন, কম হ'লেও তাকে পায়ের তলায় ঠাসবার দরকার নেই, বেশী হ'লেও তার পায়ের তলায় পড়ে থাকবার দরকার নেই। যাকে ভাল লাগে তার সঙ্গে গলাগলিও ক'র না, যাকে মন্দ লাগে তাকে গালাগালিও দিও না, সকলের প্রতি সহজ সদয় ব্যবহার ক'র,—এই হচ্ছে ভদ্রতার বিধান। ভদ্রতা ব্যবহার-নীতি মাত্র, মনের নিয়ন্তা নয়। তবে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে, বাইরে যে ভাব দেখানো যায়, সেটা ক্রমে

মনের ভিতর পর্য্যন্ত সংক্রামিত হয় ; যেমন রাগের প্রকাশ দমন করতে করতে রাগ কমে আসা সম্ভব। পূর্ব্বে ভদ্রতাকে বাঁধ বলেছি ; আবশ্যক-স্থলে এই বাঁধই যে প্রাচীরের কাজ করতে পারে, তার আর আশ্চর্য্য কি?—যেখানে এই প্রাণের এই আড়ালটুকু রাখতে চাইনে, অর্থাৎ যেখানে প্রকাশই উদ্দেশ্য—সেখানে অবশ্য ভদ্রতার কাজ ফুরায় এবং উচ্চতর নেতার হাতে রাজদণ্ড দিয়ে সে স'রে পড়ে।

সেইজন্যই আত্মীয়তা যেখানে শুধু রক্ত নয়, অনুরক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ভদ্রতার ব্যবধান সেখানে অনাবশ্যক,—এমন কি অপ্রীতিকর। অতি দুঃখের বিষয়, নিকট এবং স্থায়ী সম্পর্ক স্থলেও যখন সব সময়ে আশানুরূপ মনের মিল থাকে না, তখন আত্মীয়ের মধ্যেও সাধারণতঃ ভদ্রতার নিয়ম উপেক্ষা না করাই ভাল। একসঙ্গে থাকতে গেলে অষ্টপ্রহর মেজাজে মেজাজে স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষ হয়ে যে উত্তাপ সঞ্চিত হয়, দৈনিক কর্ম্মজীবনযাত্রায় অনিবার্য্যভাবে যে ধূলিজাল উত্থিত হ'তে থাকে, ভদ্রতার স্নিগ্ধ শান্তিবারিসিঞ্চনই তা কথঞ্চিৎ নিবারণের অন্যতম উপায়। নিজ নিজ পারিবারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই অধিকাংশ লোক বুঝতে পারবেন যে, সময়মত একটু সহৃদয় ব্যবহার, অবস্থা বুঝে একটু সংযম, একটি মিষ্টি কথা, একটি হাসির আলোর অভাবে শেষে পরস্পরের মনে এমন দাগ দেগে যায় যে, হাজার চেষ্টাতেও তা মুছে ফেলা যায় না ; ভাঙ্গা জোড়া লাগলেও জোড়ের চিহ্ন চিরকাল থেকে যায়। হাঁড়ি কলসী একসঙ্গে থাকলেই ঠোকাঠুকি হয়, সে কথা সত্য ; কিন্তু একটু ঘন ক'রে প্রলেপ দিলে আওয়াজটা কম হয়, এবং টেকেও বেশীদিন! বাঙালীরাও পরিবারগতপ্রাণ। সেই পারিবারিক জীবনের উপর প্রায় তার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ নির্ভর করে। তাই সুখের সংসার গ'ড়ে তোলবার কোন উপচারই আমাদের অবহেলা করা উচিত নয়। বাইরে যতই মানসম্ভ্রম নামডাক থাকুক না কেন, বাড়ীর ভিতরে শান্তি না থাকলে কোন সংসারী লোকের মনই তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। বরং শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ গৃহে এসে বাইরের বিতণ্ডা ও বিরক্তি ভুলতে পারা যায়।

আত্মীয়তা-ক্ষেত্র এত জটিল ও গভীর, এত রকম বাধ্যবাধকতাপূর্ণ ও দেনাপাওনাজড়িত যে, সেখানে ভদ্রতার চেহারা ভাল ফোটানো যায় না, ও বেশী নীতির কাছঘেঁষা হয়ে পড়ে। ঘরের বাইরে অনাত্মীয় যে বিস্তৃত সমাজ প'ড়ে আছে, সেইখানেই ভদ্রতার যথার্থ রূপ ও কদর বোঝা যায়, সেইটেই তার প্রকৃত

কর্ম্মক্ষেত্র। কারণ, এই ভদ্রতা-সেতু পার হয়ে তবে ত ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতায় পৌঁছানো যায়—যদি কপালে থাকে!

ভদ্রতা বিস্তৃত নীতিরাজ্যের সামান্য একটি অংশমাত্র হ'লেও তার গৌরব ও প্রয়োজনীয়তা কিছু কম নয়। কথা ও কার্য্য—এই দুই ক্ষেত্রে তাকে বিভক্ত করা যেতে পারে, এবং দুইয়েরই বিধিনিষেধ আছে। সেগুলি এত লোকবিশ্রুত, বাপমায়ে এত ক'রে সেগুলি ছেলেদের মনে বসাবার চেষ্টা করেন যে, পুনরাবৃত্তি বাহুল্য। জানে শোনে সবাই সব, কিন্তু সব সময় কাজে পেরে ওঠে না, সেইটিই দুঃখের বিষয়। "পাঞ্চ্" নামক বিলাতী হাসির কাগজে মজার কথাগুলি প্রায়ই এই দুই শিরোনামাঙ্কিত থাকেঃ— এক, "Things that had better been left unsaid;" আর এক, "Things that ought to have been expressed otherwise" অর্থাৎ যা না বললে ভাল হ'ত, এবং যা অন্য রকমে বলা উচিত ছিল। ভদ্রতা সম্বন্ধে বাচনিক নিষেধ অধিকাংশ এই দুই শ্রেণীভুক্ত। এ বিষয়ে "সত্যং ব্রূয়াৎ" শ্লোকে যে লাখ কথার এক কথা বলা হয়েছে, তার উপর আর কিছু বলবার নেই। কার্য্যক্ষেত্রে ভদ্রতার এই রকম কোন মূলমন্ত্র আমাদের শাস্ত্রে আছে কিনা জানি না ; তবে ইংরাজিতে যাকে ব্যবহারের "Golden rule" (বা সোনার কাঠি!) বলে, সেটা এস্থলেও খাটে। ছেলেবেলায় তার যে অনুবাদ শুনে হাসি পেত, সেটি এইঃ—"নিজে ব্যবহৃত হ'তে চাহিবে যেমন, কর কর ব্যবহার অপরে তেমন!" এর ভাষা যেমনই হোক্, ভাব ঠিক আছে : এবং তার এই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ছোটখাটো বিষয়ে রীতিরক্ষা, এবং অন্যের যাতে সুবিধা, সাহায্য বা তুষ্টিসাধন হয়, তাই করাই ভদ্রতা ; ও তদ্বিপরীত করাই অভদ্রতা।

আমাদের রাজদরবার ছিল না ব'লে কিংবা যে কারণেই হোক— ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালাদেশে সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের একটু অভাব লক্ষিত হয়। উচ্চ নীচ সম্বন্ধ ব্যতীত সমকক্ষ মেলামেশার সকল অবয়ব যেন এখানে সম্পূর্ণ নয়। অপর জাতের সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেখা হ'লে সাধারণ অভিবাদনের কোন নির্দ্দিষ্ট রীতি ; আত্মীয়া ভিন্ন অপর স্ত্রীলোককে সম্বোধন করবার কোন শিষ্ট প্রথা নেই। কিংবা আগে থাকলেও, এখন লোপ পেয়েছে। অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এ সব বিষয়েও তেমনি, আমরা দায়ে প'ড়ে ইংরাজী সভ্যতার শরণাপন্ন হয়েছি। কিন্তু প্রত্যেক

খুঁটিনাটি বিষয়ে ইংরাজদের নকল করাটা—বিশেষতঃ সামাজিক ক্ষেত্রে, মোটেই শোভন বা বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য এতদূর এগিয়ে এসে হঠাৎ বেশী পিছিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। আমি একলা ঘরে ব'সে একটা মন-গড়া নিয়ম মানলেই ত যথেষ্ট হল না। দশ জনকে যদি সঙ্গে নিতে চাই ত, সাময়িক অবস্থা বুঝে যা রয় সয় এমন নিয়মই চালাবার চেষ্টা করতে হবে। যা' কালের অতল বিস্মৃতিসাগরে চিরবিলুপ্ত, তীরে ব'সে ব'সে তাকে পুনরুদ্ধার করবার বৃথা চেষ্টায় সময় নষ্ট না ক'রে—এখনো যেটুকু দেশীয়তা প্রচলিত আছে, সেটুকু যাতে নব্যভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত।

আত্মীয়তার বাইরেই ভদ্রতার পূর্ণ প্রকাশ ও প্রয়োজনীয়তা যেমন, তেমনি সেই বাইরের সমাজে, আবার কথোপকথনের ক্ষেত্রেই তার চরম বিকাশ লক্ষিত হয় ; কারণ, ক্ষণিক মেলামেশার সংকীর্ণ অবকাশে পরস্পরের জন্য হাতে কলমে বিশেষ কিছু করবার সুযোগ কমই পাওয়া যায়। স্ত্রীলোককে পুরুষমানুষে যে ছোটোখাটো সাহায্যগুলি করতে পারে ও করলে ভাল দেখায়, পুরুষসমাজে পরস্পরের মধ্যে তারও বিশেষ আবশ্যক হয় না,—অবশ্য বয়সের বেশী তফাৎ না থাকলে। কিন্তু সমবয়সী ও সমকক্ষ পুরুষসমাজের কথোপকথন স্থলেও আমাদের কতকগুলি জাতীয় দোষ প্রকাশ পায়, যা সংশোধন করতে পারলেই ভাল। মেয়েরাও সে-দোষবর্জিত নয়। প্রথমতঃ আমরা প্রায় সকলেই বেশী চেঁচিয়ে কথা কই ; দ্বিতীয়তঃ তর্কস্থলে আমরা অধিকাংশ লোকেই চটে গিয়ে কূটতর্ক, জিদ বা ব্যক্তিগত খোঁটার আশ্রয় নিই ; তৃতীয়তঃ আমরা অন্যের কথা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না ক'রে অধীরভাবে মাঝে বাধা দিয়ে কথা বলি (হিত অথচ মনোহারী বাক্যের চেয়ে কি মনোযোগী অথচ সমজদার শ্রোতা বেশী দুর্লভ নয়?)। চতুর্থতঃ আমরা নিজের উপস্থিত ইচ্ছামত কথা ব'লে যাই, শ্রোতা বুঝে কথার বিষয় এবং মাত্রা নির্দ্ধারণ করিনে। আমার শরীরের অসুখ বা আমার মনের ভাবনার বিস্তারিত বিবরণ যে সকলের রুচিকর না বোধ হ'তে পারে সে কথা ভুলে যাই, এবং অন্যকে কথা বলবার বা মতামত ব্যক্ত করবার অবসর দিইনে।

ফলে দাঁড়ায় এই যে, সকলে একসঙ্গে বলে, কিন্তু কেউ শুনে না!—কিংবা ইংরাজিতে যাকে বলে 'oneman-show' তাই হয়, অর্থাৎ একজন-মাত্র বক্তা, আর সকলে শ্রোতা। অথচ আসলে সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা বা

সমালোচনাই সামাজিক মেলামেশার প্রধান সুখ ও সার্থকতা। পঞ্চমতঃ আমরা জেনে শুনে এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করি যা উপস্থিত লোকের পক্ষে অপ্রীতিকর। অথবা এমন ক'রে কথা বলি যা'তে তাদের কারো মনে লাগতে পারে—ভাষায় যাকে বলে "ঠেস দিয়ে কথা বলা"।—দরকার কি? ভদ্রতা যদি নীতি না হয় ত ভদ্রসমাজও নীতি উপদেশ বা শাসনদণ্ডের স্থান নয়। বেশী শাসন করতে চাও সমাজ থেকে তাড়াও; কিন্তু যে যতক্ষণ সমাজে আছে তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার কর। অভদ্রতা না ক'রেও বোধ হয় একজনকে বোঝানো যায় যে তাকে আমার বড় পছন্দ নয়, এবং সময়ে সময়ে তা বোঝানো আবশ্যকও হয়ে পড়ে; কিন্তু এগুলি ভদ্রতার ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়ম নয়। আত্মীয়তার স্থলে ভালবাসার অভাব ভদ্রতায় পূর্ণ করা শক্ত বটে; কিন্তু অনাত্মীয়ক্ষেত্রে ভদ্রতা, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ক্ষণকালের জন্যও ভূষিত হওয়া ত সহজ ব'লেই বোধ হয়। পর যখন এত অল্পতেই সন্তুষ্ট হয়, তখন সেটুকু তার জন্য না করাটাই আশ্চর্য্য, করায় কিছু বাহাদুরী নেই। অর্থ বা মানের দম্ভে যাঁরা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন ও মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেন না, তাঁরা ভুলে যান যে, মানুষ নইলে মানুষের একদিনও চলে না এবং চিরদিন কারো সমান যায় না।

পরিশেষে আবার বলি যে ভদ্রতা সর্ব্বরোগের মহৌষধ না হ'লেও, এবং তার প্রসার বা গভীরতা বেশী না থাকলেও, তা ঘরে বাইরে অতি আবশ্যকীয় উপাদেয় জিনিস, এবং ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য,—শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। এক দিনের জন্যও যদি ভদ্রতা সমাজ থেকে ছুটি নেয়, তাহ'লে কি ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়, তা মনে করতেও কি হৃৎকম্প হয় না? এক হিসেবে ভদ্রসমাজের সকলেই যেন একটি পাৎলা বরফখণ্ডের উপর নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে,—পায়ের তলায় একটু ভাঙ্গলেই অতল জলে মজ্জমান হবার সম্ভাবনা;—কিন্তু ভাগ্যক্রমে সহজে ভাঙ্গে না। এই ধূলিম্লান পৃথিবীর রুক্ষতাকে মোলায়েম ক'রে এনে দৈনিক জীবনযাত্রার যা'তে একটু শ্রী সম্পাদন করতে পারি, সকলেরই কি সেই চেষ্টা করা উচিত নয়? যদি কেউ এর আনুষ্ঠানিক কর্ত্তব্য থেকে রেহাই পেতে পারে ত সে কেবল সেই সকল অসাধারণ লোক, যাঁরা এমন কোন বৃহৎ কাজ বা মহৎ চিন্তায় লিপ্ত আছেন যাতে সমাজের ছোটখাটো আদেশ পালন করবার সময় পাওয়া অসম্ভব এবং সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকতে হয়;—যাঁরা সংসারে থেকেও সংসার ও সমাজকে অতিক্রম করেছেন। শুধু ভদ্রতার দ্বারা বড় কাজ কিছু হবে না সত্য, কিন্তু

ছোট নিয়েই ত আমাদের অধিকাংশের অধিকাংশ জীবনের কারবার,—ছোট কাজ, ছোট কর্ত্তব্য, ছোট সুখ, ছোট দুঃখ। আমাদের বড় বড় ঋষিরাও ত প্রার্থনা করেছিলেন—"যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।" যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, তাহাই আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

—ইন্দিরা দেবী

আঁধারের রূপ

সুমুখে চাহিতেই খানিকটা দূরে অনেকখানি জল একসঙ্গে চোখের উপর ঝক্-ঝক্ করিয়া উঠিল। সে কোন একটা বিস্মৃত জমিদারের মস্ত কীর্ত্তি! দীঘিটা প্রায় আধক্রোশ দীর্ঘ। উত্তর দিক্‌টা মজিয়া বুজিয়া গিয়াছে, এবং তাহা ঘন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। গ্রামের বাহিরে বলিয়া গ্রামের মেয়েরা ইহার জল ব্যবহার করিতে পারিত না। কথায়-কথায় শুনিয়াছিলাম, এই দীঘিটি যে কত দিনের এবং কে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। একটা পুরানো ভাঙা ঘাট ছিল। তাহারই একান্তে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। এক সময়ে ইহারই চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; কবে নাকি ওলাউঠায় ও মহামারীতে উজাড় হইয়া গিয়া বর্ত্তমান স্থানে সরিয়া গিয়াছে। পরিত্যক্ত গৃহের বহু চিহ্ন চারি দিকে বিদ্যমান। অস্তগামী সূর্য্যের তির্য্যক্ রশ্মিচ্ছটা ধীরে-ধীরে নামিয়া আসিয়া দীঘির কালো জলে সোণা মাখাইয়া দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

তার পরে ক্রমশঃ সূর্য্য ডুবিয়া, দীঘির কালো জল আরো কালো হইয়া উঠিল; অদূরে বন হইতে বাহির হইয়া দুই-একটা পিপাসার্ত্ত শৃগাল

ভয়ে-ভয়ে জল পান করিয়া সরিয়া গেল। আমার যে উঠিবার সময় হইয়াছে, তাহা অনুভব করিয়াও উঠিতে পারিলাম না,—এই ভাঙা ঘাট যেন আমাকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল।

মনে হইল, এই যেখানে পা রাখিয়া বসিয়া আছি, সেইখানে পা দিয়া কত লোক কতবার আসিয়াছে, গিয়াছে। এই ঘাটেই তাহারা গান করিত, গা ধুইত, কাপড় কাচিত, জল তুলিত। এখন তাহারা কোথাকার কোন্ জলাশয়ে এই সমস্ত নিত্যকর্ম্ম সমাধা করে? এ গ্রাম যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহারা এমনি সময়ে এখানে আসিয়া বসিত; কত গান, কত গল্প করিয়া সারাদিনের শ্রান্তি দূর করিত। তার পরে অকস্মাৎ একদিন যখন মহাকাল মহামারীরূপে দেখা দিয়া সমস্ত গ্রাম ছিঁড়িয়া লইয়া গেলেন, তখন কত মুমূর্ষু হয়ত তৃষ্ণায় ছুটিয়া আসিয়া এই ঘাটের উপরেই শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। হয়ত তাহাদের তৃষ্ণার্ত্ত আত্মা আজিও এইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহা চোখে দেখি না, তাহাই যে নাই, এমন কথাই বা কে জোর করিয়া বলিবে? মনে হইতে লাগিল, জগতে প্রত্যক্ষ সত্য যদি কিছু থাকে, ত সে মরণ। এই জীবনব্যাপী ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের অবস্থাগুলো যেন আতসবাজী, বিচিত্র সাজসরঞ্জামের মত শুধু একটা কোন্ বিশেষ দিনে পুড়িয়া ছাই হইবার জন্যই এত যত্নে এত কৌশলে গড়িয়া উঠিতেছে। তবে মৃত্যুর পরপারের ইতিহাসটা যদি কোন উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তবে তার চেয়ে লাভ আর কি আছে? তা সে যেই বলুক এবং যেমন করিয়াই বলুক না! হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙিগয়া গেল। ফিরিয়া দেখিলাম, শুধু অন্ধকার—কেহ কোথাও নাই। একটা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

কতক্ষণ যে বসিয়া কাটাইয়াছি, এখন রাত্রি কত, ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না; বোধ হয় যেন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। কিন্তু এ কি! চলিয়াছি ত চলিয়াছি—সেই সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথ যে আর শেষ হয় না। এতগুলা তাঁবুর একটা আলোও যে চোখে পড়ে না। অনেকক্ষণ হইতে সম্মুখে একটা বাঁশঝাড় দৃষ্টিরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছিল; হঠাৎ মনে হইল, কৈ, এটা ত আসিবার সময় লক্ষ্য করি নাই। দিক্-ভুল করিয়া ত আর একদিকে চলি নাই? আরো খানিকটা অগ্রসর হইতেই টের পাইলাম, সেটা বাঁশঝাড় নয়, গোটাকয়েক তেঁতুলগাছ জড়াজড়ি করিয়া দিগন্ত আবৃত

করিয়া, অন্ধকার জমাট বাঁধাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তারই নীচে দিয়া পথটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। জায়গাটা এম্‌নি অন্ধকার যে, নিজের হাতটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুর্‌গুর্‌ করিয়া উঠিল—এ যাইতেছি কোথায়? চোখ-কাণ বুজিয়া কোনমতে সেই তেঁতুল-তলাটা পার হইয়া দেখি, সম্মুখে অনন্ত কালো আকাশ যতদূর দেখা যায়, ততদূর বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু সুমুখে ওই উঁচু জায়গাটা কি? নদীর ধারে সরকারী বাঁধ নয় ত? বাঁধই ত বটে। পা দুটা যেন ভাঙিয়া আসিতে লাগিল, তবুও টানিয়া-টানিয়া কোনমতে তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই। ঠিক নীচেই সেই মহাশ্মশান। আবার কাহার পদশব্দ সুমুখ দিয়াই নীচে শ্মশানে গিয়া মিলাইয়া গেল। এইবার টলিয়া-টলিয়া সেই ধূলা-বালুর উপরেই মূর্চ্ছিতের মত ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। আর আমার লেশমাত্র সংশয় রহিল না যে, কে আমাকে এক মহাশ্মশান হইতে আর এক মহাশ্মশানের পথ দেখাইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেই যাহার পদশব্দ শুনিয়া ভাঙা ঘাটের উপর গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার পদশব্দ এতক্ষণ পরে ওই সম্মুখে মিলাইল।

সমস্ত ঘটনারই হেতু দেখাইবার জিদ্‌টা মানুষের যে বয়সে থাকে, সেই বয়স আমার পার হইয়া গেছে। সুতরাং কেমন করিয়া যে এই সূচিভেদ্য অন্ধকার নিশীথে একাকী পথ চিনিয়া দীঘির ভাঙা ঘাট হইতে এই শ্মশানের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং কাহারই বা সে পদধ্বনি সেখানে আহ্বান-ইঙ্গিত করিয়া এইমাত্র সুমুখে মিলাইয়া গেল, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার মত বুদ্ধি আমার নাই—পাঠকের কাছে আমার এ দৈন্য স্বীকার করিতে এখন আর আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না। ঐ রহস্য আজও আমার কাছে তেম্‌নি আঁধারে আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রেতযোনি স্বীকার করাও এ স্বীকারোক্তির প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য্য নয়। কিন্তু যাক্‌ গে।

বলিতেছিলাম যে, সেই ধূলা-বালি-ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলাম, তখনই শুধু দু'টি লঘু পদধ্বনি শ্মশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে-ধীরে মিলাইল। মনে হইল, সে যেন স্পষ্ট করিয়া জানাইল—'ছি ছি! ও তুই কি করিলি? তোকে এতটা পথ যে, পথ দেখাইয়া আনিলাম, সে কি ওইখানে বসিয়া পড়িবার জন্য? আয়, আয়! একেবারে আমাদের

ভিতরে চলিয়া আয়। এমন অশুচি, অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের একান্তে বসিস্ না,—আমাদের সকলের মাঝখানে আসিয়া বোস্।' কথাগুলা কাণে শুনিয়াছিলাম কিংবা হৃদয় হইতে অনুভব করিয়াছিলাম—এ কথা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না। কিন্তু তবুও যে চেতনা রহিল, তাহার কারণ, চৈতন্যকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, সে এম্নি এক রকম করিয়া বজায় থাকে—একেবারে যায় না, এ আমি বেশ দেখিয়াছি। তাই দু'চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সে যেন এক তন্দ্রার চাহনি। সে ঘুমানও নয়, জাগাও নয়। তাহাতে নিদ্রিতের বিশ্রামও থাকে না, সজাগের উদ্যমও আসে না। ঐ এক রকম!

তথাপি এ কথাটা ভুলি নাই যে, অনেক রাত্রি হইয়াছে—আমাকে তাঁবুতে ফিরিতে হইবে, এবং সে জন্য একবার অন্ততঃ চেষ্টা করিতাম, কিন্তু মনে হইল সব বৃথা। এখানে আমি ইচ্ছা করিয়া আসি নাই—আসিবার কল্পনাও করি নাই। সুতরাং যে আমাকে এই দুর্গম পথে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কাজ আছে। সে আমাকে শুধু শুধু ফিরিতে দিবে না। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, নিজের ইচ্ছায় ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যে পথে যেমন করিয়াই জোর করিয়া বাহির হও না কেন, সব পথই গোলকধাঁধার মত ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সাবেক জায়গায় আনিয়া হাজির করে। সুতরং চঞ্চল হইয়া ছট্‌ফট্ করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়া কোন প্রকার গতির চেষ্টামাত্র না করিয়া যখন স্থির হইয়া রহিলাম, তখন অকস্মাৎ যে জিনিষটি চোখে পড়িয়া গেল, তাহার কথা আমি কোন দিনই বিস্মৃত হই নাই।

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত, জল-মাটী, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন এই আজ প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব-চরাচর মুখ বুজিয়া, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপর যেন সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এত বড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে। এই

যে আকাশ-বাতাস—স্বর্গ-মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার; সর্ব্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না,—যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না, তাহাই তত অন্ধকার। মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন; কখনও এ সকল কথা ভাবি নাই, কোন দিন এ পথে চলি নাই। তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশানপ্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোন দিন জানি নাই। তবে হয়ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এমনি অফুরন্ত সুন্দর রূপে আমার দু'চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে—হে আমার কালো! হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্ব্বদুঃখভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দু'টি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধতমসাবৃত নির্জ্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি। সহসা মনে হইল, তাই ত! তাঁহার এই নির্ব্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত হীন অন্তেবাসীর মত এই বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য? একেবারে ভিতরে—মাঝখানে গিয়া বসি না কেন?

নামিয়া গিয়া ঠিক মধ্যস্থলে একেবারে চাপিয়া বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ যে এখানে এই ভাবে স্থির হইয়া ছিলাম, তখন হুঁস ছিল না। হুঁস হইলে দেখিলাম, তেমন অন্ধকার আর নাই—আকাশের একপ্রান্ত যেন স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে; এবং তাহারই অদূরে শুকতারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। এক চাপা কথাবার্ত্তার কোলাহল কাণে গেল। ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দূরে শিমুল গাছের আড়ালে বাঁধের উপর দিয়া কাহারা যেন চলিয়া আসিতেছে; এবং তাহাদের দুই-চারিটা লণ্ঠনের আলোকও আশেপাশে ইতস্ততঃ দুলিতেছে।

পুনর্ব্বার বাঁধের উপর উঠিয়া সেই আলোকেই দেখিলাম, দুখানা গরুর গাড়ীর অগ্র-পশ্চাৎ জনকয়েক লোক এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বুঝিলাম, কাহারা এই পথে ষ্টেশনে যাইতেছে।

মাথায় সুবুদ্ধি আসিল যে, পথ ছাড়িয়া আমার দূরে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক ; কারণ, আগন্তুকের দল যত বুদ্ধিমান এবং সাহসীই হোক, হঠাৎ এই অন্ধকার রাত্রিতে এরূপ স্থানে আমাকে একাকী ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর কিছু না করুক, একটা যে বিষম হৈ-হৈ রৈ-রৈ চীৎকার তুলিয়া দিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।—ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বস্থানে দাঁড়াইলাম।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অভাগীর স্বর্গ

১

ঠাকুরদাস মুখুয্যের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাতদিনের জ্বরে মারা গেলেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধানের কারবারে অতিশয় সংগতিপন্ন। তাঁর চার ছেলে, তিন মেয়ে, ছেলে-মেয়েদের ছেলে-পুলে হইয়াছে, জামাইরা, প্রতিবেশীর দল, চাকর-বাকর—সে যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। সমস্ত গ্রামের লোক ধুমধামের শবযাত্রা ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে

মায়ের দুই পায়ে গাঢ় করিয়া আল্‌তা এবং মাথায় ঘন করিয়া সিন্দুর লেপিয়া দিল, বধূরা ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে শাশুড়ীর দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দিয়া আঁচল দিয়া তাঁহার শেষ পদধূলি মুছাইয়া লইল। পুষ্পে, পত্রে, গন্ধে, মাল্যে, কলরবে মনে হইল না এ কোন শোকের ব্যাপার—এ যেন বড় বাড়ীর গৃহিণী পঞ্চাশ বর্ষ পরে আর একবার নূতন করিয়া তাঁহার স্বামিগৃহে যাত্রা করিতেছেন। বৃদ্ধ মুখোপাধ্যায় শান্তমুখে তাঁহার চিরদিনের সঙ্গিনীকে শেষ বিদায় দিয়া অলক্ষ্যে দুফোঁটা চোখের জল মুছিয়া শোকার্ত্ত কন্যা ও বধূগণকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। প্রবল হরিধ্বনিতে প্রভাত আকাশ আলোড়িত করিয়া সমস্ত গ্রাম সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আর একটি প্রাণী একটু দূরে থাকিয়া এই দলের সঙ্গী হইল, সে কাঙালীর মা। সে তাহার কুটীর-প্রাঙ্গণের গোটা-কয়েক বেগুন তুলিয়া এই পথে হাটে চলিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আর নড়িতে পারিল না। রহিল তাহার হাটে যাওয়া, রহিল তাহার আঁচলে বেগুন বাঁধা—সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সকলের পিছনে শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রামের একান্তে গরুড় নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে পূর্ব্বাহ্লেই কাঠের ভার, চন্দনের টুক্‌রা, ঘৃত, মধু, ধূপ, ধুনা প্রভৃতি উপকরণ সঞ্চিত হইয়াছিল। কাঙালীর মা ছোটজাত, দুলের মেয়ে বলিয়া কাছে যাইতে সাহস পাইল না, তফাতে একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে দাঁড়াইয়া সমস্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎসুক আগ্রহে চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। প্রশস্ত ও পর্য্যাপ্ত চিতার 'পরে যখন শব স্থাপিত করা হইল তখন তাঁহার রাঙা পা দুখানি দেখিয়া তাহার দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া একবিন্দু আল্‌তা মুছাইয়া লইয়া মাথায় দেয়। বহু কণ্ঠের হরিধ্বনির সহিত পুত্রহস্তের মন্ত্রপূত অগ্নি যখন সংযোজিত হইল তখন তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিল, ভাগ্যিমানী মা, তুমি সগ্যে যাচ্ছো—আমাকেও আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও আমিও যেন এম্‌নি কাঙালীর হাতের আগুনটুকু পাই। ছেলের হাতের আগুন! সে ত সোজা কথা নয়! স্বামী, পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিনী, দাস, দাসী, পরিজন—সমস্ত সংসার উজ্জ্বল রাখিয়া এই যে স্বর্গারোহণ—দেখিয়া তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল—এ সৌভাগ্যের সে যেন আর ইয়ত্তা করিতে পারিল না। সদ্যঃপ্রজ্বলিত চিতার অজস্র ধুঁয়া নীল রঙের ছায়া ফেলিয়া

ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল, কাঙালীর মা ইহারই মধ্যে ছোট একখানি রথের চেহারা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। গায়ে তাহার কত না ছবি আঁকা, চূড়ায় তাহার কত না লতা-পাতা জড়ানো। ভিতরে কে যেন বসিয়া আছেন, মুখ তাঁহার চেনা যায় না, কিন্তু সিঁথায় তাঁহার সিঁদুরের রেখা, পদতল দুটি আল্‌তায় রাঙানো। ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া কাঙালীর মায়ের দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল, এমন সময়ে একটি বছর চোদ্দ-পনেরর ছেলে তাহার আঁচলে টান দিয়া কহিল, হেথায় তুই দাঁড়িয়ে আছিস্ মা, ভাত রাঁধবি নে?

মা চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, রাঁধবো'খন রে! হঠাৎ উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, দ্যাখ্ দ্যাখ্ বাবা—বামুনমা ওই রথে চড়ে সগ্যে যাচ্ছে!

ছেলে বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, কই? ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, তুই ক্ষেপেছিস্! ও ত ধুঁয়া! রাগ করিয়া কহিল, বেলা দুপুর বাজে, আমার ক্ষিদে পায় না বুঝি? এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখে জল লক্ষ্য করিয়া বলিল, বামুনদের গিন্নী মরেছে তুই কেন কেঁদে মরিস্ মা?

কাঙালীর মার এতক্ষণে হুঁস হইল। পরের জন্য শ্মশানে দাঁড়াইয়া এই ভাবে অশ্রুপাত করায় সে মনে মনে লজ্জা পাইল, এমন কি, ছেলের অকল্যাণের আশঙ্কায় মুহূর্ত্তে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাঁদব কিসের জন্যে রে—চোখে ধোঁ লেগেছে বই ত নয়!

হাঁঃ, ধোঁ লেগেছে বই ত না! তুই কাঁদ্‌তেছিলি!

মা আর প্রতিবাদ করিল না। ছেলের হাত ধরিয়া ঘাটে নামিয়া নিজেও স্নান করিল, কাঙালীকেও স্নান করাইয়া ঘরে ফিরিল—শ্মশান-সৎকারের শেষটুকু দেখা আর তার ভাগ্যে ঘটিল না।

২

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজের নামগুলাকেই

যেন আমরণ ভ্যাঙ্‌চাইয়া চলিতে থাকে। কাঙালীর মার জীবনের ইতিহাস ছোট, কিন্তু সেই ছোট্ট কাঙালীজীবনটুকু বিধাতার এই পরিহাসের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে জন্ম দিয়া মা মরিয়াছিল, বাপ রাগ করিয়া নাম দিল অভাগী। মা নাই, বাপ নদীতে মাছ ধরিয়া বেড়ায়, তাহার না আছে দিন, না আছে রাত। তবু যে কি করিয়া ক্ষুদ্র অভাগী একদিন কাঙালীর মা হইতে বাঁচিয়া রহিল সে এক বিস্ময়ের বস্তু। যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহার নাম রসিক বাঘ, বাঘের অন্য বাঘিনী ছিল, ইহাকে লইয়া সে গ্রামান্তরে উঠিয়া গেল, অভাগী তাহার অভাগ্য ও শিশুপুত্র কাঙালীকে লইয়া গ্রামেই পড়িয়া রহিল।

তাহার সেই কাঙালী বড় হইয়া আজ পনেরয় পা দিয়াছে। সবেমাত্র বেতের কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, অভাগীর আশা হইয়াছে আরও বছরখানেক তাহার অভাগ্যের সহিত যুঝিতে পারিলে দুঃখ ঘুচিবে। এই দুঃখ যে কি, যিনি দিয়াছেন তিনি ছাড়া আর কেহই জানে না।

কাঙালী পুকুর হইতে আঁচাইয়া আসিয়া দেখিল তাহার পাতের ভুক্তাবশেষ মা একটা মাটির পাত্রে ঢাকিয়া রাখিতেছে, আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই খেলি নে মা?

বেলা গড়িয়ে গেছে বাবা, এখন আর ক্ষিদে নেই।

ছেলে বিশ্বাস করিল না, বলিল, না, ক্ষিদে নেই বই কি! কই দেখি তোর হাঁড়ি?

এই ছলনায় বহুদিন কাঙালীর মা কাঙালীকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, সে হাঁড়ি দেখিয়া তবে ছাড়িল। তাহাতে আর একজনের মত ভাত ছিল। তখন সে প্রসন্নমুখে মায়ের কোলে গিয়া বসিল। এই বয়সের ছেলে সচরাচর এরূপ করে না, কিন্তু শিশুকাল হইতে বহুকাল যাবৎ সে রুগ্ন ছিল বলিয়া মায়ের ক্রোড় ছাড়িয়া বাহিরের সংগী সাথীদের সহিত মিশিবার সুযোগ পায় নাই। এইখানে বসিয়াই তাহাকে খেলা-ধুলার সাধ মিটাইতে হইয়াছে। এক হাতে গলা জড়াইয়া মুখের উপর মুখ রাখিয়াই কাঙালী চকিত হইয়া কহিল, মা, তোর গা যে গরম, কেন তুই অমন রোদে দাঁড়িয়ে মড়া পোড়ানো দেখতে গেলি? কেন আবার নেয়ে এলি? মড়া পোড়ানো কি তুই—

মা শশব্যস্তে ছেলের মুখে হাত চাপা দিয়া কহিল, ছি বাবা, মড়া পোড়ানো বল্‌তে নেই, পাপ হয়। সতীলক্ষ্মী মাঠাক্‌রুণ রথে ক'রে সগ্যে গেলেন।

ছেলে সন্দেহ করিয়া কহিল, তোর এক কথা মা। রথে চ'ড়ে কেউ নাকি আবার সগ্যে যায়?

মা বলিল, আমি যে চোখে দেখনু কাঙালী, বামুনমা রথের ওপরে ব'সে। তেনার রাঙা পা দুখানি যে সবাই চোখ মেলে দেখ্‌লে রে!

সবাই দেখ্‌লে?

সব্বাই দেখ্‌লে!

কাঙালী মায়ের বুকে ঠেস দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মাকে বিশ্বাস করাই তাহার অভ্যাস, বিশ্বাস করিতেই সে শিশুকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছে, সেই মা যখন বলিতেছে সবাই চোখ মেলিয়া এতবড় ব্যাপার দেখিয়াছে, তখন অবিশ্বাস করিবার আর কিছু নাই। খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিল, তা হ'লে তুইও ত মা সগ্যে যাবি? বিন্দির মা সেদিন রাখালের পিসিকে বল্‌তেছিল ক্যাঙ্‌লার মা'র মত সতীলক্ষ্মী আর দুলেপাড়ায় কেউ নেই।

কাঙালীর মা চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ছেলে হাত দিয়া মুছাইয়া দিয়া বলিল, ক্যাঁতাটা পেতে দেব মা, শুবি?

মা চুপ করিয়া রহিল। কাঙালী মাদুর পাতিল, কাঁথা পাতিল, মাচার উপর হইতে বালিশটী পাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে বিছানায় টানিয়া লইয়া যাইতে, মা কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই।

কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভাল লাগিল, কিন্তু কহিল, জলপানির পয়সা দুটো ত তা হ'লে দেবে না মা!

না দিক্ গে—আয় তোকে রূপকথা বলি।

আর প্রলুব্ধ করিতে হইল না, কাঙালী তৎক্ষণাৎ মায়ের বুক ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িয়া কহিল, বল্ তা হ'লে। রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর আর সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া—

অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এ সকল তাহার পরের কাছে কত দিনের শোনা এবং

কত দিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত্ত-কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র—সে এমন উপকথা সুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয়—নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণ রক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল, ততই সে যেন নব নব উপকথার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—কাঙালীর স্বল্প দেহ বার বার রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।

বাহিরে বেলা শেষ হইল, সূর্য্য অস্ত গেল, সন্ধ্যার ম্লান ছায়া গাঢ়তর হইয়া চরাচর ব্যাপ্ত করিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে আজ আর দীপ জ্বলিল না, গৃহস্থের শেষ কর্ত্তব্য সমাধা করিতে কেহ উঠিল না, নিবিড় অন্ধকারে কেবল রুগ্ন মাতার অবাধ গুঞ্জন নিস্তব্ধ পুত্রের কর্ণে সুধা বর্ষণ করিয়া চলিতে লাগিল। সে সেই শ্মশান ও শ্মশানযাত্রার কাহিনী। সেই রথ, সেই রাঙা পা দুটি, সেই তাঁর স্বর্গে যাওয়া। কেমন করিয়া শোকার্ত্ত স্বামী শেষ পদধূলি দিয়া কাঁদিয়া বিদায় দিলেন, কি করিয়া হরিধ্বনি দিয়া ছেলেরা মাতাকে বহন করিয়া লইয়া গেল, তারপরে সন্তানের হাতের আগুন! সে আগুন ত আগুন নয় কাঙালী, সেই ত হরি! তার আকাশজোড়া ধুঁয়ো ত ধুঁয়ো নয় বাবা, সেই ত সগ্যের রথ! কাঙালীচরণ, বাবা আমার!

কেন মা?

তোর হাতের আগুন যদি পাই বাবা, বামুনমার মত আমিও সগ্যে যেতে পাবো।

কাঙালী অস্ফুটে শুধু কহিল, যাঃ—বল্‌তে নেই।

মা সে কথা বোধ করি শুনিতেও পাইল না, তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, ছোটজাত ব'লে তখন কিন্তু কেউ ঘেন্না ক'রতে পারবে না—দুঃখী ব'লে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ইস্‌! ছেলের হাতের আগুন—রথকে যে আসতেই হবে।

ছেলে মুখের উপর মুখ রাখিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, বলিস্‌ নে মা, বলিস্‌ নে, আমার বড্ড ভয় করে।

মা কহিল, আর দেখ্‌ কাঙালী, তোর বাবাকে একবার ধ'রে আন্‌বি, অম্‌নি যেন পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে আমাকে বিদায় দেন। অম্‌নি পায়ে আল্‌তা,

মাথায় সিঁদুর দিয়ে—কিন্তু কে বা দেবে? তুই দিবি, না রে কাঙালী? তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে, তুই আমার সব! বলিতে বলিতে সে ছেলেকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিল।

৩

অভাগীর জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইতে চলিল। বিস্তৃতি বেশি নয়, সামান্যই। বোধ করি ত্রিশটা বৎসর আজও পার হইয়াছে কি হয় নাই, শেষও হইল তেম্‌নি সামান্যভাবে। গ্রামে কবিরাজ ছিল না, ভিন্ন গ্রামে তাঁহার বাস। কাঙালী গিয়া কাঁদা-কাটি করিল, হাতে-পায়ে পড়িল, শেষে ঘটি বাঁধা দিয়া তাঁহাকে একটাকা প্রণামী দিল। তিনি আসিলেন না, গোটা-চারেক বড়ি দিলেন। তাহার কত কি আয়োজন: খল, মধু, আদার সত্ত্ব, তুলসীপাতার রস—কাঙালীর মা ছেলের উপর রাগ করিয়া বলিল, কেন তুই আমাকে না ব'লে ঘটি বাঁধা দিতে গেলি, বাবা! হাত পাতিয়া বড়ি কয়টি গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া উনানে ফেলিয়া দিয়া কহিল, ভাল হই ত এতেই হব, বাগ্‌দী-দুলের ঘরে কেউ কখনো ওষুধ খেয়ে বাঁচে না!

দিন দুই-তিন এম্‌নি গেল। প্রতিবেশীরা খবর পাইয়া দেখিতে আসিল, যে যাহা মুষ্টি-যোগ জানিত, হরিণের শিঙ্‌ ঘষা জল, গেটে-কড়ি পুড়াইয়া মধুতে মাড়িয়া চাটাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অব্যর্থ ঔষধের সন্ধান দিয়া যে যাহার কাজে গেল। ছেলেমানুষ কাঙালী ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে, মা তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, কোব্‌রেজের বড়িতে কিছু হ'ল না বাবা, আর ওদের ওষুধে কাজ হ'বে? আমি এম্‌নিই ভাল হ'ব।

কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, তুই বড়ি ত খেলি নে মা, উনুনে ফেলে দিলি। এম্‌নি কি কেউ সারে?

আমি এম্‌নি সেরে যাবো। তার চেয়ে তুই দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে নিয়ে খা দিকি, আমি চেয়ে দেখি।

কাঙালী এই প্রথম অপটু হস্তে ভাত রাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। না পারিল ফেন ঝাড়িতে, না পারিল ভাল করিয়া ভাত বাড়িতে। উনান তাহার জ্বলে না—ভিতরের জল পড়িয়া ধুঁয়া হয়; ভাত ঢালিতে চারিদিকে

ছড়াইয়া পড়ে ; মায়ের চোখ্ ছল ছল করিয়া আসিল। নিজে একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা সোজা করিতে পারিল না, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। খাওয়া হইয়া গেলে ছেলেকে কাছে লইয়া কি করিয়া কি করিতে হয় বিধিমতে উপদেশ দিতে গিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠ থামিয়া গেল, চোখ দিয়া কেবল অবিরলধারে জল পড়িতে লাগিল।

গ্রামের ঈশ্বর নাপিত নাড়ী দেখিতে জানিত, পরদিন সকালে সে হাত দেখিয়া তাহারই সুমুখে মুখ গম্ভীর করিল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল এবং শেষে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া গেল। কাঙালীর মা ইহার অর্থ বুঝিল, কিন্তু তাহার ভয়ই হইল না! সকলে চলিয়া গেলে সে ছেলেকে কহিল, এইবার একবার তাকে ডেকে আন্তে পারিস্ বাবা?

কাকে মা?

ওই যে রে—ও গাঁয়ে যে উঠে গেছে--

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে?

অভাগী চুপ করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আস্বে কেন মা?

অভাগীর নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তথাপি আস্তে আস্তে কহিল, গিয়ে বল্বি, মা শুধু একটু তোমার পায়ের ধুলো চায়।

সে তখনি যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, একটু কাঁদা-কাটা করিস্ বাবা, বলিস্, মা যাচ্ছে।

একটু থামিয়া কহিল, ফের্বার পথে অম্নি নাপ্তে বৌদির কাছ থেকে একটু আল্তা চেয়ে আনিস্ ক্যাঙালী, আমার নাম করলেই সে দেবে। আমাকে বড় ভালবাসে।

ভাল তাহাকে অনেকেই বাসিত। জ্বর হওয়া অবধি মায়ের মুখে সে এই কয়টা জিনিষের কথা এতবার এতরকম করিয়া শুনিয়াছে যে সে সেইখান হইতেই কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রা করিল।

৪

পরদিন রসিক দুলে সময়মত যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অভাগীর আর বড় জ্ঞান নাই। মুখের পরে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, চোখের দৃষ্টি

এ সংসারের কাজ সারিয়া কোথায় কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে। কাঙালী কাঁদিয়া কহিল, মাগো! বাবা এসেছে—পায়ের ধুলো নেবে যে!

মা হয়ত বুঝিল, হয়ত বুঝিল না, হয়ত বা তাহার গভীর সঞ্চিত বাসনা সংস্কারের মত তাহার আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। এই মৃত্যুপথ-যাত্রী তাহার অবশ বাহুখানি শয্যার বাহিরে বাড়াইয়া দিয়া হাত পাতিল।

রসিক হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পৃথিবীতে তাহারও পায়ের ধুলার প্রয়োজন আছে, ইহাও কেহ নাকি চাহিতে পারে তাহা তাহার কল্পনার অতীত। বিন্দির পিসি দাঁড়াইয়া ছিল, সে কহিল, দাও বাবা, দাও একটু পায়ের ধুলো।

রসিক অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনে যে স্ত্রীকে সে ভালবাসা দেয় নাই, অশনবসন দেয় নাই, কোন খোঁজ খবর করে নাই, মরণকালে তাহাকে সে শুধু একটু পায়ের ধুলা দিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রাখালের মা বলিল, এমন সতীলক্ষ্মী বামুন কায়েতের ঘরে না জন্মে' ও আমাদের দুলের ঘরে জন্মালো কেন! এইবার ওর একটু গতি ক'রে দাও বাবা—ক্যাঙলার হাতের আগুনের লোভে ও যেন প্রাণটা দিলে।

অভাগীর অভাগ্যের দেবতা অগোচরে বসিয়া কি ভাবিলেন জানি না, কিন্তু ছেলেমানুষ কাঙালীর বুকে গিয়া এ কথা যেন তীরের মত বিঁধিল।

সেদিন দিনের-বেলাটা কাটিল, প্রথম রাত্রিটাও কাটিল, কিন্তু প্রভাতের জন্য কাঙালীর মা আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। কি জানি, এত ছোটজাতের জন্যও স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়—কিন্তু এটা বুঝা গেল রাত্রি শেষ না হইতেই এ দুনিয়া সে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

কুটীর-প্রাঙ্গণে একটা বেল গাছ ছিল, একটা কুড়ুল চাহিয়া আনিয়া রসিক তাহাতে ঘা দিয়াছে কি দেয় নাই, জমিদারের দরওয়ান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে সশব্দে একটা চড় কসাইয়া দিল ; কুড়ুল কাড়িয়া লইয়া কহিল, শালা, একি তোর বাপের গাছ আছে যে কাট্‌তে লেগেছিস্?

রসিক গালে হাত বুলাইতে লাগিল, কাঙালী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, বাঃ, এ যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ দরওয়ানজী। বাবাকে খামোকা তুমি মারলে কেন?

হিন্দুস্থানী দরওয়ান তাহাকেও একটা অশ্রাব্য গালি দিয়া মারিতে গেল, কিন্তু সে নাকি তাহার জননীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া বসিয়া ছিল, তাই অশৌচের ভয়ে তাহার গায়ে হাত দিল না। হাঁকা-হাঁকিতে একটা ভিড় জমিয়া উঠিল, কেহই অস্বীকার করিল না যে বিনা অনুমতিতে রসিকের গাছ কাটিতে যাওয়াটা ভাল হয় নাই, তাহারাই আবার দরওয়ানজীর হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেন একটা হুকুম দেন। কারণ, অসুখের সময় যে কেহ দেখিতে আসিয়াছে কাঙালীর মা তাহারই হাতে ধরিয়া তাহার শেষ অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে।

দরওয়ান ভুলিবার পাত্র নহে, সে হাতমুখ নাড়িয়া জানাইল, এ সকল চালাকি তাহার কাছে খাটিবে না।

জমিদার স্থানীয় লোক নহেন; গ্রামে তাঁহার একটা কাছারি আছে, গোমস্তা অধর রায় তাহার কর্ত্তা। লোকগুলা যখন হিন্দুস্থানীটার কাছে ব্যর্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, কাঙালী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একেবারে কাছারি বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকের মুখে মুখে শুনিয়াছিল, পিয়াদারা ঘুষ লয়, তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল অতবড় অসংগত অত্যাচারের কথা যদি কর্ত্তার গোচর করিতে পারে ত ইহার প্রতিবিধান না হইয়াই পারে না। হায় রে অনভিজ্ঞ! বাঙলা দেশের জমিদার ও তাহার কর্ম্মচারীকে সে চিনিত না। সদ্যোমাতৃহীন বালক শোকে ও উত্তেজনায় উদ্ভ্রান্ত হইয়া একেবারে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল, অধর রায় সেইমাত্র সন্ধ্যাহ্নিক ও যৎসামান্য জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়াছিলেন, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কে রে?

আমি কাঙালী। দরওয়ানজী আমার বাবাকে মেরেছে।

বেশ করেচে। হারামজাদা খাজনা দেয় নি বুঝি?

কাঙালী কহিল, না বাবুমশায়, বাবা গাছ কাটতেছিল—আমার মা মরেচে—, বলিতে বলিতে সে কান্না আর চাপিতে পারিল না।

সকাল-বেলা এই কান্না-কাটিতে অধর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। ছোঁড়াটা মড়া ছুঁইয়া আসিয়াছে, কি জানি এখানকার কিছু ছুঁইয়া ফেলিল না কি! ধমক দিয়া বলিলেন, মা মরেচে ত যা নীচে নেবে দাঁড়া। ওরে কে আছিস্ রে, এখানে একটু গোবরজল ছড়িয়ে দে! কি জাতের ছেলে তুই?

কাঙালী সভয়ে প্রাঙ্গণে নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমরা দুলে।

অধর কহিলেন, দুলে! দুলের মড়ায় কাঠ কি হবে শুনি?

কাঙালী বলিল, মা যে আমাকে আগুন দিতে ব'লে গেছে! তুমি জিজ্ঞেস কর না বাবুমশায়, মা যে সবাইকে ব'লে গেছে, সক্কলে শুনেছে যে। মায়ের কথা বলিতে গিয়া তাহার অনুক্ষণের সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ মুহূর্ত্তে স্মরণ হওয়ায় কণ্ঠ যেন তাহার কান্নায় ফাটিয়া পড়িতে চাহিল।

অধর কহিলেন, মাকে পোড়াবি ত গাছের দাম পাঁচটা টাকা আন্ গে। পারবি?

কাঙালী জানিত তাহা অসম্ভব। তাহার উত্তরীয় কিনিবার মূল্যের জন্য তাহার ভাত খাইবার পিতলের কাঁসিটি বিন্দির পিসি একটি টাকায় বাঁধা দিতে গিয়াছে সে চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, সে ঘাড় নাড়িল, বলিল, না।

অধর মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া কহিলেন, না ত মাকে নিয়ে নদীর চড়ায় পুঁতে ফেল গে যা। কার বাবার গাছে তোর বাপ কুড়ুল ঠেকাতে যায়—পাজি, হতভাগা, নচ্ছার!

কাঙালী বলিল, সে যে আমাদের উঠানের গাছ, বাবুমশায়! সে যে আমার মায়ের হাতে-পোঁতা গাছ!

হাতে-পোঁতা গাছ! পাঁড়ে, ব্যাটাকে গলাধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দে ত!

পাঁড়ে আসিয়া গলাধাক্কা দিল এবং এমন কথা উচ্চারণ করিল যাহা কেবল জমিদারের কর্ম্মচারীরাই পারে।

কাঙালী ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কেন সে যে মার খাইল, কি তাহার অপরাধ, ছেলেটা ভাবিয়াই পাইল না।

গোমস্তার নির্ব্বিকার চিত্তে দাগ পর্য্যন্ত পড়িল না। পড়িলে এ চাকরি তাহার জুটিত না। কহিলেন, পরেশ, দেখ ত হে, এ ব্যাটার খাজনা বাকী পড়েছে কিনা। থাকে ত জাল-টাল কিছু একটা কেড়ে এনে যেন রেখে দেয়—হারামজাদা পালাতে পারে।

মুখুয্যেবাড়ীতে শ্রাদ্ধের দিন—মাঝে কেবল একটা দিন মাত্র বাকী। সমারোহের আয়োজন গৃহিণীর উপযুক্ত করিয়াই হইতেছে। বৃদ্ধ ঠাকুরদাস

নিজে তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, কাঙালী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, ঠাকুরমশাই, আমার মা ম'রে গেছে।

তুই কে? কি চাস্ তুই?

আমি কাঙালী। মা ব'লে গেছে তেনাকে আগুন দিতে।

তা দিগে' না।

কাছারির ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল, একজন কহিল, ও বোধ হয় একটা গাছ চায়। এই বলিয়া সে ঘটনাটা প্রকাশ করিয়া কহিল।

মুখুয্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, শোন আব্দার। আমারই কত কাঠের দরকার—কাল বাদে পরশু কাজ। যা যা, এখানে কিছু হবে না—এখানে কিছু হবে না। এই বলিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদূরে বসিয়া ফর্দ্দ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে—যা, মুখে একটু নুড়ো জেবলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দিগে'।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলে ব্যস্তসমস্ত ভাবে এই পথে কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি কান খাড়া করিয়া একটু শুনিয়া কহিলেন, দেখ্‌ছেন ভটচাযমশায়, সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হ'তে চায়। বলিয়া কাজের ঝোঁকে আর কোথায় চলিয়া গেলেন।

কাঙালী আর প্রার্থনা করিল না। এই ঘণ্টা-দুয়েকের অভিজ্ঞতায় সংসারে সে যেন একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাহার মরা মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

নদীর চরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ানো হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালিয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখে স্পর্শ করাইয়া ফেলিয়া দিল। তারপরে সকলে মিলিয়া মাটি চাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।

সবাই সকল কাজে ব্যস্ত—শুধু সেই পোড়া খড়ের আঁটি হইতে যে স্বল্প ধুঁয়াটুকু ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতেছিল তাহারই প্রতি পলকহীন চক্ষু পাতিয়া কাঙালী ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টিতে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুতে বঙ্গজননী অকালে একজন মনস্বী, কৃতী ও প্রতিভাবান্ সন্তান হারাইয়াছেন। তিনি আপনাকে দেশের কল্যাণে নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত চিন্তা ও সাধনার মধ্যে শুধু একটি সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল—জন্মভূমি ও মাতৃভাষার কল্যাণ। তিনি যে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আত্মপ্রসাদ ও জননীর আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আর কোনই পুরস্কার ছিল না। তিনি যে আত্মত্যাগ-রূপ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা সেই প্রাচীন কালের নিষ্ঠাসম্পন্ন, বেদবিদ্যাভূয়িষ্ঠ, যজ্ঞ-পরায়ণ ব্রাহ্মণগণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

দেশবিশ্রুতকীর্ত্তি রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের চিন্তা-জগতের প্রায় সর্ব্ব-বিভাগেই তাঁহার মুদ্রাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যে তাঁহার স্থান কত উচ্চে, তাহা বলিবার সময় আসে নাই। তাঁহার 'কর্ম্মকথা', 'চরিতকথা', 'প্রকৃতি', ও 'জিজ্ঞাসা' কাল-সমুদ্রের কতগুলি লহরী-লীলায় কমলে-কামিনীর ন্যায় রূপ বিকাশ করিবে, তাহা গণনা করা অসাধ্য। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, রামেন্দ্রবাবুর মনীষা ইহাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। তিনি যে মহতী প্রতিভার প্রেরণা জীবনে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা তিনি জ্ঞান ও কর্ম্মের নানা বিভাগে সংক্রামিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এক দিকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ও রমেশচন্দ্র সারস্বত-ভবনের পরিকল্পনা যেমন তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, তেমনই বঙ্গসাহিত্যের আধুনিক উন্নতির ধারা তাঁহারই গৌরববাণী প্রচার করিতেছে।

মহাপুরুষেরা সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কালের উপর যে প্রভাব রাখিয়া যান, তাহার দ্বারাই তাঁহাদের মহত্ত্ব পরিমিত হইয়া থাকে। সে প্রভাব আমাদের সাধারণ দৃষ্টির মাপকাঠিতে পরিমিত হইতে পারে না ; কারণ, এরূপ আধ্যাত্মিক প্রভাবের অন্তঃপ্রবাহ লোকচক্ষুর অন্তরালে অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে ক্রিয়া করিতে থাকে, এবং তাহার ফলে সমগ্র দেশ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে ক্রমশঃ বাহিত হয়। রাশীকৃত গ্রন্থ-প্রণয়ন অপেক্ষাও এইরূপ

প্রভাব বিস্তার করিতে পারা মহত্তর কার্য্য এবং এইরূপ মহত্তর কার্য্যই রামেন্দ্রবাবুর প্রতিভার দ্যোতক। সাহিত্য-পরিষৎ ও -সম্মিলনের মধ্য দিয়া সাহিত্যের যে একটা বিরাট্ জাগরণের সূত্রপাত বাঙ্গালীর জীবনে অধুনা দেখা যাইতেছে, তাহার প্রযোজকদিগের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অন্যতম। এই যে মাতৃভাষার মরা গাঙ্গে বান আসিয়াছে, ইহার গতি রোধ করা আর কাহারও সাধ্য নহে। বিস্তৃত, অনাদৃত মাতৃভাষার স্থির সলিলে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া জাতীয় জীবনকে প্রবুদ্ধ, সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ভবিষ্যতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগের যে অধ্যায়টি লিখিত হইবে, তাহাতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

বঙ্গবাসীর অন্তর-রাজ্যের উপর রামেন্দ্রবাবুর যে প্রভাব, সে প্রভাব বড়ই পবিত্র ও শুভপ্রদ। প্রতিভা অনেক প্রকারের থাকে; দুরতিক্রম বাধাসমূহ অতিক্রম করিয়া কার্য্যকরী হওয়াই প্রতিভার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু সেই প্রতিভার সঙ্গে যদি বিশ্বজনীন প্রেম, নিরভিমান নিঃস্বার্থতা ও পূত চরিত্রের মহিমা বর্ত্তমান থাকে, তবে তাহা পুষ্পবৃষ্টিরই মত বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আবির্ভূত হয়। এটিলা বা তৈমুরলঙ্গেরও যে প্রতিভা ছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সে লোকক্ষয়করী এবং দেশ-ধ্বংসকরী প্রতিভা দেবতার অভিসম্পাত-স্বরূপ দেখা গিয়াছিল। তাহা কোনও স্থায়ী প্রভাবই রাখিয়া যাইতে পারে নাই। আর যাঁহারা নিভৃত নিরালা প্রদেশে বসিয়া অন্যের অজ্ঞাতে লোকের হিত-চিন্তা করিতেছেন, জীবন-মৃত্যুর রহস্য ভেদ করিয়া মানবের কল্যাণ-সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রভাব কালের অগণিত সোপান-রাজি বাহিয়া অবিনশ্বরতার দিকে চলিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রভাব সেই শ্রেণীর প্রভাব ছিল। তাঁহার মধ্যে কুটিলতার সংস্পর্শ ছিল না, ছলকলার লেশমাত্র ছিল না এবং স্বার্থের প্রচ্ছন্ন লীলামাত্র ছিল না, এই জন্যই তাঁহার মহত্ত্ব আমাদের অন্তর-রাজ্য জুড়িয়া বসিয়াছে।

মহত্ত্ব যেখানে থাকে, সেখানে তাহার অভিমানও বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষণের অপেক্ষা বিদ্যুদ্বিকাশই অনেকস্থলে বেশী। মহত্ত্বের এই ভেরী-নিনাদের কোলাহলে অনেক সময়ে প্রকৃত মহত্ত্ব চাপা পড়িয়া যায়। রামেন্দ্রবাবুর মহত্ত্ব এ প্রকৃতির ছিল না। এখানে ভেরী-নিনাদ ত ছিলই না,

বরং অপরের ভেরী-নাদও তাঁহার নিকট লজ্জা পাইয়া স্তব্ধ হইয়া যাইত। শিশুর ন্যায় সরল, শিশুর ন্যায় পবিত্র, সদাশুভ্র হাস্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল— এই সকলই তাঁহার শিরে দেবত্বের মুকুট পরাইয়া দিত। তাঁহার হাসিতে সমস্ত হৃদয় উন্মুক্ত হইয়া পড়িত, কোথাও এতটুকু মলিনতা বা প্রচ্ছন্নতা থাকিতে পারিত না। তাঁহাকে শুধু হাসিতেই দেখিয়াছি। এই সদা-হাস্যময় ভাবটি ছিল তাঁহার আধ্যাত্মিক পবিত্রতার বহির্লক্ষণ।

প্রতিভার সহিত পূত চরিত্রের, কর্ম্মনিষ্ঠার সহিত অবারিত আনন্দের অবাধ শুভ সম্মিলনে রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। ইহাই আমাদের সর্ব্বকালের আদর্শ। আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও দেবত্বে ভেদবুদ্ধি রাখি না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।।

সেই বিভূতি—শ্রীভগবানের বিভূতি—রামেন্দ্রসুন্দরের লোকবিলক্ষণ চরিত্রে আমরা দেখিতে পাইয়াছি।

রামেন্দ্রবাবুর স্বদেশভক্তির কথা উল্লেখ করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি শিক্ষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়াই দেশের উন্নতি কামনা করিতেন। রাজনীতিক আন্দোলনের দ্বারা দেশের উন্নতি হইতে পারে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা দেশের আর্থিক সচ্ছলতা হইতে পারে—কিন্তু সমস্ত উন্নতির সারভূত, দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ জ্ঞান ও চরিত্র সমস্ত মঙ্গলের আকর, ইহাই তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং ঐকান্তিক যত্ন ও সাধনার দ্বারা তিনি সেই দিকে উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলেজের অগণিত ছাত্র ও অধ্যাপকের নেতৃস্বরূপে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সেবক-রূপে তিনি দেশের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি করিতেই আজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদকল্পে তিনি যে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রীতির পরিচায়ক। আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"বাংলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ, কাশী পার হয়ে,

মা পূর্ব্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হ'লেন, শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশ্‌লেন, তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন ; বাংলার লক্ষ্মী বাংলা দেশ জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগ্‌লেন। ফলে-ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্‌ল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগ্‌ল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগ্‌ল।"

তাহার পরেই দুর্দ্দিন আসিল ; সেই দুর্দ্দিনের মধ্যে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল। তাই রামেন্দ্রবাবু আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের জন্য 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করিলেন, এবং তাঁহাদের মুখ দিয়া বলাইলেন,—

"মা লক্ষ্মী, কৃপা কর, কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না। ঘরের থাকতে পরের নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক, মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক ; বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।"

'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' স্বদেশপ্রেম ও ভাষার সরল মিষ্টতা-হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়! রামেন্দ্রবাবুর অনুকরণ করিয়া আমরাও বলি—বঙ্গলক্ষ্মীর প্রিয় সন্তানের স্মৃতির উপর ফুলচন্দন বর্ষিত হউক।

—খগেন্দ্রনাথ মিত্র

অব্যক্ত জীবন

শ্বাসযন্ত্র ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ালোপ, দেহের শীতলতা, সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে প্রাণীদিগকে মৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা এই সকল স্থূল লক্ষণের উল্লেখ না করিয়া বলিবেন, সজীব প্রাণী বাহিরের বিবিধ

পদার্থ নানা উপায়ে অবিরাম দেহস্থ করিয়া এবং দেহের নানা আবর্জনা বাহিরে ছাড়িয়া, যে আদান-প্রদান চালায়, তাহাই জীবনের প্রধান লক্ষণ এবং ইহারই অভাব মৃত্যু। আরো সূক্ষ্ম লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে, তখন ইঁহারা শক্তির কথা আনিয়া ফেলেন। প্রাণিগণ খাদ্য হইতেই তাহাদের শক্তি আহরণ করে। যে শক্তি খাদ্যে অব্যক্ত ছিল, দেহযন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া তাহাই তাপ, গতি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি নানা শক্তিতে মূর্ত্তিমান্ হইয়া পড়ে। অব্যক্ত শক্তিকে এই প্রকারে ব্যক্ত করাকেই শারীরতত্ত্ববিদ্গণ জীবনের লক্ষণ বলিবেন, এবং তাহারই অভাবকে মৃত্যু বলিয়া প্রচার করিবেন।

জীবন-মৃত্যুর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণগুলির সাহায্যে প্রাণিদেহ পরীক্ষা করিলে মোটামুটি কাজ চলিয়া যায় বটে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিতে গেলে, ঐগুলিই সময়ে সময়ে নানা ভ্রমের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অল্পদিন হইল স্পেনের কোন শহরে একটি বালিকার মৃত্যু হয়। দেহে মৃত্যুর স্থূল লক্ষণ-গুলিকে দেখিতে পাইয়া ডাক্তার মৃত দেহটিকে শবাধারে পুরিবার আদেশ দিয়াছিলেন। শবাধার সমাধিস্থলে লইয়াও যাওয়া হইল। কিন্তু মৃৎপ্রোথিত করার আবশ্যক হইল না। বালিকাটি সজীব হইয়া স্বহস্তে শবাধারের ডালা ভাঙিয়া সকলকে চমকিত করিল। এই ঘটনার সত্যতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। যাঁহারা স্বচক্ষে ব্যাপারটি দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই নানা বৈজ্ঞানিক পত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই বলিতে হয়, জীবন-মৃত্যুর যে সকল সাধারণ লক্ষণ আমাদের জানা আছে, তাহা অভ্রান্ত নয়। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে এক অব্যক্ত জীবন আছে, তাহা জীবনের সাধারণ লক্ষণগুলির দ্বারা ধরা পড়ে না।)

প্রাণীর কথা ছাড়িয়া উদ্ভিদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, জীবন-মৃত্যুর লক্ষণে আরো গোলযোগ দেখা যায়। বাজার হইতে যে সকল বীজ লইয়া বপন করা যায়, তাহার সকলগুলি অঙ্কুরিত হয় না। কাজেই, বাহিরের আকার-প্রকার পরীক্ষা করিয়া যে বীজকে আমরা সজীব মনে করি, তাহা সত্যই জীবিত নয়। পাঠক হয়ত বলিবেন, অঙ্কুরিত হওয়াই বীজের সজীবতার লক্ষণ। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু এই লক্ষণদ্বারা সজীবতা বুঝিতে গেলে, বীজকে নষ্ট করা হয়। প্রাণীর সজীবতা পরীক্ষা করিতে গিয়া যদি তাহার মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করা যায়, তবে পরীক্ষা সার্থক হয় সত্য, কিন্তু

তাহাতে বিশেষ কিছুই লাভ করা যায় না। যে পরীক্ষায় জিনিষটি অবিকৃত থাকিয়া নিজের সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাই প্রকৃত পরীক্ষা।

আধুনিক জীবতত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থে ঐ প্রকার তিনটি পরীক্ষার উল্লেখ দেখা যায়। কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের সজীবতা পরীক্ষা করিতে গেলে, তাহা অক্সিজেন এবং অঙ্গারক বাষ্প আদান-প্রদান করে কিনা, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে দেখা হয়। তার পর দেহের তাপ পরীক্ষা করা হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বশেষে শরীরের কোন অংশে আঘাত দিয়া আহত ও অনাহত অংশের মধ্যে কোন বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিতেছে কি না, তাহা সূক্ষ্ম যন্ত্র-সাহায্যে নির্ণয় করা হইয়া থাকে। প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহ পচিতে আরম্ভ করিলে তাহা জীবনহীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করার প্রথা আছে। কিন্তু ইহাকে কখনই মৃত্যুলক্ষণ বলা যায় না। ডিম্ব জিনিষটাকে প্রাণী বা উদ্ভিদ্ কোন জীবেরই কোটায় ফেলা যায় না। কাজেই, উহাকে নির্জীব বলিয়াই মানিয়া লইতে হয়। অথচ মৃত পদার্থের ন্যায়ই ডিম্ব পচিতে আরম্ভ করে। কেবল ইহা দেখিয়াই যদি কেহ ডিম্বকে মৃত পদার্থ বলেন, তবে অন্যায় করা হয়। যাহা কোন কালে সজীব ছিল না, তাহা কখনই মৃত হইতে পারে না। সুতরাং প্রাণী বা উদ্ভিদের জীবন-মৃত্যু সাধারণ নিয়মে পরীক্ষা করিতে গেলে, পূর্ব্বোক্ত তিনটি পরীক্ষা অবলম্বন করা ছাড়া আর উপায় দেখা যায় না।

আজকাল জীবন-মৃত্যুর লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত উপায়েই স্থির করা হইতেছে বটে, কিন্তু পরীক্ষাকালে এগুলিরও ব্যভিচার দেখা যায়। জীবমাত্রেই কখন কখন এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়, যখন ঐ সকল পরীক্ষার কোনটিতেই তাহারা সাড়া দেয় না। রটিফার (Rotifer) নামক ক্ষুদ্র প্রাণীগুলিকে শুষ্ক স্থানে রাখিলে তাহারা বহু বৎসর ধরিয়া ধূলিকণার ন্যায় পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় পরীক্ষা করিলে জীবনের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। কিন্তু কয়েক মিনিটমাত্র জলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহারাই নড়াচড়া করিয়া জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে। কেবল রটিফার নয়, ইহা ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র প্রাণীর এই প্রকার অব্যক্ত জীবন দেখা যায়। এইগুলি আমিবা প্রভৃতির ন্যায় এককোষ জীব নয়। সাধারণ প্রাণীদিগের ন্যায় ইহাদেরও দেহে পাক-যন্ত্রাদির সুব্যবস্থা আছে। সুতরাং বলিতে হয়, জীবন ও মৃত্যুর মাঝে অব্যক্ত জীবন বলিয়া একটা অবস্থা ছোট বড় প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে।

যে সকল প্রাণীর রক্ত শীতল তাহাদিগের মধ্যে অব্যক্ত জীবন বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করা যায়। মেরুপ্রদেশের তুষাররাশির মধ্যে যখন ভেক জমাট বাঁধিয়া থাকে, তখন তাহার দেহে জীবনের একটুও লক্ষণ দেখা যায় না। তা'র পর বরফ গলিয়া জল হইলেই, তাহারা সজীব হইয় বিচরণ আরম্ভ করে। মেরুপ্রদেশের বরফের মধ্যে মৎস্য এমন জমিয়া যায় যে, একটু চাপ দিলেই তাহাদের দেহ ধূলির ন্যায় চূর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু গ্রীষ্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল মৎস্যই আবার সজীব হইয়া বরফ-গলা জলে আনন্দে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। সুপ্রসিদ্ধ মেরু-পর্য্যটক স্যাক্লটন সাহেব দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে বৎসরের মধ্যে প্রায় দশ মাস কাল কতকগুলি প্রাণীকে একেবারে নির্জীব অবস্থায় থাকিতে দেখিয়াছিলেন।

উষ্ণ-শোণিতযুক্ত উন্নত প্রাণীর কথা আলোচনা করিলে, ইহাদেরও অব্যক্ত জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ণেল টাউন্সেন্ড নামক এক ব্যক্তির অদ্ভুত কার্য্যের কথা হয়ত পাঠক শুনিয়া থাকিবেন। ডব্লিনের ডাক্তার চেনিস্ (Cheynes) স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছেন, লোকটি ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারিত, এবং একটু চেষ্টা করিলেই আবার সজীব হইয়া পড়িত। যখন মরিবার জন্য প্রস্তুত হইত, সত্যসত্যই তখন নাড়ী ক্ষীণতর হইয়া শেষে নিস্পন্দ হইয়া যাইত। এই অবস্থায় চিকিৎসকগণ হৃদ্যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া জীবনের একটুও লক্ষণ ধরিতে পারিতেন না। আমাদের দেশের যোগীদিগের সমাধির অবস্থাসম্বন্ধে যে সকল কথা শুনা যায়, তাহার বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। অধিক দিনের কথা নয়, রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে সাধারণের সম্মুখে সাধু হরিদাসের যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ শুনিলে, মরা ও বাঁচার মধ্যে জীবনের যে একটা নিশ্চেষ্ট অবস্থা আছে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। আয়র্ল্যান্ডের টাউন্সেন্ড সাহেবের ইচ্ছামৃত্যুর কথা সত্য হইলে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুতে, এবং রঘুবংশের রাজাদিগের "যোগেনান্তে তনুত্যজাম্" বিশেষণটিকে কেন অমূলক বলিব বুঝিতে পারি না। (সুতরাং দেখা যাইতেছে, অব্যক্ত জীবন মানুষ প্রভৃতি উন্নত প্রাণীদিগের মধ্যে খুব সুলভ না হইলেও, ব্যাপারটির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না।)

উদ্ভিদ্ ও জীবাণু প্রভৃতি অনুন্নত জীবের মধ্যে অব্যক্ত জীবনের উদাহরণ সর্ব্বদাই দেখা যায়। যে বীজ শত বৎসর মৃতবৎ থাকিয়া মৃত্তিকায় পড়িলেই অঙ্কুরিত হয়, তাহার জীবন যে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া অব্যক্ত অবস্থায় সেই

বীজেই ছিল, তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। অধ্যাপক ম্যাক্‌ফ্যাডেন (Macfadyen) কতকগুলি ব্যাধি-জীবাণুকে তরল-বায়ুর শীতলতার মধ্যে রাখিয়াও একেবারে নির্জীব করিতে পারেন নাই। তরল-বায়ুর উষ্ণতা বরফের অপেক্ষা প্রায় দুই শত ডিগ্রি কম। এই ভয়ানক শীতে জীবাণুগুলি এমন জমাট হইয়া গিয়াছিল যে, অঙ্গুলিস্পর্শে তাহারা ধূলির ন্যায় চূর্ণ হইয়া পড়িত, কিন্তু নির্জীব হয় নাই।

এখন অব্যক্ত জীবনসম্বন্ধে আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ কি বলেন, আলোচনা করা যাউক। ইঁহারা বলেন প্রাণ নামক কোন জিনিষ দেহের কোন বিশেষ অংশে নাই। যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষদ্বারা জীবদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই জীবন বর্ত্তমান। কিন্তু সকলগুলি সমানভাবে জীবিত নয়। কাহারো জীবনের মাত্রা অধিক এবং কাহারো কম। প্রাণীদিগের নখদন্ত এবং কেশাদির বহিরাবরণ যে সকল কোষদ্বারা গঠিত, তাহা আবার সম্পূর্ণ নির্জীব। দেহের সজীব কোষগুলির সমবেত জীবনীশক্তি যে প্রাণী বা উদ্ভিদে অধিক সেই জীবকেই আমরা খুব সপ্রাণ দেখি। সার্ উইলিয়ম্ রস্কোর ন্যায় কর্ম্মী পুরুষ এবং বায়ুরোগগ্রস্ত জড়বৎ ব্যক্তি উভয়েই সজীব বটে, কিন্তু সজীবতার মাত্রা দুইয়ে এক নয়। বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি সত্যই অল্প অক্সিজেন গ্রহণ করে, এবং অতি অল্প অঙ্গারক বাষ্প ত্যাগ করে। ইহার কেবল মস্তিষ্কই দুর্ব্বল নয়, পেশী, ত্বক্, হৃদ্‌যন্ত্র, পাকযন্ত্র প্রভৃতি শরীরের সকল অংশই নির্জীব দেখা যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবন এবং মৃত্যু এই দুই সীমার মধ্যে জীবনের নানা পর্য্যায় বর্ত্তমান। প্রাণী বা উদ্ভিদ্ যখন পূর্ণ জীবন হইতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাহাকে ঐ সকল পর্য্যায়ের মধ্য দিয়াই যাইতে হয়। কিন্তু এগুলির সংখ্যা যে কত, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। আমরা সূর্য্যালোকের সেই মৌলিক সাতটি রঙ্‌কে চিনি। কিন্তু কত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ণচ্ছত্রের (spectrum) লাল রঙ্ পীত হইয়া দাঁড়ায় এবং পীত রঙ্ বেগুনে হইয়া পড়ে, তাহার হিসাব চলে না। আমরা জীবনকে জানি এবং মৃত্যুকেও জানি, কিন্তু কত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া জীবনই মৃত্যু হইয়া দাঁড়ায় তাহার হিসাব করিতে পারি না। শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবন ও মৃত্যুর মাঝেকার কোন এক অবস্থাকেই অব্যক্ত জীবন বলিতে চাহিয়াছেন।

জীবন ব্যাপারটা যে কি, তাহা আজও ঘোর কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই কুহেলিকার আবরণ কোন দিন অপনীত হইবে কি না জানি না। যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, যে সকল অণুদ্বারা দেহ গঠিত, তাহাদেরই সংযোগ-বিয়োগে বিশেষ বিশেষ শক্তিগুলি জীবনের কার্য্য প্রকাশ করে। এই সংযোগ-বিয়োগ আমাদের পরিচিত রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগেরই অনুরূপ কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক জটিল। জীবতত্ত্ব-বিদ্‌গণ জীবনীশক্তির এই রাসায়নিক ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া বলিতেছেন, 'প্রাণী ও উদ্ভিদের অব্যক্ত জীবন এবং দেহের অণুর নিশ্চেষ্ট অবস্থা একই ব্যাপার।' অণুর সংযোগ-বিয়োগের ধর্ম্ম এই অবস্থায় লোপ পায় না, সুপ্তাবস্থায় থাকে মাত্র। তা'র পর তাহাই কালক্রমে ব্যক্ত হইয়া পড়িলে জীবনের ক্রিয়াও ব্যক্ত হইয়া পড়ে। জীবের যখন মৃত্যু হয়, কেবল তখনি সেই সকল ধর্ম্ম একেবারে লোপ পাইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গে যোগ রাখিয়া অণুগুলি যে সকল কার্য্য দেখাইত, তখন মৃত অণুতে তাহা আর দেখা যায় না। সাধারণ জড়পদার্থের স্থূল রাসায়নিক শক্তিগুলিই সেই অবস্থায় উহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে।

(সুতরাং দেখা যাইতেছে, দেহের অণুগুলির চঞ্চলভাব অর্থাৎ জঙ্গমত্বই জীবন।) ঘড়ির কাঁটা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলে ঘড়িটিকে যেমন অল্পক্ষণের জন্য বন্ধ রাখা যায়, সেই প্রকার দেহের জলীয় অংশকে টানিয়া লইলে বা তাপের মাত্রাকে কমাইয়া ফেলিলে অণুর জঙ্গমত্বের ক্ষণিক রোধ সম্ভব হয়। তা'র পর সেই বাধাগুলিকে নষ্ট করিলেই, ঘড়ির কলের ন্যায় দেহের কলটি আপনিই চলিতে আরম্ভ করে।

প্রাণিদেহে নানা প্রকার ঔষধের যে সকল ক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও আণবিক জঙ্গমত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাণীকে অজ্ঞান করিতে হইলে ক্লোরোফরম্ প্রয়োগের রীতি আছে। জিনিষটা নিশ্চয়ই দেহের অণুর সংস্পর্শে আসিয়া রাসায়নিক কার্য্য সুরু করিয়া দেয়, এবং তাহারই ফলে সমগ্র অণু নিশ্চল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্কের অণুর নিশ্চলতায় রোগী সংজ্ঞাহীন হয় এবং হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসযন্ত্রের নিশ্চেষ্টতায় মৃত্যু পর্য্যন্ত দেখা যায়। প্রুসিক্ এসিড (Prussic Acid) জিনিষটা ভয়ানক বিষ। প্রাণীর শ্বাসযন্ত্রের অণুগুলিকে নিষ্ক্রিয় করাই ইহার কাজ।

জীবনীশক্তিকে রাসায়নিক কার্য্য বলিয়া মানিয়া লইয়াও জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ অব্যক্ত জীবনের ইহা ছাড়া আর কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। ইতর প্রাণী বা উদ্ভিদ্ যখন শীতে জমাট বাঁধিয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, আমরা তখন উহাদের দেহের আণবিক নিশ্চলতার কারণ দেখিতে পাই। (কিন্তু টাউন্‌সেন্ড বা সাধু হরিদাসের মত কোন এক ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় জীবনকে অব্যক্ত করে, তখন কোন্ মহাশক্তি দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অণুপুঞ্জের রাসায়নিক শক্তি অপহরণ করে, তাহা এখনো জানা যায় নাই।)

—জগদানন্দ রায়

শিবাজীর চরিত্র

মারাঠাদের গৌরব যে-সময়েই শেষ হউক না কেন, শিবাজী তাহার জন্য দায়ী নহেন ; এই জাতীয় পতন তাঁহার কীর্ত্তি ম্লান করে নাই, বরং বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার চরিত্র নানা সদ্‌গুণে ভূষিত ছিল। তাঁহার মাতৃভক্তি, সন্তানপ্রীতি, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম্মানুরাগ, সাধুসন্তের প্রতি ভক্তি, বিলাস-বর্জ্জন, শ্রমশীলতা এবং সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভাব সে যুগে অন্য রাজবংশে কেন, অনেক গৃহস্থ ঘরেও অতুলনীয় ছিল। রাজা হইয়া তিনি রাজ্যের সমস্ত শক্তি দিয়া স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষা, নিজ সৈন্যদলের উচ্ছৃঙ্খলতা-দমন, সর্ব্ব ধর্ম্মের মন্দির ও শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি সম্মান এবং সাধু-সজ্জনের পোষণ করিতেন।

তিনি নিজে নিষ্ঠাবান্ ভক্ত হিন্দু ছিলেন, ভজন ও কীর্ত্তন শুনিবার জন্য অধীর হইতেন, সাধু-সন্ন্যাসীর পদসেবা করিতেন, গো-ব্রাহ্মণের পালক ছিলেন। অথচ যুদ্ধযাত্রায় কোথাও একখানি কোরান পাইলে তাহা নষ্ট বা অপবিত্র না করিয়া সযত্নে রাখিয়া দিতেন এবং পরে কোন মুসলমানকে তাহা দান করিতেন ; মস্‌জিদ ও ইস্‌লামী মঠ (খান্‌কা) দেখিলে তাহা আক্রমণ না করিয়া ছাড়িয়া

দিতেন। গোঁড়া মুসলমান ঐতিহাসিক খাফি খাঁ শিবাজীর মৃত্যুর বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "কাফির জেহন্নমে গেল।" কিন্তু তিনিও শিবাজীর সৎ চরিত্র, পর-স্ত্রীকে মাতার সমান জ্ঞান, দয়া-দাক্ষিণ্য এবং সর্ব্বধর্ম্মে সমান সম্মান প্রভৃতি দুর্লভ গুণের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। শিবাজীর রাজ্য ছিল, "হিন্দবী স্বরাজ", অথচ অনেক মুসলমান তাঁহার অধীনে চাকরি পাইয়াছিল, উচ্চপদেও উঠিয়াছিল।

সর্ব্বজাতি, সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়, তাঁহার রাজ্যে নিজ নিজ উপাসনার স্বাধীনতা এবং সংসারে উন্নতি করিবার সমান সুযোগ পাইত। দেশে শান্তি ও সুবিচার, সুনীতির জয় এবং প্রজার ধনমান রক্ষা তাঁহারই দান। ভারতবর্ষের মত নানা বর্ণ ও ধর্ম্মের লোক লইয়া গঠিত দেশে, শিবাজীর অনুসৃত এই রাজনীতি অপেক্ষা অধিক উদার ও শ্রেয়ঃ কিছুই কল্পনা করা যাইতে পারে না।

শিবাজীর প্রতিভা ও মৌলিকতা

লোক দেখিবামাত্র তাহাদের চরিত্র ও ক্ষমতা ঠিক বুঝিয়া, প্রত্যেককে তাহার যোগ্যতার অনুযায়ী কাজে নিযুক্ত করাই প্রকৃত রাজার গুণ। শিবাজীর এই আশ্চর্য্য গুণ ছিল। আর, তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণী শক্তি ছিল চুম্বকের মত—দেশের যত সৎ দক্ষ মহৎ লোক তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিত। তাহাদের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিয়া, তাহাদের সন্তুষ্ট রাখিয়া, তাহাদের নিকট হইতে তিনি আন্তরিক ভক্তি এবং একান্ত বিশ্বাস ও সেবা লাভ করিতেন। এই জন্যই তিনি সর্ব্বদা সন্ধি-বিগ্রহে, শাসন ও রাজনীতিতে এত সফল হন। সৈন্যদের সঙ্গে সদা সর্ব্বদা মিলিয়া মিশিয়া, তাহাদের দুঃখকষ্টের ভাগী হইয়া, ফরাসী সৈন্যমধ্যে নেপোলিয়নের ন্যায় তিনি একাধারে তাহাদের বন্ধু ও উপাস্য দেবতা হইয়া পড়েন।

সৈন্যবিভাগের বন্দোবস্তে—শৃঙ্খলা, দূরদর্শিতা, সর্ব্ব বিষয়ের সূক্ষ্মাংশের প্রতি দৃষ্টি, স্বহস্তে কর্ম্মের নানা সূত্র একত্র ধরিবার ক্ষমতা, প্রকৃত চিন্তাশক্তি এবং অনুষ্ঠান-নৈপুণ্য—এই সকল গুণের তিনি পরাকাষ্ঠা দেখান। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার ও তাঁহার সৈন্যগণের জাতীয় স্বভাবের উপযোগী কোন্ প্রণালীর যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ হইবে, নিরক্ষর শিবাজী শুধু প্রতিভার বলেই তাহা আবিষ্কার ও অবলম্বন করেন।

শিবাজীর প্রতিভা যে কত মৌলিক, কত বড়, তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি মধ্যযুগের ভারতে এক অসাধ্য-সাধন করেন। তাঁহার আগে কোন হিন্দুই মধ্যাহ্নসূর্য্যের মত প্রখর দীপ্তিশালী শক্তিমান্ মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ হয় নাই ; সকলেই পরাজিত, নিষ্পেষিত হইয়া লোপ পাইয়াছিল। তাহা দেখিয়াও এই সাধারণ জায়গীরদারের পুত্র ভয় পাইল না, বিদ্রোহী হইল, এবং শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করিল! ইহার কারণ—শিবাজীর চরিত্রে সাহস ও স্থিরচিন্তার অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল ; তিনি নিমিষে বুঝিতে পারিতেন, কোন্ ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হওয়া উচিত, কোথায় থামিতে হইবে—কোন্ সময়ে কোন্ নীতি অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ—এই লোক- ও অর্থবলে ঠিক কি কি কাজ করা সম্ভব। ইহাই সর্ব্বোচ্চ রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচায়ক। এই কার্য্যদক্ষতা ও বিষয়বুদ্ধিই তাঁহার জীবনের সফলতার সর্ব্বপ্রধান কারণ।

শিবাজীর রাজ্য লোপ পাইয়াছে ; তাঁহার বংশধরগণ আজ জমিদারমাত্র। কিন্তু মারাঠা জাতিকে নবজীবন-দান তাঁহার অমর কীর্ত্তি। তাঁহার জীবনের চেষ্টার ফলে সেই বিক্ষিপ্ত, পরাধীন জাতি এক হইল, নিজ শক্তিকে বুঝিতে পারিল, উন্নতির শিখরে পেঁছিল। ফলতঃ, শিবাজী হিন্দুজাতির সর্ব্বশেষ মৌলিক গঠন-কর্ত্তা এবং রাজনীতিক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর। তাঁহার শাসন-পদ্ধতি, সৈন্যগঠন, অনুষ্ঠান রচনা সবই নিজের সৃষ্টি, রণজিৎ সিংহ বা মাহাদজী সিন্ধিয়ার মত তিনি ফরাসী সেনাপতি বা শাসনকর্ত্তার সাহায্য লন নাই। তাঁহার রাজ্যব্যবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল, এবং পেশোয়াদের সময়েও আদর্শ বলিয়া গণ্য হইত।

নিরক্ষর গ্রাম্য বালক শিবাজী কত সামান্য সম্বল লইয়া, চারিদিকে কত বিভিন্ন পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে যুঝিয়া নিজকে—সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মারাঠা জাতিকে স্বাধীনতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা অন্যত্র বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই আদিযুগের গুপ্ত- ও পাল-সাম্রাজ্যের পর শিবাজী ভিন্ন অপর কোন হিন্দুই এত উচ্চ শ্রেণীর ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই।

একতাহীন, নানা খণ্ডরাজ্যে বিচ্ছিন্ন, মুসলমান রাজার অধীন, এবং পরের চাকর মারাঠাদের ডাকিয়া আনিয়া শিবাজী প্রথমে নিজ কার্য্যের দ্বারা দেখাইয়া দিলেন যে, তাহারা নিজেই নিজের প্রভু হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে। তাহার পর, স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া তিনি প্রমাণ করিলেন যে, বর্ত্তমান কালের হিন্দুরাও

রাষ্ট্রের সর্ব্ব বিভাগের কাজ চালাইতে পারে, শাসন-প্রণালী গড়িয়া তুলিতে, জলে স্থলে যুদ্ধ করিতে, দেশে সাহিত্য ও শিল্প পুষ্ট করিতে, বাণিজ্যপোত গঠন ও পরিচালন করিতে, ধর্ম্মরক্ষা করিতে, তাহারা সমর্থ ; জাতীয় দেহকে পূর্ণতা দান করিবার শক্তি তাহাদের আছে।

শিবাজীর চরিত-কথা আলোচনা করিয়া আমরা এই শিক্ষা পাই যে, প্রয়াগের অক্ষয় বটের মত হিন্দুজাতির প্রাণ মৃত্যুহীন, কত শত বৎসরের বাধা-বিপত্তির ভার ঠেলিয়া ফেলিয়া আবার মাথা তুলিবার, আবার নূতন শাখা-পল্লব বিস্তার করিবার শক্তি তাহাদের মধ্যে নিহিত আছে। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিলে, চরিত্রবলে বলীয়ান হইলে, নীতি ও নিয়মানুবর্ত্তিতাকে অন্তরের সহিত মানিয়া লইলে, স্বার্থ অপেক্ষা জন্মভূমিকে বড় ভাবিলে, বাগাড়ম্বর অপেক্ষা নীরব কার্য্যকে সাধনার লক্ষ্য করিলে,—জাতি অমর, অজেয় হইবে।

—যদুনাথ সরকার

তৃতীয় দ্যূতসভা

মহাভারতে আছে, প্রথম দ্যূতসভায় যুধিষ্ঠির সর্বস্ব হেরে যাবার পর ধৃতরাষ্ট্র অনুতপ্ত হয়ে তাঁকে সমস্ত পণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পাণ্ডবরা যখন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন দুর্যোধনের প্ররোচনায় ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে আবার খেলবার জন্য ডেকে আনেন। এই দ্বিতীয় দ্যূতসভাতেও যুধিষ্ঠির হেরে যান এবং তার ফলে পাণ্ডবদের নির্বাসন হয়।

শকুনি-যুধিষ্ঠির কি রকম পাশা খেলেছিলেন? তাঁদের খেলায় ছক আর ঘুঁটি ছিল না, উভয় পক্ষ পণ উচ্চারণ ক'রেই অক্ষপাত করতেন, যাঁর দান বেশী পড়ত তাঁরই জয়। মহাভারতে দ্যূত-পর্বাধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রত্যেকবার পণ-ঘোষণার পর এই শ্লোকটি আছে—

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ।
জিতমিত্যেব শকুনির্যুধিষ্ঠিরমভাষত।।

অর্থাৎ পণঘোষণা শুনেই শকুনি নিকৃতি (শঠতা) আশ্রয় ক'রে খেলায় প্রবৃত্ত হলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে বললেন, জিতলাম। এতে বোঝা যায় যে, পাশা ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে এক একটা বাজি শেষ হ'ত।

অনেকেই জানেন না যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে যুধিষ্ঠির আরও একবার শকুনির সঙ্গে পাশা খেলেছিলেন। ব্যাসদেব মহাভারত থেকে তৃতীয় দ্যূত-পর্বাধ্যায়টি কেন বাদ দিয়েছেন তা বলা শক্ত।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঁচিশ দিন পূর্বের কথা। যুধিষ্ঠির সকালবেলা তাঁর শিবিরে ব'সে আছেন, সহদেব তাঁকে সংগৃহীত রসদের ফর্দ প'ড়ে শোনাচ্ছেন। এমন সময় প্রতিহার এসে জানালে, 'ধর্মরাজ, এক অভিজাতকল্প কুব্জপুরুষ আপনার দর্শনপ্রার্থী। পরিচয় দিলেন না, বললেন তাঁর বার্তা অতি গোপনীয়, সাক্ষাতে নিবেদন করবেন।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'এখনই তাঁকে নিয়ে এস।'

আগন্তুক বক্রপৃষ্ঠ প্রৌঢ়, বলিকুঞ্চিত শীর্ণ মুণ্ডিত মুখ, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, গলায় নীলবর্ণ হার, পরণে ঢিলে ইজের, তার উপর লম্বা জামা। যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের জয়।'

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে আপনি সৌম্য?'

আগন্তুক উত্তর দিলেন, 'মহারাজ, ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, আমার বক্তব্য কেবল রাজকর্ণে নিবেদন করতে চাই।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'সহদেব, তুমি এখন যেতে পার।'

সহদেব বিরক্ত হয়ে সন্দিগ্ধমনে চ'লে গেলেন।

আগন্তুক অনুচ্চস্বরে বললেন, 'মহারাজ, আমি সুবলপুত্র মৎকুনি, শকুনির বৈমাত্র ভ্রাতা।'

'বলেন কি, আপনি আমাদের পূজনীয় মাতুল, প্রণাম প্রণাম—কি সৌভাগ্য—এই সিংহাসনে বসতে আজ্ঞা হ'ক।'

'না মহারাজ, এই নিম্ন আসনই আমার উপযুক্ত।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তবে ঐ শৃগালচর্মাবৃত বেদীতে উপবেশন করুন। এখন কৃপা ক'রে বলুন কি প্রয়োজনে আগমন হয়েছে। মাতুল, আগে তো কখনও আপনাকে দেখিনি।'

'দেখবেন কি ক'রে মহারাজ। আমি অন্তরালেই বাস করি, তা ছাড়া গত তের বৎসর বিদেশে ছিলাম। কুব্জতার জন্য ক্ষত্রিয়ধর্মপালন আমার সাধ্য নয়,

সে কারণে যন্ত্রমন্ত্রবিদ্যার চর্চা ক'রে তাতেই সিদ্ধিলাভ করেছি। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা আমাকে বরদানে কৃতার্থ করেছেন। পাণ্ডবাগ্রজ, শুনেছি দ্যূতক্রীড়ায় আপনার পটুতা অসামান্য, অক্ষহৃদয় আপনার নখদর্পণে।'

'হুঁ, লোকে তাই বলে বটে।'

'তথাপি শকুনির হাতে আপনার পরাজয় ঘটেছে। কেন, জানেন কি?'

যুধিষ্ঠির ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললেন, 'শকুনি ধর্মবিরুদ্ধ কপট দ্যূতে আমাকে হারিয়েছিলেন।'

মৎকুনি একটু হেসে বললেন, 'দ্যূতে কপট আর অকপট ব'লে কোনও ভেদ নাই। যে অক্ষক্রীড়ায় দৈবই উভয় পক্ষের অবলম্বন, অজ্ঞ লোকে তাকে অকপট বলে। যদি এক পক্ষ দৈবের উপর নির্ভর করে এবং অপর পক্ষ পুরুষকার দ্বারা জয়লাভ করে, তবে পরাজিত পক্ষ কপটতার অভিযোগ আনে। ধর্মরাজ, আপনার দৈবশক্তি অক্ষ শকুনির পুরুষকারপাতিত অক্ষের নিকট পরাস্ত হয়েছে। আপনি প্রবলতর পুরুষকার আশ্রয় করুন, রাবণবাণের বিরুদ্ধে রামবাণ প্রয়োগ করুন, দ্যূতলক্ষ্মী আপনাকেই বরণ করবেন।'

'মাতুল, আপনার বাক্য আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।'

'ধর্মপুত্র, আমার গূঢ় কথা শুনুন। শকুনির অক্ষ আমারই নির্মিত, তার গর্ভে আমি মন্ত্রসিদ্ধ যন্ত্র স্থাপন করেছি, সেজন্য তার ক্ষেপ অব্যর্থ, দুরাত্মা শকুনি যন্ত্রকৌশল শিখে নিয়ে আমাকে গজভুক্ত কপিত্থবৎ পরিত্যাগ করেছে। সে আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, পাণ্ডবগণের নির্বাসনের পর দুর্যোধন আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপদ দেবে। আপনারা বনে গেলে যখন দুর্যোধনকে প্রতিশ্রুতির কথা জানালাম তখন সে বললে—আমি কিছুই জানি না, মামাকে বল। শকুনি বললে—আমি কি জানি, দুর্যোধনের কাছে যাও। অবশেষে দুই নরাধম আমাকে ছলে বলে দুর্গম বাহ্লিক দেশে পাঠিয়ে সেখানে কারারুদ্ধ ক'রে রাখে। আমি তের বৎসর পরে কোনও গতিকে সেখান থেকে পালিয়ে এসে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আমি বামন হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থরূপ চন্দ্রে হস্তপ্রসার করেছিলাম, তাই আমার এই দুর্দশা। আপনি বিজয়ী হয়ে শকুনিকে বিতাড়িত ক'রে আমাকে গান্ধাররাজ্য দেবেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট হব।'

'আপনার নির্মিত অক্ষে আমার সর্বনাশ হয়েছে—তারই পুরস্কারস্বরূপ?'

মৎকুনি জিহ্বা দংশন ক'রে বললেন, 'ও কথা আর তুলবেন না মহারাজ। আমার বক্তব্য সবটা শুনুন। আমি গুপ্ত সংবাদ পেয়েছি—সঞ্জয় এখনই

ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায় আপনার কাছে আসছেন। দুর্যোধন আর শকুনির প্ররোচনায় অন্ধ রাজা আবার আপনাকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করছেন। মহারাজ, এই মহাসুযোগ ছাড়বেন না।'

এমন সময় রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা গেল। মৎকুনি ত্রস্ত হয়ে বললেন, 'ঐ সঞ্জয় এসে প'ড়লেন। দোহাই মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব সদ্য সদ্য প্রত্যাখ্যান করবেন না, বলবেন যে আপনি বিবেচনা ক'রে পরে উত্তর পাঠাবেন। সঞ্জয় চ'লে গেলে আমার সব কথা আপনাকে জানাব। আমি আপাতত এই পাশের ঘরে লুকিয়ে থাকছি।'

যথাবিধি কুশল-প্রশ্নাদি বিনিময়ের পর সঞ্জয় বললেন, 'হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ, আমি দূতমাত্র, আমার অপরাধ নেবেন না। ধৃতরাষ্ট্র এই বলেছেন।—বৎস যুধিষ্ঠির, তোমরা পঞ্চভ্রাতা আমার শতপুত্রের সমান স্নেহপাত্র। এই লোকক্ষয়কর জ্ঞাতিবিধ্বংসী আসন্ন যুদ্ধ যে কোনও উপায়ে নিবারণ করা কর্তব্য। আমি অশক্ত অন্ধ বৃদ্ধ, আমার পুত্রেরা অবাধ্য এবং যুদ্ধের জন্য উৎসুক। আমি বহু চিন্তা ক'রে স্থির করেছি যে, হিংস্র অস্ত্রযুদ্ধের পরিবর্তে অহিংস দ্যূতযুদ্ধেই উভয় পক্ষের বৈরভাব চরিতার্থ হ'তে পারে। অতি কষ্টে আমার পুত্রগণ ও তাদের মিত্রগণকে এতে সম্মত করেছি। অতএব তুমি সবান্ধবে কৌরবশিবিরে এসে আর একবার সুহৃদ্‌দ্যূতে প্রবৃত্ত হও, পণ পূর্ববৎ সমগ্র কুরুপাণ্ডব-রাজ্য। যদি দুর্যোধনের প্রতিনিধি শকুনির পরাজয় ঘটে তবে কুরুপক্ষ সদলে রাজ্যত্যাগ ক'রে চিরতরে বনবাসে যাবে। যদি তুমি পরাস্ত হও তবে তোমরাও রাজ্যের আশা ত্যাগ ক'রে চিরবনবাসী হবে। বৎস, তুমি কপটতার আশঙ্কা ক'রো না। আমি দুই প্রস্থ অক্ষ সজ্জিত রাখব, তুমি স্বহস্তে নিজের জন্য বেছে নিও, অবশিষ্ট অক্ষ শকুনি নেবেন। এর চেয়ে অসন্দিগ্ধ ব্যবস্থা আর কি হ'তে পারে? সঞ্জয়ের মুখে তোমার সম্মতি পাওয়ার আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম। হে তাত যুধিষ্ঠির, তোমার সুমতি হ'ক, তোমাদের পঞ্চভ্রাতার কল্যাণ হ'ক, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সহ কুরুপাণ্ডবের প্রাণরক্ষা হ'ক।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'আপনি কুরুরাজকে জানাবেন যে, তিনি আমাকে অতি দুরূহ সমস্যায় ফেলেছেন, আমি সম্যক্‌ বিবেচনা ক'রে পরে তাঁকে উত্তর পাঠাব। এখন আপনি বিশ্রামান্তে আহারাদি করুন, কাল ফিরে যাবেন।'

'না মহারাজ, আমাকে এখনই ফিরতে হবে, বিশ্রামের অবসর নেই। ধর্মপুত্রের জয় হ'ক।' এই ব'লে সঞ্জয় বিদায় নিলেন।

মৎকুনি পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'মহারাজ, আপনি ঠিক উত্তর দিয়েছেন। এইবার আমার মন্ত্রণা শুনুন। আজই অপরাহ্ণে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে একজন বিশ্বস্ত দূত পাঠান, কিন্তু আপনার ভ্রাতারা যেন জান্তে না পারেন। আপনার দূত গিয়ে বলবে—হে পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য, অতি অপ্রিয় হ'লেও তৃতীয়বার দ্যূতক্রীড়ায় আমি সম্মত আছি। আপনার আয়োজিত অক্ষে আমার প্রয়োজন নেই, আমি নিজের অক্ষেই নির্ভর করব। শকুনিও নিজের অক্ষে খেলবেন। আপনি যে পণ নির্ধারণ করেছেন তাতেও আমার সম্মতি আছে। শুধু এই নিয়মটি আপনাকে মেনে নিতে হবে যে, শকুনি আর আমি প্রত্যেকে একটিমাত্র অক্ষ নিয়ে খেলব এবং তিনবার মাত্র অক্ষক্ষেপণ করব, তাতে যার বিন্দুসমষ্টি অধিক হবে তারই জয়।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'হে সুবলনন্দন মৎকুনি, আপনি সম্পর্কে আমার মাতুল হন, কিন্তু এখন বোধ হচ্ছে আপনি বাতুল। আমি কোন্ ভরসায় আবার শকুনির সংগে স্পর্ধা করব? যদি আপনি আমাকে শকুনির অনুরূপ অক্ষ প্রদান করেন, তাতে সমানে সমানে প্রতিযোগ হবে, কিন্তু আমার জয়ের স্থিরতা কোথায়? ধৃতরাষ্ট্রের আয়োজিত অক্ষে আপত্তির কারণ কি? তিনবার মাত্র অক্ষক্ষেপণের উদ্দেশ্য কি? বহুবার ক্ষেপণেই তো সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনা অধিক। আর, আপনি যে দুর্যোধনের চর নন তারই বা প্রমাণ কি?'

মৎকুনি বললেন, 'মহারাজ, স্থিরো ভব, আপনার সমস্ত সংশয় আমি ছেদন করছি। যদি আপনি ধৃতরাষ্ট্রের আয়োজিত অক্ষ নিয়ে খেলেন তবে আপনার পরাজয় অনিবার্য। ধূর্ত শকুনি সে অক্ষে খেলবে না, হাতে নিয়েই ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় বদলে ফেলে নিজের আগেকার অক্ষেই খেলবে। আমি এতকাল বাহ্লীক দুর্গে নিশ্চেষ্ট ছিলাম না, নিরন্তর গবেষণায় প্রচণ্ডতর মন্ত্রশক্তিযুক্ত অক্ষ উদ্ভাবন করেছি। আপনাকে এই নবযন্ত্রান্বিত আশ্চর্য অক্ষ দেব, তার কাছে এলেই শকুনির পুরাতন অক্ষ একেবারে বিকল হয়ে যাবে। মহারাজ, আপনার জয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই। আমার যন্ত্র অতি সূক্ষ্ম, সেজন্য একদিনে অধিকবার ক্ষেপণ অবিধেয়। শকুনির অক্ষও দীর্ঘকাল সক্রিয় থাকে না, সেজন্য সে আনন্দে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হবে। আপনার জয়ের

পক্ষে তিনবার ক্ষেপণই যথেষ্ট। অক্ষ আমার সঙ্গেই আছে, পরীক্ষা ক'রে দেখুন।'

মৎকুনি তাঁর কটিলগ্ন থলি থেকে একটি গজদন্তনির্মিত অক্ষ বার করলেন। যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করলেন, অক্ষটি শকুনির অক্ষেরই অনুরূপ, তেমনই সুগঠিত, সুমসৃণ, ধার এবং পৃষ্ঠগুলি ঈষৎ গোলাকার, প্রতি বিন্দুর কেন্দ্রে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র।

মৎকুনি বললেন, 'মহারাজ, তিনবার ক্ষেপণ করে দেখুন।'

যুধিষ্ঠির তাই করলেন, তিনবারই ছয় বিন্দু উঠল, তিনি আশ্চর্য হয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলেন, কিন্তু মৎকুনি ঝটিতি কেড়ে নিয়ে থলির ভিতর রেখে বললেন, 'এই মন্ত্রপূত অক্ষ অনর্থক নাড়াচাড়া নিষিদ্ধ, তাতে গুণহানি হয়।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'আপনার অক্ষটি নির্ভরযোগ্য বটে। কিন্তু এর পর আপনি যে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না তার জন্য দায়ী থাকবে কে?'

'দায়ী আমার মুণ্ড। আপনি এখন থেকে আমাকে বন্দী ক'রে রাখুন, দুজন খড়্গপাণি প্রহরী নিরন্তর আমার সঙ্গে থাকুক। তাদের আদেশ দিন—যদি আপনার পরাজয়ের সংবাদ আসে তবে তখনই আমার মুণ্ডচ্ছেদ করবে। মহারাজ, এখন আপনার বিশ্বাস হয়েছে?'

'হয়েছে। আপনার মন্ত্রণা আমি মেনে নিচ্ছি। আজই কুরুরাজের কাছে দূত পাঠাব। আপনি এখন থেকে সশস্ত্র প্রহরীর দ্বারা রক্ষিত হয়ে গুপ্তগৃহে বাস করবেন, কুরুপাণ্ডব কেউ আপনার খবর জানবে না। যদি জয়ী হই, আপনি গান্ধার রাজ্য পাবেন। যদি পরাজিত হই তবে আপনার মৃত্যু। এখন আপনার পাশকটি আমাকে দিন।'

'মহারাজ, আপনার কাছে পাশক থাকলে পরিচর্যার অভাবে তার গুণ নষ্ট হবে। আমার কাছেই এখন থাকুক, আমি তাতে নিয়ত মন্ত্রাধান করব এবং দ্যূতযাত্রার পূর্বে আপনাকে দেব। ইচ্ছা করেন তো আপনি প্রত্যহ একবার আমার কাছে এসে খেলে দেখতে পারেন।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'মৎকুনি, আপনার তুচ্ছ জীবন আমার হাতে, কিন্তু আমার বুদ্ধি রাজ্য ধর্ম সমস্তই আপনার হাতে। আপনার বশবর্তী হওয়া ভিন্ন আমার অন্য গতি নেই।'

মহাসমারোহে দ্যূতসভা বসেছে। ধৃতরাষ্ট্র স্থির থাকতে পারেন নি, হস্তিনাপুর থেকে দুদিনের জন্য কৌরবশিবিরে এসেছেন, খেলার ফলাফল দেখে ফিরে যাবেন। শকুনির দক্ষতায় তাঁর অগাধ বিশ্বাস। কুরুপক্ষের জয়সম্বন্ধে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

সভায় কৃষ্ণবলরাম, পঞ্চপাণ্ডব, দুর্যোধনাদি সহ ধৃতরাষ্ট্র, শকুনি, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি সকলে উপস্থিত হ'লে পিতামহ ভীষ্ম বললেন, 'আমি এই দ্যূতসভার সম্যক্ নিন্দা করি। কিন্তু আমি কুরুরাজের ভৃত্য, সেজন্য অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই গর্হিত ব্যাপার দেখতে হবে।'

দ্রোণাচার্য বললেন, 'আমি তোমার সঙ্গে একমত।'

ভীষ্ম বললেন, 'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, এই সভায় দ্যূতনীতিবিরুদ্ধ কোনও কর্ম যাতে না হয় তার বিধান তোমার কর্তব্য। আমি প্রস্তাব করছি শ্রীকৃষ্ণকে সভাপতি নিযুক্ত করা হ'ক।'

দুর্যোধন আপত্তি তুললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষপাতী।'

কৃষ্ণ বললেন, 'কথাটা মিথ্যা নয়। আর, আমার অগ্রজ উপস্থিত থাকতে আমি সভাপতি হতে পারি না।'

তখন ধৃতরাষ্ট্র সর্বসম্মতিক্রমে বলরামকে সভাপতির পদে বরণ করলেন।

বলরাম বললেন, 'বিলম্বে প্রয়োজন কি, খেলা আরম্ভ হ'ক। হে সমবেত সুধীবর্গ, এই দ্যূতে কুরুপক্ষে শকুনি এবং পাণ্ডবপক্ষে যুধিষ্ঠির নিজ নিজ একটিমাত্র অক্ষ নিয়ে খেলবেন। প্রত্যেকে তিনবার মাত্র অক্ষপাত করবেন। যাঁর বিন্দুসমষ্টি অধিক হবে তাঁরই জয়। এই দ্যূতের পণ সমগ্র কুরুপাণ্ডব-রাজ্য। পরাজিত পক্ষ বিজয়ীকে রাজ্য সমর্পণ ক'রে এবং যুদ্ধের বাসনা পরিহার ক'রে সদলে চিরবনবাসী হবেন। সুবলনন্দন শকুনি, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনিই প্রথম অক্ষপাত করুন।'

শকুনি সহাস্যে অক্ষনিক্ষেপ ক'রে বললেন, 'এই জিতলাম।' তাঁর পাশাটি পতনমাত্র একটু গড়িয়ে গিয়ে স্থির হ'লে তাতে ছয় বিন্দু দেখা গেল। কর্ণ এবং দুর্যোধনাদি সোল্লাসে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'আমাদের জয়।'

বলরাম বললেন, 'যুধিষ্ঠির, এইবার আপনি ফেলুন।'

যুধিষ্ঠিরের পাশা একবার ওলটাবার পর স্থির হ'লে তাতেও ছয় বিন্দু উঠল। পাণ্ডবরা বললেন, 'ধর্মরাজের জয়।'

বলরাম বললেন, 'তোমরা অনর্থক চীৎকার করছ। কারও জয় হয় নি, দুই পক্ষই এখন পর্যন্ত সমান।'

শকুনি গম্ভীরবদনে বললেন, 'এখনও দুই ক্ষেপ বাকী, তাতেই জিতব।'

দ্বিতীয় বারে শকুনির পাশা আর গড়াল না, প'ড়েই স্থির হ'ল। পৃষ্ঠে পাঁচ বিন্দু। যুধিষ্ঠিরের পাশায় পূর্ববৎ ছয় বিন্দু উঠল। শকুনি লক্ষ্য করলেন তাঁর পাশাটি কাঁপছে।

পাণ্ডবপক্ষ আনন্দে গর্জন ক'রে উঠলেন। বলরাম ধমক দিয়ে বললেন, 'খবরদার, ফের চীৎকার করলেই সভা থেকে বার ক'রে দেব।'

সভা স্তব্ধ। শেষ অক্ষপাত দেখবার জন্য সকলেই শ্বাসরোধ ক'রে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন।

শকুনি পাংশুমুখে তৃতীয়বার পাশা ফেললেন। পাশাটি কর্দমপিণ্ডবৎ ধপ ক'রে পড়ল। এক বিন্দু।

যুধিষ্ঠিরের পাশায় আবার ছয় বিন্দু উঠল। বলরাম মেঘমন্দ্রস্বরে ঘোষণা করলেন, 'যুধিষ্ঠিরের জয়।'

তখন সভাস্থ সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন, যুধিষ্ঠিরের পতিত পাশা ধীরে ধীরে লাফিয়ে লাফিয়ে শকুনির পাশার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সভায় তুমুল কোলাহল উঠল—'মায়া, মায়া, কুহক, ইন্দ্রজাল!'

দুর্যোধন হাত পা ছুড়ে বললেন, 'যুধিষ্ঠির নিকৃতি আশ্রয় করেছেন, তাঁর জয় আমরা মানি না। সাধু ব্যক্তির পাশা কখনও চ'লে বেড়ায়?'

বলরাম বললেন, 'আমি দুই অক্ষই পরীক্ষা করব।'

যুধিষ্ঠির তখনই তাঁর পাশা তুলে নিয়ে বলরামকে দিলেন।

শকুনি তাঁর পাশাটি মুষ্টিবদ্ধ ক'রে বললেন, 'আমার অক্ষ কাকেও স্পর্শ করতে দেব না।'

বলরাম বললেন, 'আমি এই সভার অধ্যক্ষ, আমার আজ্ঞা অবশ্যপাল্য।'

শকুনি উত্তর দিলেন, 'আমি তোমার আজ্ঞাবহ নই।'

বলরাম তখন শকুনির গালে একটি চড় মেরে পাশা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'হে সভামণ্ডলী, আমি এই দুই অক্ষই ভেঙে দেখব ভিতরে কি আছে।' এই ব'লে তিনি শিলাবেদীর উপর একে একে দুটি পাশা আছড়ে ফেললেন।

শকুনির পাশা থেকে একটি ঘুরঘুরে পোকা বার হয়ে নির্জীববৎ ধীরে ধীরে দাঁড়া নাড়তে লাগল। যুধিষ্ঠিরের পাশা থেকে একটি ছোট টিকটিকি বেরিয়ে তখনই পোকাটিকে আক্রমণ করলে।

বাত্যাহত সাগরের ন্যায় সভা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইলেন, 'কি হয়েছে?'

বলরাম উত্তর দিলেন, 'বিশেষ কিছু হয় নি, একটি ঘুর্ঘুর-কীট শকুনির অক্ষে ছিল—'

ধৃতরাষ্ট্র সভয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কামড়ে দিয়েছে? কি ভয়ানক!'

'কামড়ায় নি মহারাজ, শকুনির অক্ষের মধ্যে ছিল। এই কীট অতি অবাধ্য, কিছুতেই কাত বা চিত হ'তে চায় না, অক্ষের ভিতর পুরে রাখলে অক্ষ সমেত উবুড় হয়। যুধিষ্ঠিরের অক্ষ থেকে একটি গোধিকা বেরিয়েছে। এই প্রাণী আরও দুর্বিনীত, স্বয়ং ব্রহ্মা একে কাৎ করতে পারেন না। গোধিকার গন্ধ পেয়ে ঘুর্ঘুর ভয়ে অবসন্ন হয়েছিল, তাই শকুনি অভীষ্ট ফল পান নি।'

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার জয় হল?'

বলরাম বললেন, যুধিষ্ঠিরের। দুই পক্ষই কূট পাশক নিয়ে খেলেছেন, অতএব কপটতার আপত্তি চলে না।'

যুধিষ্ঠির তখন জনান্তিকে বলরামকে মৎকুনির বৃত্তান্ত জানালেন। বলরাম তাঁকে বললেন, 'আপনার কুণ্ঠার কিছুমাত্র কারণ নেই, কূট পাশকের ব্যবহার দ্যূতবিধিসম্মত।'

যুধিষ্ঠির পরম অবজ্ঞাভরে বললেন, 'হলধর, তুমি মহাবীর, কিন্তু শাস্ত্র কিছুই জান না। ভগবান্ মনু বলেছেন—

অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ।।

অর্থাৎ অপ্রাণী নিয়ে যে খেলা তাকেই লোকে দ্যূত বলে, আর প্রাণী নিয়ে খেলার নাম সমাহ্বয়। কুরুরাজ আমাকে অপ্রাণিক দ্যূতেই আমন্ত্রণ করেছেন, কিন্তু দুর্দৈববশে আমাদের অক্ষ থেকে প্রাণী বেরিয়েছে। অতএব এই দ্যূত অসিদ্ধ।'

কর্ণ করতালি দিয়ে বললেন, 'ধর্মরাজ, তুমি সার্থকনামা।'

বলরাম বললেন, 'ধর্মরাজের শাস্ত্রজ্ঞান অগাধ, যদিও কাণ্ডজ্ঞানের কিঞ্চিৎ অভাব দেখা যায়। মেনে নিচ্ছি এই দ্যূত অসিদ্ধ। সে ক্ষেত্রে পূর্বের দ্যূতও অসিদ্ধ, শকুনি তাতেও ঘুর্ঘুরগর্ভ অক্ষ নিয়ে খেলেছিলেন। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র, আপনার শ্যালকের অশাস্ত্রীয় আচরণের জন্য পাণ্ডবগণ বৃথা ত্রয়োদশ বর্ষ নির্বাসন ভোগ করেছেন। এখন তাঁদের পিতৃরাজ্য ফিরিয়ে দিন, নতুবা পরকালে আপনার নরকভোগ সুনিশ্চিত।'

যুধিষ্ঠির উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি কোনও কথা শুনতে চাই না, দ্যূতপ্রসঙ্গে আমার ঘৃণা ধ'রে গেছে। আমরা যুদ্ধ ক'রেই হৃতরাজ্য উদ্ধার করব। জ্যেষ্ঠতাত, প্রণাম, আমরা চললাম।'

তখন পাণ্ডবগণ মহা উৎসাহে বারংবার সিংহনাদ করতে করতে নিজ শিবিরে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণ-বলরামও তাঁদের সঙ্গে গেলেন।

ফিরে এসেই যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমার প্রথম কর্তব্য মৎকুনিকে মুক্তি দেওয়া। এই হতভাগ্য মূর্খের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হয়েছে। চল, তাকে আমরা প্রবোধ দিয়ে আসি।'

একটু আগেই পাণ্ডবশিবিরে সংবাদ এসে গেছে যে দ্যূতসভায় কিছু-একটা প্রচণ্ড গণ্ডগোল হয়েছে। যুধিষ্ঠিরাদি যখন কারাগৃহে এলেন তখন দুই প্রহরী তর্ক করছিল—মৎকুনির মুণ্ডচ্ছেদ করা উচিত, না শুধু নাসাচ্ছেদেই আপাতত কর্তব্যপালন হবে।

যুধিষ্ঠিরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে মৎকুনি মাথা চাপড়ে বললেন, 'না, দৈবই দেখছি সর্বত্র প্রবল। আমি গোধিকাকে বেশী খাইয়ে তার দেহে অত্যধিক বলাধান করেছি, তাই সেই কৃতঘ্ন জীব লম্ফঝম্ফ ক'রে আমার সর্বনাশ করেছে। বলদেব তবু সামলে নিয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মরাজ শেষটায় শাস্ত্র আউরে সব মাটি ক'রে দিলেন। মুক্তি পেয়ে আমার লাভ কি, দুর্যোধন আমাকে নিশ্চয় হত্যা করবে।'

বলরাম বললেন, 'মৎকুনি, তোমার কোন চিন্তা নেই, আমার সঙ্গে দ্বারকায় চল। সেখানে অহিংসক সাধুগণের একটি আশ্রম আছে, তাতে অসংখ্য উৎকুণ-মৎকুণ-মশক-মূষিকাদির নিত্যসেবা হয়, তোমাকে তার অধ্যক্ষ ক'রে দেব, তুমি নব নব গবেষণায় সুখে কালযাপন করতে পারবে।'

—রাজশেখর বসু

গণেশ

সর্ব্ববিঘ্নহর ও সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ব'লে যে দেবতাটি হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণে সর্ব্বাগ্রে পূজা পান, তাঁর 'গণেশ' নামেই পরিচয় যে তিনি 'গণ' অর্থাৎ জনসংঘের দেবতা। এ থেকে যেন কেউ অনুমান না করেন যে, প্রাচীন হিন্দু-সমাজের যাঁরা মাথা, তাঁরা জনসংঘের উপর অশেষ ভক্তিমান্ ও প্রীতিমান্ ছিলেন। যেমন আর সব সমাজের মাথা, তেমনি তাঁরাও সংঘবদ্ধ জনশক্তিকে ভক্তি কর্তেন না, ভয় কর্তেন! 'গণেশ' দেবতাটির আদিম পরিকল্পনায় এর বেশ স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আদিতে 'গণেশ' ছিলেন কর্ম্মসিদ্ধির দেবতা নয়, কর্ম্মবিঘ্নের দেবতা। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির মতে এঁর দৃষ্টি পড়্লে রাজার ছেলে রাজ্য পায় না, কুমারীর বিয়ে হয় না, বেদজ্ঞ আচার্য্যত্ব পান না, ছাত্রের বিদ্যা হয় না, বণিক ব্যবসায়ে লাভ কর্তে পারে না, চাষীর ক্ষেতে ফসল ফলে না। এই জন্যই 'গণেশে'র অনেক প্রাচীন পাথরের মূর্ত্তিতে দেখা যায় যে, শিল্পী তাঁকে অতি ভয়ানক চেহারা দিয়ে গড়েছে। এবং গণেশের যে পূজা, তা' ছিল এই ভয়ংকর দেবতাটিকে শান্ত রাখবার জন্য ; তিনি কাজকর্ম্মের উপর দৃষ্টি না দেন, সেজন্য ঘুষের ব্যবস্থা। গণশক্তির উপর প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কর্ত্তাদের মনোভাব কি ছিল, তা' গণেশের নরশরীরের উপর জানোয়ারের মাথার কল্পনাতেই প্রকাশ।

কিন্তু এ মনোভাব প্রাচীন হিন্দুর একচেটিয়া নয়। সকল সভ্যতা ও সমাজের কর্ত্তারাই জনসংঘকে 'লম্বোদর গজানন' ব'লেই জেনেছেন। ওর হাত-পা মানুষের, কিন্তু ওর কাঁধের উপর যে মাথাটি তা' মানুষের নয়, মনুষ্যেতর জীবের। আর ওর উদর এত প্রকাণ্ড যে, তাকে যথার্থ ভরাতে হ'লে, যাদের কাঁধের উপর মানুষের মাথা, তাদের সুখ-সুবিধার উপকরণ অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং সব দেশের যারা বুদ্ধিমান্ লোক, তারা, মগজে মানুষের বুদ্ধির পরিবর্ত্তে জানোয়ারের নির্ব্বুদ্ধিতা রয়েছে ভরসায়, ওর বিরাট্ উদরের যতটা খালি রেখে সারা যায়, সেই চেষ্টা ক'রে এসেছে। সেই জন্য কখনও তাকে অঙ্কুশে ক্লিষ্ট, কখনও বা খোসামোদে তুষ্ট কর্তে হ'য়েছে। কারণ আদিকাল থেকে একাল পর্য্যন্ত কোনও 'পলিটিশ্যানের পলিটিক্যাল

খেলা' এ দেবতাটির সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয়নি। অথচ সে সাহায্য পেতে হবে বিশেষ খরচের মধ্যে না গিয়ে। অর্থাৎ গণদেবতার পূজায় ভোগের উপকরণের দৈন্য সকলেই মন্ত্রের বহরে পূরণ করেছে ;—'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা,' 'গণবাণীই ভগবদ্বাণী,' 'সুরাজ থেকে স্বরাজ শ্রেষ্ঠ,' 'জননায়ক হচ্ছে জনসেবক,' ইত্যাদি। এবং সকলেই 'লম্বোদর গজেন্দ্রবদনে'র সৌন্দর্য্যবর্ণনায় শ্লোক রচনা ক'রে তাকে তোষামোদে খুসি করেছে।

যারা গণদেবতাকে খোসামোদে ভুলিয়ে নিজের কাজ হাঁসিল কর্‌তে চায় না, চায় ঐ দেবতাটির নিজের হিত—তাদের এ কথা মেনে নেওয়াই ভাল যে, এ দেবতার মানুষের শরীরের উপর গজমুণ্ডের কল্পনা একেবারে মিথ্যা কল্পনা নয়। কোন্ শনির কুদৃষ্টিতে এর নরমুণ্ড খ'সেছে সে ঝগড়া আজ নিরর্থক। কোন্ দেবতার শুভদৃষ্টি এর মুণ্ডকে মানুষের মাথায় পরিণত কর্‌বে, সেইটি জানাই প্রয়োজন। কারণ, খোসামুদেরা যাই বলুক, মানুষের কাঁধে হাতীর মাথা সুন্দর নয়, নিতান্ত অশোভন।

যে দেবতার সুদৃষ্টি এই অঘটন ঘটাতে পারে, তিনি হচ্ছেন বীণাপাণি, যিনি জ্ঞানের দেবতা। এক জ্ঞানের শক্তি ছাড়া গজমুণ্ডকে নরমুণ্ডে পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা আর কিছুরই নেই। সুতরাং গণদেবতার যারা হিতকামী, তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এই দেবতাটির মাথার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের তড়িৎ সঞ্চালন করা। জনসঙ্ঘকে সভ্যতার ভারবাহীমাত্র না রেখে, সভ্যতার ফলভোগী কর্‌তে হ'লে, প্রথম্ প্রয়োজন জনসাধারণকে জ্ঞানের শিক্ষায় শিক্ষিত করা।—আকাশে বিস্তৃত বিশ্ব ও তার জটিল কার্য্যকারণজাল, কালে প্রসৃত মানুষের বিচিত্র ইতিহাস, ও এই দেশ ও কালের মধ্যে বর্ত্তমান মানুষের গতি ও পরিণতির জ্ঞান, আজকের দিনের পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের, এক দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সম্বন্ধ, ধন উৎপাদন ও বিতরণের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এমন অদ্ভুত জটিল ও বহুবিস্তৃত হ'য়ে উঠ্‌ছে যে, অজ্ঞান জনসাধারণকে মাঝে মাঝে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে বুদ্ধিমান্ লোকের নিজের হিত খুব সম্ভব হ'লেও, জনসাধারণের হিত একেবারেই সম্ভব নয়। বাইরের পরামর্শে গড়া ঐ সব সাময়িক উত্তেজনার দল, সঙ্ঘের প্রকৃতি ও প্রয়োজনের অন্তর্দৃষ্টির অভাবে ক্রমাগত ভেঙ্গে যায় ; আর যতদিন টিকে থাকে, ততদিনও ঐ পরামর্শ-দাতাদের ক্রীড়নক হ'য়েই থাকে।

জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়ে তার নিজের হিতের পথ নিজেকে চিন্‌তে শেখান' কেবল বহুকষ্টসাধ্য ও অনেক সময়সাপেক্ষ নয়, ঐ দীর্ঘ ঘোরান' পথ ছেড়ে খাড়া সরল পথে তার হিতচেষ্টার প্রলোভন দমন করাও দুঃসাধ্য। এই নিরন্ন বঞ্চিত মানুষের দলকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে, কেবলমাত্র সংখ্যার জোরে তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করিয়ে দিতে কোন্ জন-হিতৈষীর না লোভ হয়! কিন্তু, মানুষের প্রকৃতি ও সমাজের গতির দিকে চেয়ে এ লোভ দমন কর্‌তে হবে। অজ্ঞান মানুষের খুব বড় দলও চক্ষুষ্মান্ মানুষের ছোট দলের বিরুদ্ধে অনেক দিন দাঁড়াতে পারে না। এবং পৃথিবীর সব দেশে যে অল্প-সংখ্যক লোক জনসাধারণের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থের বিরোধী মনে ক'রে তাকে চেপে রেখেছে, তারা আর যা-ই হোক, অতি কৌশলী ও বুদ্ধিমান্ লোক। এদের সঙ্গে লড়্‌তে হ'লে, ভেবে না বুঝ্‌লে একদিন ঠেকে শিখ্‌তে হবে যে, সরল পথই সোজা পথ নয়।

কিন্তু জনসাধারণের শিক্ষার এইটিই একমাত্র, এমন কি প্রধান প্রয়োজন নয়। জ্ঞান যে বাহুতে বল দেয়, জ্ঞানের তাই শ্রেষ্ঠ ফল নয়; জ্ঞানের চরম ফল যে তা' চোখে আলো দেয়। জনসাধারণের চোখে জ্ঞানের সেই আলো আন্‌তে হবে, যাতে সে মানুষের সভ্যতার যা'সব অমূল্য সৃষ্টি,—তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, তার কাব্যকলা,—তার মূল্য জান্‌তে পারে। জনসাধারণ যে বঞ্চিত, সে কেবল অন্ন থেকে বঞ্চিত ব'লে নয়, তার পরম দুর্ভাগ্য যে সভ্যতার এই সব অমৃত থেকে সে বঞ্চিত। জনসাধারণকে যে শেখাবে একমাত্র অন্নই তার লক্ষ্য, মনে সে তার হিতৈষী হ'লেও, কাজে তার স্থান জনসাধারণের বঞ্চকের দলে। পৃথিবীর যে সব দেশে আজ জনসঙ্ঘ মাথা তুল্‌ছে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচারেই তা' সম্ভব হয়েছে। তার কারণ কেবল এই নয় যে, শিক্ষার গুণে পৃথিবীর হালচাল বুঝ্‌তে পেরে জনসাধারণ জীবনযুদ্ধে জয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছে। এর একটি প্রধান কারণ সংখ্যার অনুপাতে জনসাধারণের সমাজে শক্তিলাভের যা' গুরুতর বাধা, অর্থাৎ সভ্যতালোপের আশঙ্কা, শিক্ষিত জনসাধারণের বিরুদ্ধে সে বাধার ভিত্তি ক্রমশই দুর্ব্বল হ'য়ে আসে। জনসাধারণের বিরুদ্ধে আভিজাত্যের স্বার্থের বাধা সভ্য-মানুষের মনের এই আশঙ্কার বলেই এত প্রবল। এই আশঙ্কার মধ্যে যা' সত্য আছে, তা' যতটা দূর হবে, জনসাধারণের শক্তিলাভের পথের বাধাও ততটা ভেঙ্গে পড়্‌বে। উদরসর্ব্বস্ব

গজমুণ্ডধারী গণদেবের অভ্যুত্থান স্বার্থান্ধ মানুষ ছাড়া অন্য মানুষের কাছেও বিপৎপাত ব'লেই গণ্য হবে। গণদেবতা যেদিন নরদেহ নিয়ে আস্‌বে, সেদিন তার বিজয়যাত্রার পথ কেউ রুখ্‌তে পার্‌বে না।

—অতুলচন্দ্র গুপ্ত

বাঙ্গালা সাহিত্য ও ছাত্রসমাজ

দীর্ঘ রাত্রির অন্ধকার যখন যাত্রীর মনকে নিরাশার গাঢ় আঁধারে ছাইয়া ফেলে, তখন পূব আকাশের ললাটে একটি ছোট শুকতারা কি তার ক্ষীণ আলোকে সেই পথিকের কল্পনার আশার তরুণ অরুণচ্ছবি আনিয়া দেয় না? ছাত্রগণ, বাঙগালার আকাশভালে যখন তোমাদের মত এতগুলি শুকতারা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তখন কেন না আমাদের চোখ আমাদের জাতীয় জীবনের সুপ্রভাতের ভাবী আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে? তোমাদের অধ্যয়ন-ক্লিষ্ট মুখে গৌরবের ভাব, তোমাদের চিন্তা-কুঞ্চিত ললাটে মহত্ত্বের রেখা, তোমাদের জাগরণ-ক্ষীণ চোখে প্রতিভার আলো, তোমাদের কষ্ট-সহিষ্ণু শরীরে সাধনার চিহ্ন—এ সব দেখিয়া মনে হয় তোমরা কোন অতীত যুগের রাজপুত্রের ন্যায় তোমাদের জন্মভূমির বহু যুগের দৈন্য ও পরতন্ত্রতার বেড়ী ভাঙিগয়া, তাহাকে মহত্ত্ব ও স্বতন্ত্রতার উন্মুক্ত রাজ্যে রাণীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে।

কেবল পশুবলে জগতের কোন জাতি বড় হইতে পারে নাই। কেবল অর্থবলে কেহ বড় হয় নাই। জগতের জাতীয় মণ্ডপে উচ্চাসন পাইতে গেলে চাই মস্তিষ্কের বল, যাহার বিকাশ সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে, আর চাই মনের বল, যাহার প্রকাশ চরিত্রে ও ব্যবহারে। বাঙগালার রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বাঙগালীর মনীষার পরিচয় গর্ব্বিত পাশ্চাত্ত্য জাতিকে দিয়াছেন। কিন্তু দুই একটি কোকিলে কি বসন্তের সৌন্দর্য্য আনিতে পারে? চাই আমরা সহস্র কোকিলের কলতান, যাহা জগতের শীতস্তব্ধ বক্ষে বসন্ত-যৌবনের অনন্ত উজ্জ্বল মধুর ভাব জাগাইয়া দিয়া বিশ্ববাসীর অনিচ্ছুক কর্ণকে ভারতের দিকে উৎকর্ণ করিবে। ভবিষ্যৎ ভারত অতীত ভারত অপেক্ষা বৃহৎ, মহৎ ও উজ্জ্বল

হইবে। ছাত্রবন্ধুগণ, তোমরা ভুলিও না—এই গুরু কার্য্যের ভার তোমাদেরই উপর ন্যস্ত।

আমি এস্থলে অন্য কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল সাহিত্যের কথা বলিব। জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে জাতীয় উন্নতি সাহিত্যের উন্নতির চিরসাথী। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সম্বন্ধে যে কথা, মধ্য যুগের আরব, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড সম্বন্ধে সেই কথা, বর্ত্তমান যুগের জার্ম্মাণী ও রুষিয়া সম্বন্ধেও সেই একই কথা,—সাহিত্যের উন্নতি ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি হয় না, কিংবা জাতীয় উন্নতি ব্যতিরেকে সাহিত্যের উন্নতি হয় না। এই জাতীয় উন্নতির প্রধানতম সহায় সাহিত্য। সহস্র বীরপুরুষের তরবারি যে কার্য্য করিতে পারে না, এক বাগ্মীর রসনা তাহা করিতে পারে এবং সহস্র বাগ্মীর রসনা যাহা করিতে পারে না, এক সাহিত্যিকের লেখনী তাহা করিতে পারে। অনৈতিহাসিকের নিকট কথাটা অত্যুক্তি-দোষাঘ্রাত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞ ইতিহাস ইহার অভ্রান্ত সাক্ষী। মাৎসিনির রসনায় কি ইতালির জাতীয় নব জীবনের সূত্রপাত হয় নাই? ভল্‌তেয়ার ও বিশ্বকোষকারগণের নিবন্ধমালা কি ফরাসী দেশে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নবভাব আনিয়া দেয় নাই? আমাদের চোখের সম্মুখে নীট্‌শে ও মার্ক্‌স, গর্কি ও টলষ্টয় প্রভৃতির লেখনী কি জার্ম্মাণীতে ও রুষিয়ায় বহু যুগের উপাস্য ফেটিশকে চূর্ণ করিয়া জগতে স্বাধীনতা ও বিশ্বমানবতার নব উন্মাদনার সৃষ্টি করে নাই? নাই থাক আমাদের বাহুবল, নাই থাক আমাদের ধনবল, যদি আমাদের সাহিত্যশক্তি থাকে, তবে তাহা আলাদীনের প্রদীপের ন্যায় নিমেষে আমাদের ঈপ্সিতকে আমাদের পদতলে আনিয়া দিবে।

জাতীয় উন্নতির জন্য, জগতের সম্মুখে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য, অন্য সভ্য জাতির সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য আমাদের সাহিত্যকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইবে। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি ও পুষ্টিতে শরীরের শক্তি ও পুষ্টি, সমস্ত অঙ্গের সৌন্দর্য্যে আকৃতির সৌন্দর্য্য। তাই আমাদের সাহিত্যকে ষোল কলায় পূর্ণ করিতে হইবে। নচেৎ আমাদের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের আশা মরু-মরীচিকা মাত্র।

আমাদের জাতীয় মহত্ত্বের জন্য বিরাট্ বিশাল অনবদ্যাঙ্গ-মনোহর সাহিত্য-সৌধ রচনা করিতে হইবে। ভিত্তির ভাবনা করিতে হইবে না। চণ্ডীদাস,

কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীরাম, আলাওল প্রমুখ মহাজনগণ আমাদের সাহিত্যের বুনিয়াদ আগেই গড়িয়া গিয়াছেন। রামমোহন, কৃষ্ণমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, কালী-প্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, মসার্‌রফ হোসেন, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রামেন্দ্র-সুন্দর প্রভৃতি সুধীগণ কিছু গঠন আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বহু মনীষী এই সৌধ-রচনা-কার্য্যে দ্রুত-হস্ত হইয়াছেন। কিন্তু প্রাসাদের গঠনের জন্য যেমন রাজমিস্ত্রী চাই, তেমনি যোগানদারও চাই। ছাত্রবন্ধুগণ, আমাদের এই সাহিত্যের বালাখানা গড়িতে তোমাদিগকে এখন যোগানদার সাজিতে হইবে, কিংবা যোগানদারের যোগাড়ে' বনিতে হইবে। এখন পৃথিবীর সমস্ত জাতিই আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। আমাদের সাহিত্যরথীদের পিছু পিছু তোমাদিগকে সাহিত্যের পদাতিক বা সাহিত্যের কুলী হইতে হইবে। কোন্ সন্তান আছে, যে মাতৃভূমির গৌরবের জন্য ক্ষুদ্রতম কাজকে ঘৃণা করিবে? যদি কেহ করে সেই বাঙ্গালী অধম, সেই ঘৃণ্য, অতি ঘৃণ্য।

ছাত্রগণ, তোমাদের সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ; এখন তোমরা অনন্যকর্ম্মা, অনন্যমনা হইয়া ভাষার তিমির-খনি হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেছ। সেই সমস্ত নিজেরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া মাতৃভাষার পদে উপহার দাও, তোমরা ধন্য হইবে, মাতৃভাষাও বরেণ্যা হইবে। ছাত্রজীবনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে তোমরা যে কার্য্যের সূচনা করিবে, তাহা কালে রত্নপ্রসূ হইবেই।

বলা বাহুল্য, আমাদের জাতীয় সাহিত্য আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালাতেই হইবে। যে পর্য্যন্ত আমরা ইংরাজি প্রভৃতি বিদেশী ভাষায় হাসিতে, কাঁদিতে, চিন্তা করিতে, স্বপ্ন দেখিতে না শিখিব, যদি তাহা সম্ভব হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মাতৃভাষা বাঙ্গালাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা থাকিবে। কোন জাতি কেবল বিদেশী ভাষার চর্চ্চায় কখন বড় হইতে পারে নাই। ইউরোপ যখন লাটিন ছাড়িয়া দেশী ভাষা ধরিয়াছিল, তখন হইতেই ইউরোপের অন্ধকার যুগের অবসান হইয়া আধুনিক উজ্জ্বল যুগের আরম্ভ হইয়াছে। যে দিন ইংল্যাণ্ড নর্ম্মানফ্রেঞ্চ ত্যাগ করিয়া তাহার এক সময়ের ঘৃণিত সাক্‌সন ভাষাকে বরণ করিয়া লইল, সেইদিন ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনের তথা উন্নতির সূত্রপাত হইল। যখন হইতে জার্ম্মাণী ফরাসী ভাষার মোহপাশ কাটিয়া তাহার মাতৃভাষাকে পূজার স্থান দিল, তখন হইতে জার্ম্মাণীর জাতীয় উন্নতির আরম্ভ হইল।

সাহিত্যের দুই একটি শাখা বিদেশী মাটিতে টিকিতে পারে ; কিন্তু সমগ্র সাহিত্য বিদেশী আবহাওয়ায় সহজে বাঁচিবে না। রোমান যুগের পরবর্ত্তী কালের ইউরোপের বিপুল লাটিন সাহিত্য কোথায়? আমাদের দেশেই পাঠান ও মোগলযুগের পারসীনবীশদের সে সব কেতাব কোথায়? কয়জন মিলটনের সেই তেজস্বিনী লাটিন কবিতা এখন পড়ে? বঙ্কিমের Rajmohan's Wife -এর কিংবা মাইকেলের The Captive Lady র সন্ধান গ্রন্থকীট ব্যতীত এখন কে আর রাখে? সাহিত্যসাধনা যদি সম্পূর্ণরূপে সার্থক করিতে চাও, তবে তোমাকে মাতৃভাষার ভিতর দিয়া সাহিত্য রচিতে হইবে।

ছাত্রগণের অনেকের বিশ্বাস, অন্ততঃ কার্য্যতঃ পরিচয় পাই, যেন বাঙগালা ভাষা মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে বাঙগালীর আয়ত্ত হয়, যেন তাহার জন্য কোন সাধনার, কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। কেবল গলার স্বর থাকিলেই কি কেহ সুগায়ক হইতে পারে? না, একটা যন্ত্র হাতের কাছে থাকিলেই যে-সে সুবাদক হইতে পারে? যেমন সুগায়ক, সুবাদক হইতে বহু পরিশ্রম করিতে হয়, তেমনি সুলেখক হইতে গেলে এই ছাত্রজীবন হইতেই রীতিমত রচনা অভ্যাস করিতে হইবে। অবান্তররূপে বলিতে গেলে, আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে পর্য্যন্ত না বিদ্যালয়সমূহে ইংরাজি সাহিত্যের ন্যায় বাঙগালা সাহিত্যের রীতিমত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইবে সে পর্য্যন্ত বাঙগালা ভাষার উন্নতি হইবে না।

ছাত্রগণ বাঙগালা সাহিত্যের জন্য কি করিতে পারে, আমি এক্ষণে মোটামুটি-ভাবে তাহা বলিতে ইচ্ছা করি। আমাদের চাই The New Oxford Dictionary র ন্যায় একটি ঐতিহাসিক প্রণালীক্রমে সজ্জিত অভিধান, ইহার জন্য সমস্ত প্রাচীন মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুঁথির শব্দসূচি করিতে হইবে। The New Oxford Dictionaryর জন্য বহু সহস্র স্বেচ্ছা-শব্দ-সংগ্রাহক হইয়াছিল, আমাদের জন্য কি একশত স্বেচ্ছা-সাহিত্যসেবক পাওয়া যাইবে না?

বাঙগালা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে কিরূপ উচ্চারণ প্রচলিত আছে, সংগ্রহ করিতে পারিলে, বাঙগালীর জাতিতত্ত্বের ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। ছাত্রগণ ব্যতীত কে এই আপাত-নীরস কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে?

বাঙগালায় জাতীয় ইতিহাস একটি বাঞ্ছিত পদার্থ। ইতিহাসের উপকরণ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভগ্নস্তূপরূপে, প্রাচীন মন্দির-মসজিদরূপে বা দীঘি ইত্যাদি প্রাচীন কীর্ত্তিরূপে কিংবা লোকমুখে ছড়া ও কিংবদন্তীরূপে

ছড়ানো রহিয়াছে। মাণিকচাঁদ রাজার গান লোকমুখ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। ইতিহাসের এই সমস্ত উপকরণ-সংগ্রহের ভার ছাত্রগণ লইলে, অল্প সময়ের মধ্যে আমরা জাতীয় ইতিহাস-রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারি।

ঠাকুরমা ও দিদিমার মুখে মুখে এখনও কত উপকথা, হিঁয়ালি, মেয়েলি ব্রতকথা ও ছড়া রহিয়াছে। আধুনিক শিক্ষার কর্ম্মনাশা শক্তিতে আশংকা হয় শীঘ্রই এ সমস্ত লোপ পাইবে, অথচ এই সমস্ত নৃতত্ত্বের আলোচনায় একটি বিশেষ সহায়। ছাত্রগণ ব্যতীত কে এই কাজ করিবে? ইউরোপের বহু স্থানে Folk Lore Society আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালা দেশে ইহার আলোচনা একেবারেই নাই।

তারপর পুঁথি-সংগ্রহ ও সন্ধান। সাহিত্য-পরিষদের ও প্রাচীন-সাহিত্যামোদী মহোদয়গণের চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এখনও বহু পুঁথি বাঙ্গালার নিভৃত কোণে গুপ্ত রহিয়াছে। বাহিরের লোকের পক্ষে তাহার দর্শন পাওয়া দূরে থাক, সন্ধান পাওয়াই সুদুরূহ। ছাত্রগণ নিজেদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে অনুসন্ধান করিয়া অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে।

এইরূপ বহু কাজ আছে যাহার জন্য ছাত্রসমাজের প্রয়োজন। এইজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ছাত্রগণের জন্য এক বিশেষ শাখা আছে এবং তাহাদের জন্য অনেক সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জাতির আশা-ভরসা ছাত্রদেরই উপর। ছাত্রবন্ধুগণ, তোমরা আমাদের আশা পূর্ণ করিবে? না, আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সুপ্রভাতের জন্য অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে কাতরনেত্রে প্রতীক্ষা করিব? বহুকাল প্রতীক্ষা করিতেছি। বল, আর কত কাল? আর কত কাল?

—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

রূপকথা

১

রূপকথা বা উপকথা—কোন্‌টি ব্যাকরণসম্মত শুদ্ধরূপ তাহার বিচার বৈয়াকরণরা করিবেন। কিন্তু এই দুইটি নামের অন্তরালে দুই বিভিন্ন প্রকারের মনোভাবের, দুই বিভিন্ন চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। উপকথা নামটির পিছনে একটি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব আত্মগোপন করিয়া আছে বলিয়া অনুভব করা যায়—নকলের প্রতি আসলের, মেকির প্রতি খাঁটির, নীচের প্রতি উচ্চের যে অবজ্ঞা সেই ভাব। কোন গুরুগম্ভীর বয়স্ক লোক শিশুদের খেলা দেখিয়া যে একপ্রকার সহানুভূতিমিশ্র নাসিকাকুঞ্চন করিয়া থাকেন, উপকথার উপর সাংসারিক লোকের যেন সেই প্রকারের নাসিকা-কুঞ্চন। পক্ষান্তরে রূপকথা নামটির চারিধারে একটি রহস্যঘন মাধুর্য, একটি ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোর বেষ্টন করিয়া আছে। নামটি আমাদের হৃদয়ের গোপন কক্ষে গিয়া আঘাত করে ও সেখানকার সুপ্ত নামহীন বাসনাগুলির মধ্যে একটা সাড়া জাগাইয়া দেয়। সমালোচক বোধ হয় উপকথা নামটিই পছন্দ করিবেন; কিন্তু রস-পিপাসু পাঠক যে রূপকথা নামটির পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজকাল সাহিত্যে যে নানাদিক দিয়া পুরাতন কালের সুরটি ধরিবার চেষ্টা করা হইতেছে, উপেক্ষিতকে অতীতের আঁধার গুহা হইতে সূর্যালোকে টানিবার আয়োজন হইতেছে, কুণ্ঠিত, সংকুচিত গ্রাম্য-সাহিত্যের অবগুণ্ঠন-মোচনের প্রয়াস চলিতেছে, তাহার প্রভাব রূপকথার উপরও বিস্তৃত হইয়াছে। এই অতীতে প্রত্যাবর্তন সকল দেশের সাহিত্যেরই একটা সনাতন রীতি। ইংরেজী সাহিত্যেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অতীতে প্রত্যাবর্তন, মধ্যযুগের পল্লীগাথার রসাস্বাদন-চেষ্টা একটা নূতন যুগের সূত্রপাত করিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে এই অতীতের প্রতি মোহের কতকগুলি গূঢ় কারণ আছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ, বর্তমানের তীক্ষ্ণ, জটিল সমস্যা হইতে একটা পলায়নের উপায় আবিষ্কার. তাহার শত নাগপাশের বেষ্টন হইতে আত্মমোচনের

চেষ্টা। অতীতের সরল, সমস্যা-বিরল, মুক্ত বায়ু আমাদের প্রশ্নসংকুল জীবনকে অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের মত রক্ষণশীল জাতির পক্ষে জাতীয়ত্বের গোপনমন্ত্র ও মূলরহস্য অতীতের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে ; সুতরাং এই নব জাগরণের দিনে, যখন আমরা আমাদের যথার্থ স্বরূপ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, তখন এই অতীতেরই কোন অন্ধকার, অব্যবহৃত কক্ষে সেই বিস্মৃত রত্নের অন্বেষণের বিবরণ কেবল যে একটা নূতন ধরণের সাহিত্যিক খেলা তাহা নহে, একটা পবিত্র কর্তব্যও বটে। সেইজন্য অতীতের মন্দিরতলে দুইদল সম্পূর্ণ বিভিন্ন-প্রকৃতির লোক যাইয়া সমবেত হইতেছে;—এক স্বপ্ন-প্রবণ বিরাম-বিলাসীর দল অতীতের মধ্যে শান্তি-কুঞ্জ রচনা করিতেছে ; আর এক উৎসাহী অনুসন্ধিৎসুর দল তাহাদের সমস্ত কৌতূহলের সহিত তাহার কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া নিজেদের নষ্ট কোষ্ঠীর উদ্ধারসাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে।

এই প্রবল কৌতূহলের ধারা রূপকথাকেও ঠাকুরমার মুখ ও নিভৃত গৃহকোণ হইতে ছিনাইয়া আনিয়া সাহিত্যের প্রকাশ্য দরবারের এক প্রান্তে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে এবং আধুনিক সমালোচকেরা সম্পূর্ণ সাহিত্যিক আদর্শে ইহার বিচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু রূপকথাকে প্রকৃত সাহিত্যের নিয়মে বিচার করিলে ইহার প্রতি অবিচারই করা হইবে। আধুনিক সাহিত্যের আদর্শে ইহা গড়িয়া উঠে নাই, আধুনিক সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও গঠনপ্রণালীও ইহার ছিল না। ইহার সমস্ত মাধুর্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহাকে জন্মমুহূর্তের আবেষ্টনের মধ্যে ফেলিয়া দেখিতে হইবে। বর্ষণমুখর রাত্রি; স্তিমিতপ্রদীপ গৃহ ; অন্ধকারে গৃহকোণে আলোছায়ার লীলা-চঞ্চল নৃত্য ; সর্বোপরি কল্পনা-প্রবণ, আশা-আশংকা-উদ্বেল শিশুহৃদয় ; এবং ঠাকুরমার স্নেহসিক্ত, সরস, তরল কণ্ঠস্বর ; এই সকলে মিলিয়া যে একটি অনুপম মায়াজাল, যে একটি রহস্যের ঐক্যতান সৃষ্টি করে, তাহা ষ্টীলের কলমের মুখে, ছাপার বইএর পাতায় ও সাহিত্য-ব্যবসায়ীর শিক্ষিত রুচির নিকট ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। শিশুচিত্তের উপরে ইহার অনুপম প্রভাব বুঝিতে হইলে আগে শিশুর মনোজগতের কতকটা পরিচয় থাকা চাই। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি—যাঁহার মনে সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে সীমারেখা সুস্পষ্টভাবে টানা হইয়া গিয়াছে, যিনি সংসারে প্রাপ্য-অপ্রাপ্যের মধ্যে ভেদ করিতে শিখিয়াছেন, যাঁহার নিকট পৃথিবী আপনার সম্পূর্ণ রহস্যভাণ্ডার নিঃশেষে উজাড় করিয়া

দিয়াছে,—তাঁহার ইহার মধ্যে প্রকৃত রসের সন্ধান না পাইবারই কথা। শিশুর মনের গোপন কোণে যে পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমাট হইয়া আছে তাহাতে পৃথিবীর সমুদয় রহস্য যেন নীড় রচনা করে ; তাহার চিন্তাকাশে যে কুহেলিকা ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহাতে অন্ধকারে তারার মত, নানাবর্ণের আকাশ-কুসুম ফুটিয়া থাকে। পৃথিবীর দানশীলতার শেষ সীমা সম্বন্ধে এখনও তাহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে নাই ; নানারূপ সম্ভব-অসম্ভব আশা-কল্পনার রঙীন নেশায় সে সর্বদা মশ্‌গুল। রূপকথা তাহার সম্মুখে একটি দিগন্ত-বিস্তৃত, বাধাবন্ধহীন কল্পনারাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহার সংসারানভিজ্ঞ মনের স্বচ্ছন্দ ভ্রমণের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচনা করে। রূপকথার সৌন্দর্যসম্ভার তাহারই জন্য, যে পৃথিবীর সংকীর্ণ আয়তনের মাঝে নিজ আশা ও কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে নাই।

২

রূপকথার বিরুদ্ধে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রধান অভিযোগ—ইহার অলীকতা ও অবাস্তবতা। অবশ্য, বাস্তব না হইলেই যে কাহারও পৃথিবীতে স্থান নাই, এ কথা কেহ বলেন না। সংসারে অবাস্তবেরও একটা প্রয়োজন আছে। মাটির সহিত যোগ না থাকিলে, মাটিতে শিকড় না গাড়িলেই, আমাদের দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কে না আসিলেই কাহাকেও এই সুন্দর পৃথিবী ও মানব-মন হইতে নির্বাসিত করা যায় না। নীল আকাশ অবাস্তব হইলেও ইহা শত নিগূঢ় বন্ধনে আমাদের বাস্তব জীবনের সহিত আপনাকে জড়াইয়া রাখিয়াছে। ইহা আমাদের তুচ্ছ, বিড়ম্বিত জীবননাটকের উপর সমুজ্জ্বল চন্দ্রাতপের মত বিস্তৃত ; ইহা আমাদের উগ্র কল-কোলাহলের উপর এক স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয় ; ইহার ঘন নীলরূপের দিকে চাহিয়া আমাদের উদ্ধত বিদ্রোহ ও অশান্ত প্রকৃতি মাথা নত করে। সুতরাং ইহাকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিলে মানব-মন তাহার অনেকটা সৌন্দর্য ও উদারতা হারায়। সেই হিসাবে রূপকথারও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে রূপকথা অবাস্তব নহে, উহা একটা বাস্তবতার দৃঢ়

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বা যে শক্তি আমাদিগকে জীবনের বাস্তব প্রয়োজন মিটাইতে প্রেরণা দেয়, তাহাই যে একমাত্র বাস্তব তাহা নহে। আমাদের মনের সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসকল, যাহারা মুহূর্তমাত্র হৃদয়ে উঠিয়া পরমুহূর্তেই বিলীন হয়, যাহারা আমাদের বাহ্য-জীবনে কোনরূপ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে না ও যাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা নিজেরাই প্রায় অচেতন, তাহারাও মনের একটা অবিসংবাদিত ক্রিয়া বটে, এবং তাহারাও বাস্তবতার দাবী করিতে পারে। সুতরাং রূপকথা আমাদের প্রাণে যে অস্পষ্ট আবেগ, যে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যে আপাত-অসম্ভব আশা-কল্পনা জাগাইয়া তোলে তাহারা যে অবাস্তব, আমাদের সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, একথা বলিতে পারি না। তাহারা এখন অপরিস্ফুট অবস্থায় আছে, কিন্তু স্ফুটতাই বাস্তবতার একমাত্র লক্ষণ নহে।

রূপকথা কতকগুলি অসম্ভব বাহ্যঘটনার ছদ্মবেশ পরিয়া আমাদের মনের সহিত ইহার প্রকৃত ঐক্যের কথা গোপন রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হইবে। বাস্তব জগতে যে শক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান করি, রূপকথার রাজ্যেও সেই মানব-মনের আদিম, সনাতন নীতিরই আধিপত্য। সেই পরিপূর্ণ সুখের সন্ধান, সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি-লাভ, সেই সৌন্দর্য-পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি, সেই আশাতীত শক্তি-সম্পদ্-লাভ, পাপপুণ্যের জয়-পরাজয়—পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন জিনিষই এই নূতন রাজ্যের অধিবাসী। পৃথিবীর চিরপরিচিত মূর্তিগুলিই একটু অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া, কল্পনার দ্বারা সামান্যমাত্র রূপান্তরিত হইয়া রূপকথার রাজ্যের অলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে সব রাক্ষস-খোক্ষস আমাদের পথরোধ করে, তাহারা আমাদের পার্থিব বাধা-বিঘ্নেরই একটা রূপান্তরিত সংস্করণ মাত্র; যে অনুকূল দৈব বেংগমা-বেংগমীর রূপে সেই-সমস্ত রাক্ষস-খোক্ষসের মৃত্যুরহস্য আমাদিগকে শিখাইয়া দেন, তিনি যেন অযাচিত সাহায্যের দ্বারা এই পৃথিবীতে তাঁহার কার্পণ্য-কলঙ্কের ক্ষালন করেন এবং তাঁহার উপেক্ষার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে যে একটা গূঢ় অভিমান পোষণ করি, তাহার কথঞ্চিৎ অপনোদন করিতে প্রয়াস পান। সাতসমুদ্র তের নদীর পারে বিজন রাক্ষসপুরে যে রাজকন্যা প্রবাল-পালঙ্কে নিদ্রামগ্না থাকেন, তিনি আমাদের গোপন অন্তঃপুরশায়িনী

প্রেয়সী ; যে বাধাবিপদের মধ্য দিয়া রূপকথার রাজপুত্র নিজ প্রিয়াকে লাভ করেন, তাহা আমাদের বর্তমান বণিক্‌ধর্মী বিবাহের উপর আমাদের অন্তঃস্থ আদর্শ প্রেমিকের অভিমানক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস মাত্র। পাতালপুরে নাগকন্যার প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে আমরা এই চিরপরিচিত পৃথিবীর স্পর্শ অনুভব করি এবং তাহার মণিমাণিক্য-দীপ্ত কক্ষের মধ্যেও এই নিত্যসহচর, পরিচিততম সূর্যালোকের দর্শন পাই।

৩

এই রূপকথার রচয়িতার কোন নামকরণ হয় নাই। সমস্ত লৌকিক সাহিত্যের ন্যায় এখানেও লেখক একটি সমগ্র জাতির পশ্চাতে আত্মগোপন করিয়া আছেন, এখানে ব্যক্তিবিশেষের কোন কথা নাই ; সমস্ত জাতিরই প্রাণের কথা, অন্তরতম আশা-আকাঙ্ক্ষা ইহাতে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন সাহিত্যের ইহা একটি অদ্ভুত গুণ। মহাকাব্যের বিশাল দেহে অনেক নামহীন লেখক নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মিলাইয়া দিয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন ; যেন জাতির আত্মা বৃন্তহীন পুষ্পসম 'আপনাতে আপনি বিকশি'ত হইয়া উঠিয়াছে, স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের অপেক্ষা রাখে নাই। লৌকিক গানে-গাথায়ও সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অভাব লক্ষিত হয় ; যেন জাতি তাহাদের রচয়িতাকে সম্পূর্ণরূপে অবসর দিয়া সেগুলিকে একেবারে খাস সম্পত্তি করিয়া লইয়াছে। রূপকথার রাজ্যেও সেই একই নিয়ম—কোথাও লেখকের নিজের এতটুকু কোন ছাপ নাই, সর্বত্র একটা উদার, বিশাল, অনাসক্ত ভাবের লক্ষণ সুপরিস্ফুট। রাজা-রাজড়ার কথা ইহার বিষয়-বস্তু হইলেও সাধারণ লোকের যে ক্ষীণ, সাময়িক সংকেত ইহাতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞার লেশমাত্র চিহ্ন নাই। রাজপুত্র কখনও কখনও বিপদে পড়িয়া দরিদ্রের কুটীরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন ও তাহাদের দ্বারা পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইয়াছেন। তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য যখন উদিত হইয়াছে, তখন তাহার কিরণ হইতে তাঁহার দরিদ্র উপকারকও বঞ্চিত হয় নাই। সর্বত্রই একটা সাম্য-শান্তির ভাব ; সমাজের সঙ্গে লেখক এমন সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার নিজ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ভাষা একেবারে মৌন হইয়া আছে।

আমাদের বঙ্গদেশের সামাজিক ব্যবস্থা ও বিচারের কি এক সম্পূর্ণ ছবি এই রূপকথার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে! ইহার রচনার কাল সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ হইলেও ইহা নিঃসংশয়িতভাবে বলা যায় যে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ সমাপ্ত হইবার পর ইহার জন্ম। সমস্ত রূপক ও বর্ণনা-বাহুল্যের অন্তরালে আমাদের বঙ্গদেশের পরিবার ও সমাজের একটি নিখুঁত ছবি ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের বহুবিবাহ, আমাদের গৃহের সপত্নী-বিরোধ, সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচার, রূপসী প্রণয়িনীর মোহ ও পরিশেষে সেই মোহভঙ্গ, আমাদের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি কল্পনার উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়। রাজপুত্র শ্বেতবসন্তের কাহিনী যখন কথয়িত্রীর করুণার্দ্র, অশ্রুতরল কণ্ঠে কথিত হয়, তখন শিশুর ত কথাই নাই, কোন বয়স্ক ব্যক্তিও বোধ হয় অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না। এই গল্পের উপর রামায়ণের ছায়াপাত হইলেও ইহার একটি নিজস্ব অনুপম মাধুর্য ও সৌন্দর্য আছে ; ইহার অন্তর্নিহিত, গভীর, করুণ রস সরল, শব্দাড়ম্বরহীন ও সাহিত্যিকতা-বর্জিত ভাষার সাহায্যে প্রবাহিত হইয়া আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্যন্ত দ্রবীভূত করে। এই রূপকথার মধ্যে আমাদের সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও পারিবারিক সমস্যা এমন একটা আদর্শ শান্তি ও কল্পিত সমাধানের মধ্যে পর্যবসিত হয় যাহা বাস্তব জীবনে একান্ত সুদুর্লভ এবং যাহার অভাব আমাদের সমস্ত জীবনপ্রবাহে একটা অব্যক্ত-মধুর, অবিচ্ছিন্ন করুণ মর্মর জাগাইয়া তোলে। এইরূপে রূপকথা বাস্তবজীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করিয়া তোলে, নিষ্করুণ দৈবের বিচার উল্টাইয়া দেয় ; এবং মানুষ নিজের ভাগ্যবিধাতা হইলে কিরূপ পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তির মধ্যে আপনার ত্রুটিবহুল ও ভ্রমসংকুল জীবননাট্যের উপর শেষ যবনিকাপাত করিত তাহার সুস্পষ্ট আভাস দেয়।

৪

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে রূপকথার বিরুদ্ধে যে অবাস্তবতার অভিযোগ আনা হয় তাহার বিশেষ কোন ভিত্তি নাই। এখন রূপকথা আমাদের জীবনের উপর কিরূপ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে তৎসম্বন্ধে সামান্য কিছু

আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কবি-প্রতিভার অধিকারী তাঁহারা অনেকে অনেক সময় এই রূপকথার নিকট তাঁহাদের কল্পনার উন্মেষ সম্বন্ধে প্রথম সাহায্য লাভ করেন। রূপকথার দিগন্ত-বিস্তৃত তেপান্তরের মাঠ দিয়াই তাঁহারা প্রথম কল্পনার অশ্ব ছুটাইয়া দেন ও প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া অজ্ঞাতের রাজত্বে প্রথম পদক্ষেপ করিতে শিখেন। সেখানকার মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি তাঁহাদের সুপ্ত সৌন্দর্যবোধ ও কবিত্বশক্তিকে জাগাইয়া তোলে। যে দেশে জীবনে বৈচিত্র্য ও বর্ণসুষমার একান্ত অভাব, যেখানে শান্তশিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে কোনপ্রকার দুঃসাহসিকতার অবসর থাকে না, সেখানে অনেক সময় এই রূপকথার খোলা জানালা দিয়াই আমরা বিচিত্র কল্পলোকের পরিচয় লাভ করি ও 'বিপুল সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরী' আমাদের কর্ণপথে ধ্বনিত হয়। অনেক ইংরেজ কবি রূপকথার প্রতি তাঁহাদের ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার আত্মজীবন-কাহিনীতে এই লৌকিক গল্প কিরূপে তাঁহার কল্পনা-শক্তিকে উন্মেষিত করিয়াছিল, কিরূপে ইহার সাহায্যে তিনি প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতা ও সংকীর্ণতা অতিক্রম করিয়া এক বিশালতর রাজ্যে স্বচ্ছন্দভ্রমণের সুখ অনুভব করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের রবীন্দ্রনাথও তাঁহার 'শিশু' নামক কাব্যে শিশুচিত্তের উপর রূপকথার এই মায়াময় স্পর্শটি সজীব করিয়া তুলিয়াছেন।

আর আমাদের মধ্যে যাঁহারা কবিত্ব-সৌভাগ্যের অনধিকারী তাঁহারাও ইহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহেন। মানুষের সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সত্ত্বেও তাহার অন্তরে একটি কুহেলিকাময় প্রদেশ আছে, যাহা হইতে তাহার সমস্ত রঙীন, অসম্ভব কল্পনার আলোক বিচ্ছুরিত হয়, যাহা সমস্ত তর্ক-যুক্তি-বাস্তবতার প্রভাব অতিক্রম করিয়া তাহার মনে একটি ছায়াস্নিগ্ধ স্থায়ী কল্পনালোক রচনা করে। প্রত্যেকেই তাহার প্রাত্যহিক, নীরস, যন্ত্রবদ্ধ কাজের অবসরে এই কল্পলোকে, এই কল্পনার দুর্গে ক্ষণিক আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানে বসিয়াই সে আকাশকুসুম চয়ন করে ও শূন্যে প্রাসাদ-নির্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করে। আমাদের জীবনে যাহা কিছু অপ্রাপ্য, যাহা কিছু দুর্বোধ ও রহস্যময়, যাহাই আমাদের উন্মুখ আশাকে 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ'রূপে আকর্ষণ করে,—সেই সকলই আমাদের অন্তরের কল্পলোক-রচনায় সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু ইহার প্রথম ভিত্তি-স্থাপনের প্রশংসা রূপকথারই প্রাপ্য। রূপকথারাজ্যের যে

মেঘখণ্ড আমাদের শিশু-অন্তরের গোপন স্তরে প্রথম সঞ্চারিত হয়, তাহাই পরবর্তী জীবনের রহস্যবোধকে, তাহার সমস্ত আলো-ছায়া-ঘেরা বিচিত্রতাকে আমাদের অন্তরের অন্তঃপুরে বরণ করিয়া আনে ; এবং সেই সঞ্চিত মেঘরাশির চতুর্দিকেই আমাদের কল্পনার বিদ্যুদ্বিলাস স্ফুরিত হয়। শৈশবের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ মানব-হৃদয়ের সনাতন প্রবৃত্তি এবং এই প্রবৃত্তির বশে যখন আমরা সুদূর শৈশবের প্রতি উৎসুক-ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ করি, তখন তাহার সমস্ত ক্রীড়া-কৌতুক ও উচ্ছ্বাস-চাপল্যের মধ্যে সেই বর্ষারাত্রের রূপকথার নিবিড় মোহময় স্মৃতি আমাদের অন্তরে শুকতারার ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে ও আমাদের বৈচিত্র্যহীন প্রৌঢ়জীবনের উপরও তাহার মায়াময় ইন্দ্রজাল সংক্রামিত করে।

—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতি-সমন্বয়ের অগ্রদূত—আল্-বেরুনী

(বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও সভ্যতার মধ্যে সংস্কৃতিগত সমন্বয়, মিলন, ঐক্য ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য এক শ্রেণীর সুধীমণ্ডলী যে চেষ্ঠা করিতেছেন তাহা যে সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না, তাহার মূল কারণ সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের প্রকৃত জ্ঞানেব অভাব, এবং ব্যাপারটিকে উদারভাবে দেখিবার ও বুঝিবার মত দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি একই বস্তু। যতগুলি ধর্ম্ম আছে, ততগুলি সংস্কৃতিও আছে। আপন আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাকে লোকে যেমন অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মনে করে, সংস্কৃতিকেও সেই ভাবে দেখিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে; সংস্কৃতি ধর্ম্ম হইতে আলাদা বস্তু। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক জগতের বস্তু ; কিন্তু সংস্কৃতি পার্থিব

জগৎকে লইয়া। মানবীয় আচার-পদ্ধতি, শিক্ষাদীক্ষা, মানসিক উন্নতি, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব—এই সবের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব মনোভাবই হইতেছে সংস্কৃতি। জাতির সর্ব্ববিধ বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চরমতম পরিণতি হইতেছে তাহার সংস্কৃতি। এ কথা সত্য যে, ধর্ম্মের আদর্শ সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতি ও ধর্ম্ম একই বস্তু নহে। সেই জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয়-সাধন যতই কঠিন বোধ হউক না কেন, বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধন কঠিন ত নহেই, বরং যুগে যুগে প্রত্যেক দেশেই তাহা হইয়া আসিতেছে। ইহার জন্য দরকার প্রকৃত জ্ঞান ও উদার মনোভাব।

(ভারতবর্ষ ও গ্রীস এই দুইটি অতি প্রাচীন সভ্য দেশ।) এই দুইটি দেশের মধ্যে নানা বিষয়ে সংস্কৃতিগত সমন্বয় ও মিলনের চেষ্টা হইয়াছিল, সে প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। পিথাগোরাস্ হইতে আরম্ভ করিয়া (অথবা তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে) মেগাস্থিনিসের যুগ পর্য্যন্ত কতভাবে আর্য্য ও গ্রীক সভ্যতার মধ্যে আদান-প্রদান হইয়া গিয়াছে। সেই ভাবে প্রাক্-ইস্‌লামের যুগ হইতে আরব ও ভারতের মধ্যে নানা বিষয়ে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উত্তর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ মৌলানা সৈয়দ সোলায়মান্ নদ্‌বীর "আরব ও হিন্দ কি তাআল্লুকাত্" নামক মূল্যবান্ পুস্তকে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ইস্‌লামের যুগেও বহু মুসলমান ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, রাজ্যবিজয়ের উদ্দেশ্যে নয়, এ দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে। দেশ-বিজয়ের বাসনা তাহার বহু পরে হয়। কিন্তু পৌত্তলিকতার বিরোধী মুসলমানগণ এ দেশের পৌত্তলিকতার প্রভাব দেখিয়া আর অধিকদূর অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা এ দেশের সংস্কৃতিকে অবহেলা করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন শত বৎসর এইরূপ অবহেলার মধ্যে চলিল। তারপর সুলতান মাহ্‌মুদের সময় একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি সেই ছিন্ন তার যোজনা করিয়া আবার মোহন সুরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইনি মহামনীষী পণ্ডিত আবু রয়হান্ আল্-বেরুনী। যে পথ এত দিন বন্ধ ছিল, মনীষী আল্-বেরুনী তাহা বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। আরব ও ভারতের মধ্যে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের জন্য তিনি সে যুগে যাহা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট চিরঋণী।

যে সব বিদেশী লেখক প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে আল্-বেরুনীকে আমরা অতি উচ্চাসন প্রদান করিতে পারি। পৃথিবীর এক প্রান্তে বসিয়া পাঁচ-দশখানা বই পড়িয়া অপর দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া তাহাকে নিজের প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল বলিয়া চালাইয়া দিবার দুঃসাহস অনেক লেখকের আছে। কিন্তু আল্-বেরুনী সে ধরণের লেখক ছিলেন না। তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা এ যুগেও দুর্লভ। একাদিক্রমে প্রায় বৎসর ভারতের ভাষা বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া, এ দেশের জনসাধারণ ও পণ্ডিত শ্রেণীর লোকের সহিত প্রাণখোলাভাবে মিলিয়া-মিশিয়া সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার এই বিরাট্ গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন ; এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও আরব দর্শন ও বিজ্ঞানের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার বিষয় অতি ব্যাপক—সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, গণিত, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি। এই সব বিষয় তিনি নিরপেক্ষ দর্শকের মত তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রচনার সব চেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত মতামতের আভাস খুবই কম আছে।

আল্-বেরুনীর জীবনবৃত্তান্ত খুব ঘটনাবহুল নহে। অতি সংক্ষেপেই তাহা বর্ণনা করিতেছি। তাঁহার পুরা নাম আবু রয়হান্ মহম্মদ ইব্‌নে আহ্‌মদ আল্-বেরুনী। মধ্য এসিয়ার খোওয়ারিজাম্ নামক রাজ্যে ৯৭৩ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বীয় পল্লীতে তিনি অল্প বয়সে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও গণিতবিদ্যা শিক্ষা করেন, এবং তথায় কিছু দিন শিক্ষকতা করিতে থাকেন। পরে ১০১৭ খৃঃ অব্দে উক্ত খোওয়ারিজাম্ রাজ্য সুলতান মাহ্‌মুদ অধিকার করেন। সেই সময়ে আল্-বেরুনী স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সুলতান মাহ্‌মুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তাহাতে তিনি সুলতানের কোপে পতিত হন। পরে সুলতান তাঁহাকে বন্দী করিয়া ভারতে প্রেরণ করেন। তিনি বাধ্য হইয়া ভারতে যে ভাবে জীবন-যাপন করিতেছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া দুষ্কর। কারণ, তাঁহার লিখিত বিবরণে তিনি অপরের সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছিলেন, নিজের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই বলেন

নাই। ভারতে অবস্থানকালে তাঁহাকে যত্রতত্র যাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিত ও সাধুদের সহিত মিলিবার ও মিশিবার অনুমতি তিনি পাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর। অবসরসময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখিতে লাগিলেন ; এবং কয়েক বৎসর বিশেষ পরিশ্রম করিয়া তিনি হিন্দু বিজ্ঞান, দর্শন, ব্যাকরণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ ও গণিতবিদ্যা শিখিয়া ফেলিলেন ; এবং সেই শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দ্বারা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে কয়েকখানা মূল্যবান্ পুস্তক লিখিলেন।

ইতিপূর্ব্বে যে সব মুসলমান লেখক হিন্দুদের ধর্ম্ম, সামাজিক ব্যবস্থা, দর্শন ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, আল্-বেরুনী যে তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহার রচিত গ্রন্থই সে পরিচয় প্রদান করিবে। তাঁহার "কিতাব আত্ তহকীক আল্ হিন্দ" একখানা বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, উহার সহিত ইস্লামিক দর্শন বিশেষতঃ সুফি মতবাদের বিশেষ পার্থক্য নাই ; অন্ততঃ মূলগত আদর্শ বিষয়ে। একজন নিরপেক্ষ দর্শকের মত তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখিলেন যে. হিন্দু মানসিকতার অধঃপতনের মূল কারণ উহাদের দর্শন বা শাস্ত্রের মধ্যে নাই। সাধারণের মধ্যে বিদ্যা-চর্চ্চা কমিয়া আসাতে পৌরোহিত্যের প্রভাব বৃদ্ধি পাইল এবং তাহা হইতে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ও স্ফুরণ আর হইল না। তিনি এই উক্তি কেবল হিন্দুদের বেলায় করেন নাই। তাঁহার মতে মুসলিম্ মানসিকতার অধঃপতনের মূল কারণ তুর্কি-প্রাধান্য-বৃদ্ধি।

ভারতবর্ষসম্বন্ধে পক্ষপাতবিহীন সঠিক বিবরণ লিখিবার প্রেরণা তিনি তাঁহার গুরু আবু সোহলের নিকট প্রাপ্ত হন। তিনি আল্-বেরুনীকে বলেন, ভারত-বিষয়ক এমন গ্রন্থ লিখিতে হইবে যাহাতে সত্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে। তাই মহাত্মা আল্-বেরুনী গুরুর আদেশ নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার "কিতাবুল হিন্দে"র মুখবন্ধে লিখিতেছেনঃ--"আমি হিন্দু ধর্ম্ম ও সভ্যতাসম্বন্ধে লিখিতে অগ্রসর হইলাম। তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অপ্রামাণিক অভিযোগ দিব না। আমি যদিও মুসলমান, তবুও তাহাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে যেমনভাবে দেখিয়াছি, ঠিক সেই ভাবে বর্ণনা করিতে কাতর হই নাই। তাহাদের ধর্ম্ম-নীতি যদিও ইস্লামের অনুরূপ নহে, তবুও তাহা কোনওরূপ রং ফলাইয়া লিখি নাই—ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তির ঘটনা-বর্ণনা মাত্র। ইহাতে আমার অতিরঞ্জন কিছুই থাকিবে না।"[১]

অনেক অহিন্দু প্রাচীন ভারতের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া বহু ভ্রমে পতিত হন। কারণ, তাঁহারা অনুবাদের অনুবাদ তস্য অনুবাদ পড়িয়া সাত নকলে আসল খাস্তা করিয়া দেন। দশম ও একাদশ শতাব্দীর ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহারা বলেন যে, ভারতের হিন্দুগণ বিভিন্ন জাতিতে এমন ভাবে বিভক্ত ছিল যে, তাহাদের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য ছিল না। কিন্তু শত পার্থক্যের মধ্যেও সমগ্র হিন্দু সমাজে একটা একজাতীয়তার ভাব ছিল, তীক্ষ্ণদর্শী আল্-বেরুনী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন যে, সেই একাদশ শতাব্দীতেও Hindus were a single people, one and undivided— হিন্দুরা একই অবিভক্ত জাতি ছিল। সত্য বটে, দেশে নানাবিধ দেবদেবীর পূজা আরাধনা ছিল, নানাবিধ দল ও উপদল ছিল, এবং দার্শনিক মতও নানা প্রকার ছিল। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? সমস্ত দল ও উপদল তাহাদের বিভিন্ন আদর্শ লইয়া পরস্পরের সহিত শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত পাশাপাশি বাস করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। উচ্চশিক্ষিত হিন্দুগণ দেবদেবীসম্বন্ধে সাধারণ লোক হইতে পৃথক্ ধারণা পোষণ করিতেন। দেবদেবীতে বিশ্বাস সাধারণের জন্য দরকারী মনে করিলেও তাঁহারা নিজেরা উহাতে প্রগাঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং তাঁহারা প্লেটোর মত বিশ্বাস করিতেন যে, God is in the singular number— "ঈশ্বর একবচনাত্মক আদর্শ।"

আল্-বেরুনীর মতে, হিন্দুদের বিভিন্ন দার্শনিকগণের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তাহা বাহ্যিক, মৌলিক নহে। তিনি সমস্ত মতবাদ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই সব মতবাদের মধ্যে একটা সাধারণ ভিত্তি আছে: রসায়ন, গণিত, বস্তুবিজ্ঞান, বিশ্ববিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা ছিল। ভ রতে প্রচলিত বিভিন্ন দেবদেবীকে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ উদারভাবে দেখিতেন। সেই জন্য এক দল অন্য দলের সহিত মতের জন্য যুদ্ধ করিত না। বিভিন্ন স্থানে সামাজিক আচার-ব্যবহার কিছু কিছু বিভিন্ন ছিল, কিন্তু সমগ্র দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও জীবন-সম্বন্ধে একই আদর্শ ছিল।

সে যুগের হিন্দুদের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া আল্-বেরুনী তাঁহাদের ত্রুটিবিচ্যুতির কথা লিখিতেও ভুলেন নাই। এক প্রকার দাসমনোভাব ধীরে ধীরে তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছিল। পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাহারা কাহারও সহিত জ্ঞানের আদান-প্রদান করিতে ইচ্ছুক ছিল না।

একটু গর্ব্বিত, একটু গোঁড়া ও নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা তাহাদের বৈশিষ্ট্য হইয়া পড়িয়াছিল। আর কেহ যে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে ইহা তাহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিল না।

হিন্দু সমাজের জাতিভেদ-প্রথাকে আল্‌-বেরূনী সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। তিনি উহাকে সমর্থন করেন নাই, তবে খুব ধীরভাবেই এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। জাতিভেদ-প্রথার জন্য দশম শতাব্দীর হিন্দু সমাজ দায়ী নহে। তাহারও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে উহার উৎপত্তি। আল্‌-বেরূনী এ কথাও বলিতে ভুলেন নাই যে, এই প্রকার জাতিভেদ-প্রথা অন্যান্য বহু দেশেও ছিল। পারস্যেও উক্ত প্রকার জাতিভেদ-প্রথা ছিল। হিন্দু ধর্ম্মের চরমতম বিকাশে জাতিভেদ-প্রথার স্থান নাই। কারণ, তখন ব্রাহ্মণ হিন্দুও শূদ্রের নিকট মাথা নত করে।

আল্‌-বেরূনী গীতোক্ত একটা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, গীতার এক স্থানে আছেঃ—ঈশ্বর জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দয়া বিতরণ করেন। যদি মানুষ সৎ কর্ম্ম করিতে গিয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, তবে তিনি সেই সৎকর্ম্মকে মন্দ বলিয়া ধরেন। এখানে একটা কথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, হিন্দু ধর্ম্মের এই প্রকার উদার ব্যাখ্যা বর্ত্তমান যুগের সংস্কারবাদী হিন্দু পণ্ডিতের কথা নয়। সেই দশম শতাব্দীতে যুক্তিবাদী ভিন্নদেশীয় মুসলমান দার্শনিক হিন্দু ধর্ম্মকে যে ভাবে দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা তাঁহারই অপক্ষপাতপূর্ণ গবেষণার ফল।

আল্‌-বেরূনী সে যুগের হিন্দুদের আর একটা প্রধান দোষ লক্ষ্য করিয়াছেন। সেটা হইতেছে তাহাদের তীব্র আগ্রহের অভাব। হয়ত ইহা সাহসের অভাবে নয়, কিন্তু ইহা তাহাদের ছিল। আর এই জন্য তাহারা খুব বড় বড় কাজ করিতে অশক্ত হইয়া পড়িতেছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, বহু বিজ্ঞ হিন্দু ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করিতেন; এবং মূর্ত্তিপূজার প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ছিল না। আবার তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, একদল গোঁড়া ও সংস্কারাপন্ন লোক ঈশ্বরসম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব সব রকম কথাই বিশ্বাস করিতেন। ইহার কারণ কি? আল্‌-বেরূনী বলিতেছেন, ইহার প্রধান কারণ দার্শনিক পণ্ডিতগণের সাধারণের মধ্যে সত্যপ্রচারের আগ্রহের অভাব। ঈশ্বরসম্বন্ধে যখন সাধারণ লোকের বিশ্বাস ও দার্শনিকের বিশ্বাসের মধ্যে বিরোধ বাধিত, তখন দার্শনিক পণ্ডিতগণ হয় দার্শনিক মত পরিত্যাগ

করিতেন, অথবা জনসাধারণকে তাহাদের জ্ঞানানুসারে ঈশ্বরসম্বন্ধে জ্ঞান দান করিতেন।

হিন্দু দর্শন ছিল মূলতঃ esoteric (অভ্যন্তরীণ)। ইহা কুসংস্কার ও আচার-মূলক বিশ্বাস হইতে মুক্ত। কিন্তু হিন্দু দার্শনিক ও সুধীগণ সাধারণের মধ্যে এই সব উচ্চ ভাব ও দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিবার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য গ্রহণ করেন নাই। হিন্দু দার্শনিকদের এই আচরণকে আল্-বেরুনী সমর্থন করেন নাই।

জ্ঞানবিজ্ঞানের কতকগুলি শাখায় হিন্দুরা যে খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আল্-বেরুনী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তাহাদের সাহিত্য তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রীত ও মুগ্ধ করিয়াছিল। হিন্দু-সাহিত্যের মধ্যে বেদকে তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, সমগ্র বেদটা একখানি গ্রন্থ, যদিও ইহা চারি ভাগে বিভক্ত। তাঁহার যুগের ব্রাহ্মণগণ ইহা পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহার অর্থ বুঝিতেন না। বেদকে তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণ তাঁহার মতে ঋষিদের রচিত গ্রন্থ। পুরাণ অষ্টাদশ খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে অনেক গাল-গল্প থাকিলেও বহু নীতি ও উপদেশে ইহা পরিপূর্ণ ; এবং ইহার অনেক গল্প রূপক। স্মৃতিশাস্ত্র বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে আইন, কার্য্যবিধি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিষয় আছে।

বিজ্ঞানালোচনার জন্য যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতি আর্য্যদের জানা ছিল ; এবং তাঁহাদের বিজ্ঞান বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল, যথা, বস্তুবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, মাপবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় তাঁহারা প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। আল্-বেরুনী আর্য্যদের জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষসম্বন্ধে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, জ্যোতির্ব্বিদ্যাসম্বন্ধে আর্য্যদের জ্ঞান গ্রীক হইতেও স্পষ্ট ছিল। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষকে তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই ; এবং এ কথাও বলিয়াছেন যে, সে যুগের অনেক দার্শনিক হিন্দু তাহাতে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। রসায়ন ও ঔষধতত্ত্বে আর্য্যদের যে বিশেষ জ্ঞান ছিল, তাহা আল্-বেরুনী বার বার বলিয়াছেন। চরকের গ্রন্থ ঔষধ-বিজ্ঞানের মূল ও প্রামাণিক গ্রন্থ।

পঞ্চতন্ত্রখানি অনুবাদ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু গল্প অপেক্ষা বিদ্যার্জ্জনের দিকে তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল বলিয়া তিনি তাহাতে হাত দেন নাই।

আল্-বেরূনী অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন, কতকগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, শ্রেণী বিভাগ করেন। আবার কতকগুলির লিপি উদ্ধারও করিয়াছিলেন ; এবং তিনি অনেক গ্রন্থকে অবজ্ঞা ও বিস্মৃতির গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া লোক-লোচনের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যে অমর কীর্ত্তি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দশম শতাব্দীর ভারতের এক উজ্জ্বল ইতিহাস। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায় বলিতে হয়, "যথার্থবাদী ঐতিহাসিক বলিয়া, ভারতের প্রাচীন বিদ্যার একাগ্রচিত্ত অনুশীলনকারী বলিয়া সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে আল্-বেরূনীর নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারিত হয়, এবং তাঁহার বই সযত্নে পঠিত ও আলোচিত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে সত্য পরিচয়-স্থাপনের চেষ্টায় জ্ঞানকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন বলিয়া আল্-বেরূনী সমস্ত সভ্য মানবের সাধুবাদের যোগ্য।"

আজ আমরা জাতিসমন্বয়, ধর্ম্মসমন্বয় ও সাম্প্রদায়িক মিলন ও সম্প্রীতির কথা আলোচনা করি ; অথচ যাহাদের সহিত সমন্বয় ও মিলন করিতে যাইব, তাহাদের ভিতরের খবর একেবারেই রাখি না। আর যাহা রাখি, তাহা মিস্ মেয়ো, অথবা স্যার উইলিয়াম মুইরের পক্ষপাতপূর্ণ একদেশদর্শী গ্রন্থ পাঠ করিয়া। আমাদিগকে এই পন্থা পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং আল্-বেরূনীর পন্থা অবলম্বন করিয়া অপরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

আল্-বেরূনীর বহু পরে ভারত-সম্রাট্ শাহ্‌জাহান-পুত্র মহাত্মা সাধক দারা শিকোহ্ এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন ; এবং তিনি সেই উদ্দেশ্যে কতিপয় পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। "মাজমাউল্-বাহ্‌রায়েন"—অর্থাৎ "দুই সাগরের মিলন" নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি আমাদিগকে এই পথের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। মহাজন-নির্দ্দেশমত সেই সব পথ ধরিয়া যদি আমরা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পরস্পরের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির বিষয় আলোচনা করি এবং পূর্ব্ব হইতে বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব পরিত্যাগ করি, তবে,

আশা করা যায়—মহামনীষী আল্-বেরুনীর সাধনা সার্থক হইবে—মহাপ্রাণ সাধক দারা শিকোহের আত্মবলিদান সফল হইবে, এবং ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত সমন্বয়, মিলন ও সদ্ভাব সম্ভব হইবে।

—রেজাউল করীম

সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার

চৈত্র মাসের প্রথম। বসন্ত পরিপূর্ণ হইয়া ক্রমশঃ উগ্র হইয়া উঠিতেছে—প্রকৃতি ধীরে ধীরে রুক্ষরূপ ধারণ করিতেছে। মাঠের চৈতালী ফসলে রসসঞ্চার শেষ হইয়া ফসল পাকিয়া উঠিয়াছে—অনেকের ফসল ঘরে আসিয়া উঠিতেছে। বৎসরের শেষ, আখেরী কিস্তীর খাজনা আদায়ের সময়। প্রাচীন সরকার বংশের সাড়ে সাত গন্ডার অংশীদার বনবিহারী সরকার খাজনা আদায়ে চলিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসরের প্রৌঢ় যথাসম্ভব দ্রুতগমনে চলিয়াছেন। মাথায় ছাতা সত্ত্বেও তাঁহার গৌর বর্ণ রৌদ্রের উত্তাপে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পিছনে পিছনে চলিয়াছে তাঁহার বাড়ীর একমাত্র ভৃত্য নিম্নজাতীয় একটি বালক—নাম নন্দলাল। নন্দলাল তাঁহার সব—গোরু বাছুরের সেবাও করে, বাজারও করে—আবার চাপরাশীও সাজে। বয়সের অনুপাতে নন্দলাল দৈর্ঘ্যে অনেকটা খাটো—হাত-পা নাড়িলে পুতুলের মত দেখায়, গায়ের রং গাঢ় কালো—সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে সাদা তাহার গোল গোল দুইটি চোখ ও দুই পাটী দাঁত। নন্দলালের বগলে সরকার মহাশয়ের আদায়ের কাগজপত্রের দপ্তর—আঙুলে ঝোলানো দড়িতে বাঁধা দোয়াত ও কলম—অন্য হাতে প্রকাণ্ড এক লাঠি।

বনবিহারীবাবু নন্দলালকে বুঝাইতেছিলেন—বুঝলি নোদা, মহালে গিয়ে যেন ম্যাদারাম হয়ে থাকবি নে। খুব হাঁক-ডাক চালাবি—হটবি না কিছুতে। বুঝলি কিনা—মাটী তোর বাপের নয়—মাটী হ'ল গিয়ে দাপের।

নন্দলাল ছোট মানুষটি হইলেও হাত-পা নাড়িতে দীর্ঘাকার মানুষ অপেক্ষা অনেক ক্ষিপ্র। সে লাঠিসুদ্ধই হাতখানা নাড়িয়া বলিল,—দেন কেনে একখানা পাগড়ী কিনে—ইয়া লাল টক্‌টকে রঙের! দেখবেন আমি কি কাজ করি।

—পেনাম সরকার কত্তা! আদায়ে চলেছেন নাকি?

বিপরীত দিক্ হইতে দুইজন লোক আসিতেছিল—মুখোমুখী হইতেই একজন তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া ঈষৎ নত হইয়া নমস্কার করিল। অপরজন একটু মুচকি হাসিয়া শুধু নমস্কারই করিল। সরকার কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন—আখেরী কিস্তি—আর কি আমাদের অবসর আছে বাবা! হিসেব-নিকেশ কাগজপত্র সারা—অনেক ঝঞ্ঝাট!

তাঁহারা আগাইয়া চলিলেন—লোক দুইটিও বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। একজনের গলা শোনা গেল—সে ব্যঙ্গভরেই বলিল—আমাদের কাগজ-বাবু! ভাগ্যে কাগজের বস্তা চাপা দেয় নাই! দেড় পয়সার জমিদার—কাগজের গল্প শোন কেন!

বনবিহারীবাবু বোধ হয় সে কথা শুনিতে পাইলেন না, কিংবা হয় তো গ্রাহ্যই করিলেন না। তিনি নন্দলালকে পুরাতন কথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন—বুঝলি নোদা, এ হ'ল আমাদের আদি পুরুষের কথা। মহাতাপচন্দ্র সরকার বলতেন, মাটী বাপের নয়—মাটী হ'ল দাপের। মহাতাপবাবুর আমলে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খেয়েছে। বাপ আমলে—এই তো' তোর পাঁচ পুরুষ আগে—সদরে তোর আট দশটা চাপরাশী—তার ওপর প্রত্যেক মৌজায় একজন করে পাইক, একবার—

নন্দলাল অসহিষ্ণু হইয়া কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল—বড়বাবুদের চাপরাশী এখন অ্যানেক—আর চেহারা কি! পোষাক প'রে যখন বেরোয় বাপু ওঃ! পাগড়ী বাঁধা কেলে হাঁড়ীর মত, মুখ দেখলে দাঁত লেগে যায়!

বনবিহারীবাবু পদক্ষেপের গতি খানিকটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—পা চালিয়ে আয়, পা চালিয়ে আয়।

নন্দলাল কিন্তু তখনও বলিতেছিল—পাগড়ী না হ'লে বাপু লোকে কেয়ারই করে না। পাগড়ী বাঁধলে মানুষকে ভড়কালো লাগে। বাবুদের চাপরাশীদের পাগড়ীর ছামুতে আবার পেতলের একটা কি থাকে—সোনার মত ঝক্‌মক্ করে! ভাড়ী বাহার—

বাধা দিয়া বনবিহারীবাবু বলিলেন, ওরে মুখ্যু—পেতলেরই বা দাম কি—আর খানিকটা লাল শালুরই বা মুরদ কি, ও তোর বিশটা চাপরাশী রাখলেই বা হবে কি? জমিদারীর আসল জিনিষই হ'ল কাগজ—থাক—নকসা—চিঠে—জমাবন্দী। এসব তোর এক কুটীও ওদের বাড়ীতে আছে? সামান্য একটা বাকী খাজনার মামলায় প্রজা যদি গোলমাল ক'রে একটা জবাব ঠুকে দেয় তা হ'লেই—ব্যস—বুঝলি কিনা!

মাঠের উপর দিয়া একটা অতি ক্ষুদ্র পরিধির ক্ষীণজীবী ঘূর্ণি কতকগুলা পাতা উড়াইয়া লইয়া পাক দিতে দিতে চলিয়াছিল। নন্দলাল বলিল, এরই মধ্যে ঘুরণ-চাক উঠে পড়ল কত্তা—খরা এবার যা চন্‌চনে হবে বুঝলেন—হ-হ—ঘুরচে দেখ দেখি—হ-হ!

বনবিহারীবাবু আপন মনেই বলিতেছিলেন,—এই ধর না কেন—মিয়েদের একটি নানকার জমা আছে—একশো বিঘে জমি—তার দশ টাকা খাজনা। নবাবী আমলের জমা—নবাব মীরকাশেমের আমলের সনদ—ফার্সী হরফে তামার পাতের ওপর লেখা। ওরা সে সনদ বার করে না—অথচ বলে, আমাদের এ হ'ল মোকররা জমা—এ জমার বৃদ্ধি নাই। এখন জমিদাররা কি করবে করুক। করুক জমার বৃদ্ধি দেখি! কিন্তু চল্ তুই—তোকে দেখাব সে সনদের নকল আমার কাছে আছে। বেবাক মৌজার দোরবস্ত প্রজার কবুলতি—সমস্ত জমার চৌহদ্দী—সমস্ত আমার কাছে!... —আরে মিত্তির যে! কি রকম, আদায়পত্র কি রকম হে?

অধুনাতন এ অঞ্চলের প্রধান ধনীর কর্ম্মচারী মিত্তির, সেও আদায়ে চলিয়াছে। তাহার সঙ্গে সুসজ্জিত দুইজন বরকন্দাজ, দুইজন নিম্নশ্রেণীর পাইক। নন্দলাল মুগ্ধবিস্ময়ে বরকন্দাজদের প্রতি বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করিতেছিল।

আপন ধনশালী প্রভুর ধনগৌরব ও প্রতিপত্তির মর্য্যাদা বজায় রাখিবার উপযুক্ত সুস্পষ্ট তাচ্ছিল্যের সহিত সহাস্যে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া মিত্তির বলিল—হচ্ছে এক রকম। তবে কি জানেন—আমাদের জোর জবরদস্তি নাই—আকুলি বিকুলিও নাই। যা হ'ল হ'ল, যা না হ'ল সমস্ত নালিশ! তামাদী রক্ষে একেবারে উঠিয়ে দিয়েছেন বাবু। তবে নেহাত যদি কেউ ধরে—তো টাক্‌তি সাত আনা সুদ দিতে হবে। তারপর আপনার হালচাল কি রকম?

—হ্যাঁ. তা কিছু কিছু ক'রে সব দেবে বৈকি। আমার ধর গিয়ে তো সুদও নাই—তামাদীও নাই—নালিশও নাই।

বিজ্ঞভাবে মিত্তির বলিল—ওই ক'রেই নিজের সর্ব্বনাশ করেছেন সরকার মশাই। যতই আপনারা ঢাকুন—প্রজাতে ঠিক বুঝতে পারে যে, এ হ'ল জমিদারের এক চাল—নালিশ করবার পয়সা নেই—তাই সুদ রফা দিয়ে তামাদী আদায়ের ফন্দী। কিন্তু তামাদী কি আর লোকে দেয়। যা হোক—যেমন ক'রে হোক—ধার ধোর ক'রেও নালিশ কতকগুলা ক'রে দিন। না হ'লে বিষয় রাখতে পারবেন না।

বনবিহারীবাবু বলিলেন—তা' যে উপায় নেই হে—পূর্ব্বপুরুষের নিষেধ—সে লঙ্ঘন করি কি ক'রে?

মিত্তির বলিয়া উঠিল—আরে মশায়, তার ফলও তো চোখে দেখেছেন। সরকার বংশের জমিদারী তো সবই একরকম বিক্রী হ'য়ে গেল, থাকবার মধ্যে আপনার সাড়ে সাত গণ্ডা—আর মধ্যম কোঁদার ধনদাবাবুদের দশ গণ্ডা,—বাকী সবই তো বিক্রমপুর চ'লে গেল!

বনবিহারীবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর বলিলেন—ভাল কথা মিত্তির,—তোমার মত পাকা লোক এষ্টেটে থাকতে বাবুরা সেরেস্তার কাগজপত্র এমন জবরজং ক'রে ফেললে কি ক'রে? সেদিন পানু মিশ্রীর কাছে ১১৪৩ নং জলকর কমণ্ডলুর থোকা দেখলাম—রাম রাম, ও কি কাগজ হয়েছে হে! সাবেকী সব ঘর বাদ দিয়ে যা' তা' কতকগুলো নতুন ঘর ছকেছে। এই ধর না—যেমন তোমার একটা ঘর হ'ল তলব সুদ। বেশ ভাল কথা—কিন্তু তলব কই হে—সে ঘর আগে কর—তলব আষাঢ়—তলব আশ্বিন—। তা না—তলব সুদ! আদালতে প্রজা আপত্তি দিলে যে কাগজসুদ্ধ বাতিল হয়ে যাবে। থোকা, তোমার সেই সাবেকী আমলের থোকা—একেবারে নিখুঁত। রাজনগরের নবাবদের সেরেস্তার একখানা থোকা আমার কাছে আছে—দাঁড়াও দেখাব তোমাকে। তারপর তোমার আর এক প্রস্থ জমাবন্দীর কাগজ—

সরকারের কথা শেষ হইল না। মিত্তির আপনার প্রভুর কাছারী বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল—সে সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ভদ্রতা করিয়া বলিল—আসুন না সরকার মশাই, এইখানেই বসবেন, প্রজারা সব তো এইখানেই হাজির রয়েছে।

সত্যই সমস্ত কাছারীর বারান্দাটা পূর্ব্ব হইতেই সমাগত প্রজায় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। তাহারা সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া মিত্তিরকে নমস্কার করিল।

সরকার মহাশয় তখনও দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলেন। নন্দলাল মৃদুস্বরে বলিল—তাই বসেন গো কত্তা। বাবুদের ডাকে সবাই আসবে—আপনার কাজও হয়ে যাবে। আর তো মোড়লদের ঘরে কেউ আসবে না। ডাকতে গেলে বলবে—আজকে যেতে পারছি না—হয় তো এবারে দিতেই লারব।

সরকার আরও কিছুক্ষণ ভাবিয়া শেষে মিত্তিরের প্রভুর কাছারীঘরেই উঠিয়া পড়িলেন। মিত্তির বলিল—ওরে বেহারী, সরকার মশাইকে ওই দিক্ দিয়ে একখানা কম্বল পেতে দে তো।

*   *   *   *

গোষ্ঠ পাল বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা, সে এক থোক টাকা মিত্তিরের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিল—আমার কাজটা আগে সেরে দেন মিত্তির মশায়। আমাকে একবার কুটুমবাড়ী যেতে হবে।

সরকার ওদিক হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠেই বলিলেন—বলি ওহে গোষ্ঠ, সমস্ত বছরের মধ্যে তো দেখাই করলে না। তা আমার খাজনার কি করছ—তিন বছর বাকী হয়ে গেল তোমার।

গোষ্ঠ মিত্তিরকে বলিতেছিল—আজ্ঞে না—চেকের দামটা এবার মাপ করতেই হবে হুজুর। যোড়হাত করছি আপনাকে—ওই আট আনা পয়সা মাপ এবার করতেই হবে। আর ধরুন ওটা তো বাড়তি আদায় জমিদারের।

সরকার আবার ডাকিলেন—গোষ্ঠ! বলি শুনতে পেলে না, কি হে?

গোষ্ঠর চেকের দাম কিন্তু মাফ হইল না। সে মিত্তিরকে বলিল—তবে আজ্ঞে, চেক রসিদ আপুনি নিকে রাখবেন, কাল এসে নিয়ে যাব। আর এই নেন চেকের দাম আট আনা।

সরকার আবার ডাকিলেন—গোষ্ঠ!

গোষ্ঠ এবার যেন শুনিতে পাইল—সে সরকার মশাইয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, এবার আর আপনি বলবেন না কত্তা। বছর ভারী খারাপ, আর আপনকার তো তাগাদা নাই।

সরকার ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন—দেখ্ গোষ্ঠ, তোর মত লোক যদি অভাব গায়, তা হ'লে আমাদের চলে কি ক'রে? না বাপু, এবার আমি নালিশ ক'রে দেব।

নন্দলালের তরুণ রক্ত ক্রমশঃ গরম হইয়া উঠিতেছিল—সেও বলিয়া উঠিল—তুমি ব'স, ব'সে খাজনা দিয়ে যাও। উ বাবুদিগে দিলে আর আমাদের বেলায় লারব।

গোষ্ঠ অত্যন্ত রূঢ় রকমের একটা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল—কে রে বেটা হারামজাদা ছোটলোক, চুপ ক'রে থাক বলছি।

তারপর সরকারের দিকে ফিরিয়া বলিল—তা' হ'লে তাই লালিশ ক'রেই নেবেন কত্তা, বোলপুরের বড়তলাতেই দোব আমি। তার আগে দোব না। ছোটলোক দিয়ে অপমান করান আপুনি!

সরকার বলিলেন—এই দেখ তোমার মৃত্যুবাণ আমার হাতে আছে গোষ্ঠ! তোমার ওই লাখরাজ পুকুরও হ'ল মাল জমার সামিল। ১২৫৬ সালের মামলার রায়ের নকল আমার কাছে আছে। তুমি বুঝে আমার সঙ্গে—

গোষ্ঠ মিত্তির ও সরকার মশাইকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল—শেষ পর্য্যন্ত কথা শুনিবার তাহার অবসর হইল না।

সরকার মহাশয় মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিলেন—তিনি বেশ অনুভব করিতেছিলেন—মিত্তির মৃদু মৃদু হাসিতেছে; বোধ হয় বরকন্দাজ কয়জনের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে ভাবটা কাটাইয়া লইয়া তিনি অপর একজন প্রজাকে বলিলেন, মহিন্দি, তুমি কি বলছ গো? তোমার তো এবার চার বছর!

মহেন্দ্র বলিল—আপনি তো বছরে সাড়ে পাঁচ আনা ক'রে পান, তা এক বছরের চেক কেটে দেন, পয়সা দিচ্ছি।

—ঋষি, তুমি কি বলছ?

তা, দিতে হবে বৈ কি। তবে আজ কাল ত হবে না কত্তা। আজ বাবুদিগে দিলাম। তা, দিন চারেক পরে দোব।

ওদিকে মিত্তিরের সেরেস্তায় কাহার একটা কি গোল বাধিয়াছিল। সরকার তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বলিলেন—গোবিন্দ ঘোষের জমা তো? ও নাও না কেন আমার মুখে আছে। আন তো নোদা দপ্তরটা: কাগজ কাকে বলে একবার দেখ। ...গোবিন্দ ঘোষের জমা তোমার ১২৮৫ সালে—

মিত্তির খানিকটা স্থান করিয়া দিয়া বলিল—বসুন, বসুন, ব'সে ব'সেই বলুন।

সরকার মহাশয়ের দৃষ্টিতে অহঙ্কার ফুটিয়া উঠিল, গোষ্ঠ পালের তাচ্ছিল্যের গ্লানি অনেকটা যেন মুছিয়া গিয়াছে।

তিনি চাপিয়া বসিয়া বলিলেন—এ জমার কবুলীতিসুদ্ধ আমার কাছে আছে।

মিত্তির বলিল—একবার দিতে পারেন আমাকে?

সরকার বলিলেন—ওইটা মাফ করতে হবে। যেয়ো তুমি, দেখাব; কিন্তু হাতছাড়া করতে পারব না।

* * * *

২

এক সময় অর্থাৎ এখন হইতে পাঁচ পুরুষ পূর্ব্বে সরকারবাবুরা এখানে প্রবল প্রতিপত্তি- ও প্রতিষ্ঠা-শালী জমিদার ছিলেন। জমিদারীর আয় অধিক ছিল না, মোটমাট হাজার তিনেক টাকা আয়ের সম্পত্তি ছিল, কিন্তু জমিদারীর তুলনায় তাঁহারা জমিদার ছিলেন বড়। বিষয়কে বাদ দিয়াও মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন সরকারবাবুরা ; তাই বিত্তের তুলনায় প্রতিপত্তি ছিল অনেক বেশী এবং অধিকৃত ভূমির পরিধি অপেক্ষা খ্যাতির পরিধি ছিল বহুগুণে বৃহৎ।

কিন্তু দুই পুরুষ পর হইতেই তাঁহাদের পতন আরম্ভ হয়। বিষয়ে তখনও ঋণ প্রবেশ করে নাই, কিন্তু বংশেই যেন রোগ প্রবেশ করিল—সরকার-বংশে মানুষের অভাব ঘটিল, সরকার-বংশের চরিত্রগত মহান্ আশয়টুকু নষ্ট হইয়া গেল। বংশে মানুষের সংখ্যা বাড়িয়া গেল প্রয়োজনাতিরিক্ত রূপে ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে বংশোচিত স্বভাব ও চরিত্রের দৃঢ়তা এবং কর্ম্মক্ষমতার অভাব ঘটিল। মধুমক্ষিকার বংশে যেন কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে পঙ্গপালের উদ্ভব হইল, তাহারা সরকার-বংশের বৈভব ও প্রতিষ্ঠার মধুচক্রটি নিঃশেষে উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। এখনও সরকার-বংশে বংশধরের অভাব নাই, কিন্তু বিষয় বা প্রতিষ্ঠা কিছু তাহাদের নাই। শুধু বনবিহারীবাবুর দেড় পয়সা ও অপর একজনের দশ গন্ডা পরিমিত অংশ এখনও বজায় আছে।

যাক্! বনবিহারীবাবু বাড়ী ফিরিলেন বেলা দুইটায়। নিঃসন্তান ও বিপত্নীক বনবিহারীবাবু। বাড়ীতে স্ত্রীলোকের মধ্যে আছেন তাঁহার ভাগিনেয়

রমেন্দ্রের পত্নী। একমাত্র ভাগিনেয়ই তাঁহার উত্তরাধিকারী, ভাগিনেয়টিকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষও করিয়াছেন তিনি। ভাগিনেয় রমেন্দ্র কাটোয়ার স্কুলে পঞ্চান্ন টাকা বেতনে চাকরী করে। বাড়ী ফিরিয়াই বধূর নিকট হইতে রমেন্দ্রের পত্র পাইলেন—রমেন্দ্র আজ সন্ধ্যায় বাড়ী আসিবে, দিন কয় ছুটি আছে।

বনবিহারীবাবু ব্যস্ত হইয়া ডাকিলেন—নোদা!

তারপর তিনি আদায়ের তহবিল মিল করিতে বসিলেন।

নন্দলাল তখন রমেন্দ্রের স্ত্রীকে বলিতেছিল অদ্যকার ঘটনার কথা. চোখে তার জল আসিয়াছিল—কত্তার ঘেন্না পিত্তিও নাই বউঠাকরুন! গোষ্ঠা চাষা অপমান ক'রে উঠে চ'লে গেল—নোকে সব হাসতে লাগল। সবাই হাসে, ঠাট্টা করে, বলে কাগজ-সরকার। তুমি বাপু, দাদাবাবুকে বলো—কত্তা যেন নিজে আদায়ে না যায়।

সরকার মহাশয় তহবিল মিল করিয়া দেখিলেন পাঁচ টাকা সাড়ে সাত আনা আদায় হইয়াছে। লাল খেরুয়ার থলিতে সেগুলি তুলিয়া রাখিয়া আবার ডাকিলেন—নোদা, বলি—ওরে, শুনছিস!

নন্দলাল বিরক্ত হইয়াই আসিয়া দাঁড়াইল। বনবিহারীবাবু বলিলেন—যা দেখি একবার বিপনে জেলের বাড়ী। রমন্দ আসবে আজ—বিপিনকে ব'লে আয় আজ সেই বিল জমার দরুন মাছটা দিতেই হবে।

নন্দলাল মহাবিরক্ত হইয়া বলিল—লারব বাপু আমি, আপনকার পেজার কাছে আমি আর যাব না। দেবে না তো যেয়ে কি করব আমি!

বনবিহারীবাবু বলিলেন—তার ঘাড় দেবে! দেবে না কি রকম? আমি কি ভিক্ষে চাইছি নাকি? চিরকাল পেয়ে আসছি—১২৬৩ সালের বন্দোবস্ত—তার কবুলতি আমার কাছে, দেবে না কি রকম? গুজস্তা জমা সালিয়ানা দরুন 'সরালদহের' মিল এক মণ চব্বিশ সের, নিজ অংশ সাড়ে সাত গণ্ডায় দেড় সের, সেস্ দেড় ছটাক, এই তোর পাওনা এক সের সাড়ে ন' ছটাক, দেবে না কি রকম?

নন্দলাল বলিল—নেকা তো আপনকার অ্যানেক রইছে, দেয় কে বলেন তো? বেশ, আমি চল্লাম, কিন্তুক সে যদি দেয় তো আমার কান দুটো ম'লে দেবেন তখন।

নন্দলাল চলিয়া গেল। সরকার কাগজের বস্তা লইয়া বসিলেন। রমেন্দ্রের স্ত্রী আসিয়া বলিল—একি, এখন আবার কাগজ নিয়ে বসলেন? স্নান করুন, বেলা কি আর আছে? এর পর আপনার আবার আহ্নিক আছে।

একখানা পুরাতন কাগজ বধূর দিকে আগাইয়া দিয়া সরকার বলিলেন—দেখ তো মা কাগজখানায় কি লিখছে! দেখ দেখি লিখিতং শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ পিতা ৺রাধাপদ ঘোষ—কস্য কবুলতি পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—।

বধূ বলিল—না, তা তো কই লেখা নাই। এ যেন কোন জমা-খরচের কাগজ ব'লে মনে হচ্ছে—দুদিকেই সারিবন্দী টাকার অঙ্ক সব—।

দেখি দেখি দেখি! মহা ব্যস্ত হইয়া সরকার হাত বাড়াইয়া বলিলেন—বোধ হয় তোমার নবাববাড়ীর সেহার কাগজ—দেখি দেখি! চশমাটা আবার কোথায় গেল!

বধূ বলিল—না মামা, এখন ওসব রাখুন আপনি, স্নান করুন।

পেঁয়াজ লেবা গো! পেঁ-য়া-জ! বহিরে ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া উঠিল। সরকার বলিলেন—বউমা, পেঁয়াজ কিছু কিনে রাখ—রমন্দ আসছে। ওরে ও পেঁয়াজওয়ালা! কত নেবে বউমা?

—এক সের নেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সরকার বলিলেন—কম কেনা তোমাদের এক স্বভাব! এক সেরে ক'দিন তোমার যাবে বল তো? বেশ বাপু, পয়সা আমি দিচ্ছি, দে রে পাঁচ সের দে। আর টাকাটেকের মুসুরী কলাই আনিয়ে দিই, কি বল? রমন্দও আসছে আর রোজ দুবেলা তোমার কাঁচা কলাইয়ের ডাল ভাল লাগছে না বাপু!

বধূ বলিল—যা আনাতে হয় আমি আনাচ্ছি—কই আদায়ের টাকা কটা আমাকে দেন তো।

বলিয়া সে নিজেই লাল খেরুয়ার থলিটি তুলিয়া লইল।

সরকার শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন—এ তোমার চাকরীর পয়সা নয় মা—এর আবার পাই—পাই কি কড়া ক্রান্তির হিসেব রাখতে হবে। তুমি সে পারবে না! দাও দাও!

বধূটি হাসিয়া থলি শ্বশুরের হাতে দিয়া বলিল—নেন, কিন্তু এমন ক'রে বেশী খরচ আপনি করতে পাবেন না। আর এখুনি উঠে স্নান করুন।

দিয়ে পরের মাটীতে পা দোব কি ক'রে? তা ছাড়া মান খাতির—দশের পুজো—এ কি ছাড়া যায়!

—কোথায় আপনার মান খাতির—দশের পুজো? তা হ'লে কি গোষ্ঠা চাষা আপনাকে অপমান করে, না বিপনে জেলে আপনার ন্যায্য পাওনা দিতে দশ কথা ব'লে পাঠায়?

হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বনবিহারীবাবু বলিলেন—এই কথা! আচ্ছা তবে দেখ্—মুক্ষু তো নস্—দেখ্ প'ড়ে দেখ্।

বলিয়া দপ্তর খুলিয়া দুইখানা পুরাতন দলিল তাহার হাতে দিয়া বলিলেন—এই হ'ল গোষ্ঠা চাষার মৃত্যুবাণ। আর এই হ'ল বিপনের। দেখ্ না তুই, আজই কেমন জরিমানা আদায় হ'য়ে যায়। আজকের কাগজ নয়—১২৫৬ সাল আর ১২৬৩ সালের।

মামার কথা শুনিয়া রমেন্দ্র হাসিবে না কাঁদিবে বুঝিতে পারিল না। সে মামার পায়ে ধরিয়া বলিল—আপনি বুঝতে পারেন না মামা—এ জন্যে লোকে কত ঠাট্টা ইঙ্গিত করে—লোকে আপনাকে ঠাট্টা ক'রে কাগজ-সরকার ব'লে ডাকে!

—হিংসে ক'রে বলে ও কথা। এ চাকলার সব মিঞারই হাঁড়ির খবর যে আমার ঘরে! অংশ সাড়ে সাত গণ্ডা হ'লেও সমস্ত কাগজ যে আমার ঘরে—আমাকে অমান্য করে—সাধ্যি কার? 'জমিদারী সম্পত্তি বেচ' কি বলতে আছে—ছিঃ! লাভের সম্পত্তি—একশো টাকার ওপর লাভ জমিদারী স্বত্ব—পাকা সোনা!

'বেশ, বিক্রী করতে হবে না, পত্তনী দিয়ে দেন।

—আরে সে তো তোর বিক্রীর সামিল। গভর্ণমেন্টের ঘরে নাম—প্রজার কাছে সম্মান—চ'লে যাও তুমি আপন এলাকার মধ্যে—দুধারের লোক পেনাম করবে! 'কিছু মনে ক'র না বাবা, এ জিনিষের মর্ম্ম তুমি বুঝবে না—তোমরা হ'লে উড়োপাখীর জাত—কুলীনের ছেলে—তোমার বাপদাদার ছিল পেশা বিবাহ!—বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রমেন্দ্র কিন্তু ছাড়িল না, সে বলিল—বেশ তো—জমিদারীই যদি করবেন তবে জমিদারী চালেই করুন—গমস্তা রেখে আদায় করুন। আপনার পূর্ব্ব-পুরুষ তো কর্ম্মচারী রেখেই আদায় করতেন—নিজে তো দপ্তর বগলে বেরুতেন না!

এবার বনবিহারীবাবু বিব্রত হইয়া পড়িলেন, মাথা চুলকাইয়া শেষে বলিলেন—হ্যাঁ, তা বটে! তবে কি জানিস, গমস্তাকে তো মাইনে লাগবে! তা ছাড়া গমস্তা-নামাই চোর। আর এতে তোর প্রজাদের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখাশোনা—মান খাতির—

বাধা দিয়া রমেন্দ্র বলিল—না, তার দরকার নেই ; আপনি খান দান আর পুজো অর্চ্চনা করুন—এমনভাবে আপনি আদায় করতে পাবেন না। গমস্তার মাইনে আমি দোব। আর তা যদি না হয়—তবে আমাকে ছেড়ে দেন—আমি এখানে থাকতে পারব না—যেখানে চাকরি করব, সেখানেই থাকব।

বনবিহারীবাবু এবার আর সম্মতি না দিয়া পারিলেন না। ওই বাবুদের কর্ম্মচারী মিত্তিরকেই আদায়ের ভার দেওয়া স্থির হইয়া গেল। মিত্তিরকেই রমেন্দ্র পত্র লিখিয়া পাঠাইল।

বেলা দ্বিপ্রহর গড়াইয়া যায়। রমেন্দ্র আসিয়া ডাকিল—এখনও ব'সে ব'সে কি করছেন মামা? স্নান করুন!

একখানা কাগজে বনবিহারীবাবু কি লিখিতেছিলেন—সেখানা রমেন্দ্রের হাতে দিয়া বলিলেন—আমার কি নিশ্চিন্দি ব'সে থাকবার যো আছে রে বাবা! গমস্তার হাত থেকে হিসেব নিতে হবে, তার চুরি বন্ধ করতে হবে! তা দেখ কেমন কাগজ তৈরী করলাম, দেখ—একটা ক্রান্তি হারালে—কি এক ফোঁটা জমির গোলমাল হ'লে, এক নজরে ধরা প'ড়ে যাবে! মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ীর কাগজের নকল।

অপরাহ্ণে মিত্তির আসিয়া কাগজপত্র লইয়া গেল। এটা তাহার উপরি লাভ ; সে তাহা ছাড়িবার ব্যক্তি নয় তবে বন্দোবস্ত করিয়া লইল—বনবিহারীবাবুর প্রাপ্য টাকা সে আদায় না হইলেও নিজে হইতে দিবে—কিন্তু সে যাহা করিবে, তাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে পাইবেন না।

বনবিহারীবাবু আপত্তি তুলিলেন ; কিন্তু রমেন্দ্র তাঁহাকে জোর করিয়া রাজী করাইল। সে নিশ্চিন্ত হইল—মামার আর কিছু করিবার রহিল না—এ প্রায় পত্তনী বন্দোবস্তর সামিল।

৪

সেদিন অপরাহ্ণে রমেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া গ্রামে ঢুকিয়াই দেখিল—তাহার মামা একখানা কাগজ

হাতে—আগে আগে চলিয়াছেন। রমেন্দ্রের সম্মুখেই পথপার্শ্বে বাঁড়ুজ্জ্যে বাড়ীর কাছারী—বাঁড়ুজ্জ্যেরা এখানকার সরকার বাড়ীর দৌহিত্র এবং মধ্যবিত্ত জমিদার। তাহাদের কাছারীতে রহস্যালাপের প্রচুর হাস্যধ্বনি উঠিতেছিল।

একজন বলিতেছিল—দেখলে তো মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ীর কাগজের নকল! কাল আবার দেখতে পাবে—দিল্লী সেরেস্তার কাগজের নকল। কাগজ-সরকারের জ্বালায় অস্থির রে বাবা! দেড় পয়সার জমিদারীতে আবার গমস্তা নিযুক্ত হ'য়ে গেল।

আর একজন বনবিহারীর ভঙ্গী নকল করিয়া বলিল—আর ১২৬৩ সালের দলিলের কথাটা শুনলে? কবুলতি ওর কাছে আছে ; কিন্তু দেখাতে নিষেধ আছে বাপু!

সকলে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লজ্জায় দুঃখে রমেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। লজ্জায় যে দুঃখ—সে দুঃখের পশ্চাতে পশ্চাতে মনে আসিয়া জাগে ক্রোধ। দ্রুতপদে স্থানটা অতিক্রম করিয়া কিছুদূর যাইতেই রমেন্দ্রের মনে ক্রোধ জাগিয়া উঠিল, এবং সে ক্রোধ গিয়া পড়িল ওই বুদ্ধিহীন মামার উপর। এতটুকু মান-অপমানবোধ কি নাই তাঁহার! আর ওই কাগজ! ওই কাগজগুলাকে একদিন পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিবে সে।

দ্রুতপদেই সে চলিয়াছিল। কিন্তু পথে বাধা পড়িল—বাড়ী যাওয়া আর হইল না। লক্ষ্মী মুখুজ্জে তাহার সমবয়সী বন্ধুলোক—তাহার ওখানে নিয়মিত তাসের আড্ডা বসে। বন্ধুজনে সেইখানে তাহাকে আটক করিল —আরে—আরে—ঘোমটা মুড়ি দিয়ে হন্ হন্ ক'রে যাও কোথা? বলি বাড়ীতে প্রেয়সী নাই কার—ব'স—ব'স, দু হাত খেলে যাও।

প্রেয়সীর জন্য সে ব্যাকুল নয়, এইটুকু প্রমাণ করিবার জন্যই তাহাকে বসিতে হইল। তাসের আড্ডা শেষ করিয়া যখন সে বাড়ী ফিরিল, তখন বনবিহারীবাবু অঘোরে ঘুমাইতেছেন। সুতরাং সেদিন কিছু আর বলা হইল না, কিন্তু মনের জ্বালা তাহার গেল না। নিদ্রাহীন চক্ষে সে বসিয়া রহিল। স্ত্রীও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রমেন্দ্র উঠিয়া মুক্ত অঙ্গনে বসিয়া অন্ধকার রাত্রির আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। সমস্ত পৃথিবী সুপ্ত নিস্তব্ধ—তাহার মধ্যে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সে ক্রমশঃ অস্থির হইয়া উঠিল। উত্তরোত্তর সে উতলা হইয়া উঠিতেছিল—ক্রমশঃ তাহার মনে হইল, এমন

যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা বুঝি আর নাই ; সমস্ত পৃথিবীর সহিত যোগসূত্র যেন কে নির্ম্মম হস্তে কাটিয়া দিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া সে দেখিল, মামা তাহার বহুপূর্ব্বেই উঠিয়া কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর বাহিরে রাস্তার উপর হইতে বনবিহারীবাবুর কণ্ঠস্বর যেন শোনা গেল। রমেন্দ্র বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, বনবিহারীবাবু বাঁড়ুজ্জ্যে বাড়ীর পাচকের সহিত আলাপ করিতেছেন।

—হ্যাঁ—ঘরেই আছি। মানে—আর তো ধর নিজে আদায় কর্‌ছি না—মহালে সব গোমস্তা নিযুক্ত ক'রে দিলাম। রমেন্দ্র—ধর একটা বড় চাকরি করছে—তা ছাড়া আমাদের জমিদারের ছেলের কি আর ওসব নিজে করা সাজে!

পাচকটি বলিল—বেশ, বেশ। তা বেশ করেছেন। বলিয়া সে পা বাড়াইল।

বনবিহারীবাবুও তাহার সঙ্গ ধরিয়া বলিলেন—গমস্তারা অবিশ্যি চোর হয়, কিন্তু আমার কাছে সে চালাকি তো খাটবে না! পাঁচ পুরুষ ধ'রে আমরা জমিদার—রক্তে আমাদের হিসেব-জ্ঞান আছে। এমন কাগজ আমি এবার—

আর বনবিহারীবাবুর কথা শোনা গেল না—পাচকটির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাস্তার মোড় ফিরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। একটি রাত্রির ব্যবধানে লজ্জাদুঃখহেতু যে ক্রোধ রমেন্দ্রের মনে অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া আসিয়াছিল—সে ক্রোধ এই মুহূর্ত্তে আবার দ্বিগুণিত উত্তাপে প্রখর হইয়া উঠিল। মনে মনে সে সংকল্প দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া বাড়ী ঢুকিল। বেলা আটটা হইতে নয়টা বাজিয়া গেল—তবুও বনবিহারীবাবু ফিরিলেন না। রমেন্দ্র ক্রমশঃ অধিকতর উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, সে নন্দলালকে ডাকিয়া বলিল—দেখে আয় তো বাজারে, মামা কোথায় আছেন,—ডাক ত তাঁকে।

নন্দলাল বলিল—যাবে আর কোথা বলেন, বাজারে দাঁড়িয়ে পুরোনো কাগজ—

ঠাস্ করিয়া তাহার গালে এক চড় বসাইয়া দিয়া রমেন্দ্র বলিল—হারামজাদা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! পুরানো কাগজের মর্ম্ম তুই কি বুঝিবি?

নন্দলাল গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরিয়া আসিয়া বলিল—পেলাম না।

পেলি নে? রমেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল—পেলি নে কি? ছোট একটা গাঁয়ের মধ্যে মানুষ হারিয়ে গেল?

বিরক্তিভরে নন্দলাল বলিল—গাঁয়ে থাকলে তো পাব, না কি! বেনেরা বল্‌লে, কত্তা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

রমেন্দ্র এবার নিজেই বহির হইল। ঘণ্টা দুই মাঠে ঘুরিয়াও সে মামার সন্ধান পাইল না। অবশেষে ঘর্ম্মাক্ত দেহে, উত্তপ্ত মস্তিষ্কে সে স্ত্রীকে লইয়া অদ্যই মাতুলাশ্রয় ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া বাড়ী ফিরিল। বনবিহারীবাবু তখন ফিরিয়াছেন, ঘরের মধ্যে দেওয়ালে ঠেস দিয়া একান্ত মনোযোগের সহিত একখানা বই পড়িতেছিলেন।

রমেন্দ্র উষ্ণকণ্ঠেই বলিল—মামা!

বনবিহারীবাবু মুখ তুলিয়া অপরাধীর মত হাসিয়া বলিলেন—তুই আমাকে খুঁজতে গিয়েছিলি?

রমেন্দ্র তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার মনের কঠিন কথাগুলি কিন্তু বহির্গমনপথে তাহার মাতুলের লজ্জিত দৃষ্টির সহিত মুখোমুখী হইয়া যেন লজ্জা পাইয়া থামিয়া গেল।

বনবিহারীবাবু বলিলেন—এই মাঠ ঘুরে এলাম একটু—কি ক'রব ব'সে ব'সে ঘরে? আর ধর, তাতে লজ্জাই বা কি! নিজের এলাকার মধ্যে—পরের এলাকায় তো পা দিই নি।

তিনি হাতের বইখানা ফেলিয়া দিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—আর একটা কথা বলছিলাম রমন্দ।

কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না, নীরব হইলেন। রমেন্দ্র বইখানার দিকে চাহিয়া ছিল—সেখানা অতি পুরাতন ছিন্নপ্রায় প্রথমভাগ। অকস্মাৎ রমেন্দ্রের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, তাহার মনে হইল, প্রদীপ্ত দিবালোক যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এ যেন গভীর অন্ধকার রাত্রি, সমস্ত পৃথিবী সুপ্ত নিস্তব্ধ! তাহারই মধ্যে একা নিদ্রাহীন পৃথিবীর সহিত যোগসূত্রহীন তাহার মামা। মাথার উপরে অসংখ্য কোটী নক্ষত্রখচিত আকাশ—উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির পাশেই

অতি ক্ষীণদীপ্তি তারকাটিও টিপ টিপ করিয়া জ্বলিতেছে, যেন সে নিজেকে স্ফীত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। তাহার মামা ওই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অবিরাম—

তাহার চিন্তায় বাধা পড়িল, মামা বলিলেন—যেন বহু সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—তুই বড় হয়েছিস্, আমারও ধর বুড়ো বয়স—খরচ আমি বেশী করব না—আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে।

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র

হাকিমের এজলাসে আজ বড় ভিড়। হাকিম ছোট, মামলা ছোট; বাদী বিবাদী ধনী, তাই কৌঁসুলি আসিয়াছে—বিলাত হইতে সদ্য পাস-করা ব্যারিস্টার। বারুইপুর কলিকাতার নিকট হইলেও, সে আমলে ব্যারিস্টার পথে ঘাটে দেখা যাইত না, অর্থাৎ দর্শনীয় ছিল। বিশেষ বাঙালী ব্যারিস্টার ছিল না বলিলেই হয়; তখনও বিলাতী বেকারের দল জন্মগ্রহণ করে নাই। কিন্তু সকলেই যে ব্যারিস্টার দেখিবার লোভে আসিয়াছে এমন বলা যায় না—ব্যারিস্টারের নাম তাঁহার বিলাত যাইবার আগে হইতেই অনেকে জানিত, অনেকে ছাত্রবৃত্তিতে তাঁহার রচিত কাব্য পাঠ করিয়াছে, রঙ্গমঞ্চে তাঁহার নাটক অভিনীত হইয়াছে; কোন কোন সংবাদপত্র ইঁহাকে মহাকবি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে: ভদ্রলোক কবি ও ব্যারিস্টার। এই আপাতবিরোধের সন্নিবেশের জন্যই লোকে তাঁহাকে অদ্ভুত মনে করিত। তাই আজ ভিড় খুব বেশি।

যথাসময়ে হাকিম এজলাসে আসিয়া বসিলেন। হাকিমের বয়স বেশি নয়—ত্রিশের এদিকে ; গায়ে কোট-প্যান্টালুন নয়, চোগা-চাপকান। একহারা চেহারা ; ক্ষীণকায় বলিয়া যতটা দীর্ঘ তাহার চেয়ে বেশি মনে হয় ; মাঝখান দিয়া চেরা সিঁথির দুই পাশে কুঞ্চিত সজ্জিত কেশদাম ; প্রকাণ্ড ললাট, খড়্গের মত নাকটা চাপা অধরোষ্ঠের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে; উপরের ওষ্ঠ কিছু বড়, তাহার তলে অধর প্রায় অদৃশ্য—তবু মনে হয়, সর্ব্বদা একটা শুভ্র হাসির বিদ্যুৎ চারিপাশে খেলিতেছে। চোখ দুইটি তীক্ষ্ণোজ্জ্বল ও অনায়ত।

হাকিমকে দেখিয়া অনেকের মনে পড়িল, হাকিমও বড় কম নর্ন ; তিনিও খান দুই উপন্যাস লিখিয়াছেন, একখানা উপন্যাস তো এইখানে থাকিবার সময়েই প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা এত খবর রাখিত, তাহারা কবি ও ঔপন্যাসিকের মিলন দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এজলাসে ব্যারিস্টার প্রবেশ করিলেন। আত্মপ্রত্যয়বান্ বিখ্যাত অভিনেতা যে ভাবে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে সেই ভাবে ; ব্যারিস্টার প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারিলেন, আজিকার রঙ্গমঞ্চের প্রধান অভিনেতা তিনি ; হাকিম জবরদস্ত হইলেও তাঁহার প্রভাব আজ কিঞ্চিৎ ম্লান ; তাঁহার মনে হইল, হাকিম এজলাস মামলা সবই উপলক্ষ্য, একমাত্র লক্ষ্য তিনি। তিনি যেন হাজার হাজার হাত হইতে অশ্রুত করতালির শব্দ শুনিতে লাগিলেন।

দর্শকেরা দেখিল যে, ব্যারিস্টার যে বিলাতী-পাস-করা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নেক্‌টাই হইতে বুট পর্য্যন্ত আগাগোড়া বিলাতের ছাপ মারা ; কেবল রংটিতে বাঙালিয়ানা বজায় রহিয়াছে। তবে যে শোনা যায়, বিলাতে বাস করিলেই রং ফর্সা হয়! ব্যারিস্টার স্থূলকায়। প্রৌঢ়ত্বের স্থূলতা দেহে দেখা দিয়াছে ; মাথায় চেরা সিঁথি, চুল অনেকটা বিরল হইয়া পড়িয়াছে ; গড়ানে ললাট, কোন সংকল্প যেন দীর্ঘকাল সেখানে থাকিতে পারে না, দুইচার মুহূর্ত্ত টলমল করিয়া গড়াইয়া পড়িয়া যায় ; নাকটা মোটা ; অধরোষ্ঠ স্থূল ও ফাঁক, মনের কথা কিছুতেই যেন তাহারা চাপিয়া রাখিতে পারে না : চোখ উদার ও উজ্জ্বল; তাহারা কবির সংসারজীবনের চঞ্চল সমুদ্রের ঊর্দ্ধ্বে ধ্রুবতারকার জ্যোতি বিকিরণ করিয়া অন্তরের কাব্য-সপ্তডিঙাকে যেন কমলে কামিনীর পরপারবর্ত্তী সুদূর সিংহলের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে।

হাকিম বুঝিতে পারিলেন—হাকিম হইলেও আজ তিনি উপলক্ষ্য ; লক্ষ্য ওই কৌঁসুলি। জনতার মনোযোগ ও ঔৎসুক্য ওই কৌঁসুলিতে কেন্দ্রীভূত তিনি স্থির করিলেন, কিছুতেই তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিবেন না, নেহাত দুই একটি ছাড়া কথাই বলিবেন না ; কবি ও ঔপন্যাসিকের মধ্যে কে বড় সে বিষয়ে তর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু এজলাসে কৌঁসুলির চেয়ে হাকিম বড়—তাহা প্রমাণ করিয়া দিবেন। তীক্ষ্ণোজ্জ্বল চোখ কাগজে নিবদ্ধ করিয়া অনুকম্পা-মিশ্রিত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তিনি যেন কৌঁসুলির তর্ক শুনিতে লাগিলেন।

অন্য পক্ষে ব্যারিস্টার যেন দর্শক সম্মুখে রাখিয়া অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন। সহস্র দর্শকের মধ্যে হাকিমও একজন। কখনও তিনি জনতার দিকে তাকাইতেছেন, কখনও হাকিমের দিকে, কখনও নিজের অত্যুগ্র বিলাতী পোষাকের দিকে। দুইজনের মধ্যে একজন স্বগত অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন, অপর জনের প্রাণপণ চেষ্টা দর্শকের মনোরঞ্জন। কৌঁসুলির গলার স্বর মোটা, ভাঙা, বক্তৃতার মধ্যে আছে ইংরেজী কাব্যের কোটেশান, আছে ভারতচন্দ্রের তীব্র ব্যঙ্গোক্তি। হাকিম স্বল্পভাষী, স্বর পরিষ্কার, তীক্ষ্ন ছিটেগুলির মত। কৌঁসুলি তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন নাই ভাবিয়াই যেন হাকিমের অধরের পাশে একটা কৌতুকের হাসির আভাস।

হঠাৎ কাগজ হইতে একবার চোখ উঠাইতে দুইজনে চোখাচোখি হইয়া গেল। এতক্ষণের সঙ্কল্প ভুলিয়া, জনতা ভুলিয়া, স্থানকালপাত্র ভুলিয়া দুইজনে দুইজনের চোখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। উজ্জ্বল চোখের সঙ্গে উদার চোখের সম্মেলন, তীক্ষ্ন দৃষ্টির সঙ্গে স্নিগ্ধ দৃষ্টির, গদ্যের সঙ্গে পদ্যের, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনের।

বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদন। একজন বিচারক, একজন ব্যারিস্টার। একজন কৃতী বিচারক, একজন ব্যর্থ ব্যারিস্টার—ইহা কি দৈব মাত্র, না তাহার অধিক কিছু ইহাতে আছে? বিচারকের ব্যক্তিত্ব লইয়াই যেন বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি ছিলেন নৈর্ব্যক্তিক, স্বল্পভাষী, স্বতন্ত্র ; স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভেদী তাঁহার দৃষ্টি ; উভয়পক্ষের তিনি ঊর্দ্ধে। মধুসূদন কৌঁসুলির বে অবগত ছিলেন না ; সুকৌঁসুলি নিজেকে উপলক্ষ্য করিয়া মক্কেলকে লক্ষ্য করিয়া তুলিবেন, তিনি হইবেন পরতন্ত্র। মধুসূদন দুইচার কথার পর